একটি বিস্ময়কর জনপ্রিয় মাসিকপত্র

আশ্চর্য!

বার্ষিক
জয়ন্তী
সংখ্যা

জানুয়ারী
১৯৬৫

ভয়ানক মরীসৃপ দৈত্যদের
রাজত্বে টার্জনের অ্যাডভেঞ্চার

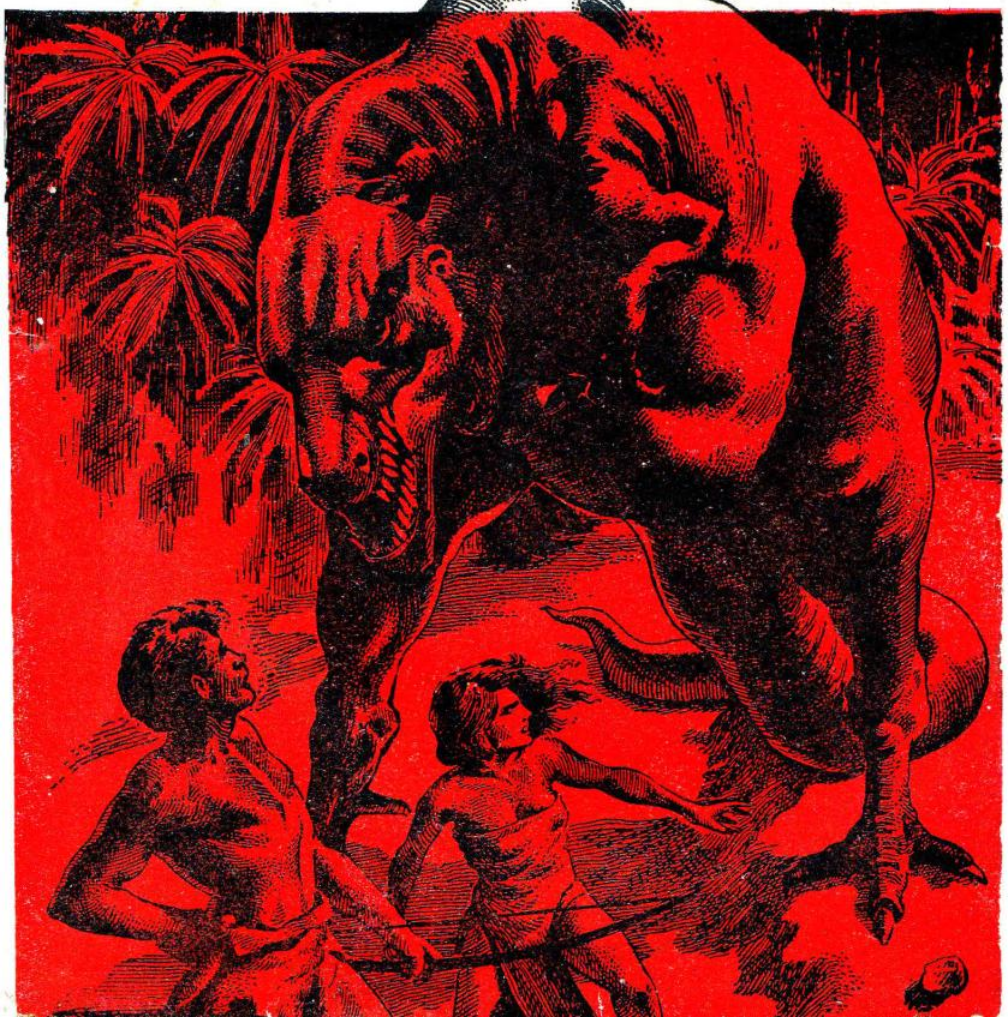

লাইব্রেরী সাজাতে সুন্দর বই

নতুন বেরুলো ! ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে !

কালো মাটি রাঙা মন

'নবফুল' রচিত মিষ্টি উপন্যাস

যারা মেহনতী করে এক টুকরো রুটি জোগাড় করে দিন গুজরান করে, দুঃখ দিয়ে গড়া তাদের জীবনের মধ্যে কী বিচিত্র রূপ লুকিয়ে আছে, এই রঙিন উপন্যাসটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার প্রাণবন্ত কাহিনী পড়বেন। সত্য ঘটনার মতো। এতটুকু অলস আলোচনা নেই. তীব্র গতিতে বহে চলেছে মনোহর ঘটনা প্রবাহ।

একদিকে ধানু সর্দার আর মিঃ মিটারের সংগ্রাম. অপর দিকে চুরকী আর তৃপ্তির পলাশরাঙা মনের আকুতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। রক্তপাত, খুনজখম, ষড়যন্ত্রের বিভীষিকার মধ্যেও বেদনা ও আনন্দের সুর ছাপিয়ে উঠেছে।

দাম ৫·৭৫

আরও কয়েকখানি ভাল ভাল উপন্যাস !

পিয়াসা	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য	৮.০০
ঝড়ো ফুল	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	৫.০০
ঢেউভাঙ্গা মুক্তা	আদিত্য কুমার ভট্টাচার্য	৬.৭৫
দুটি গোলাপ একটি কুঁড়ি	সুখেন্দু সরকার	৫.২৫
চোর কুঠুরির আলো	'গোরা'	৫.৭৫

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌ ● মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক

পোস্টবক্স ২৫৩৯ ● কলিকাতা ১

আশ্চর্য!

একটি বিস্ময়কর জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা

"এখন চুপচাপ থাকুন আর দেখে যান, পরে ওদের
বৈজ্ঞানিক কায়দাকানুনকে কাজে লাগানো যাবে।"

'আশ্চর্য!' পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতিমাসে
অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলকাতা ১ কর্তৃক ;
টেলিফোন ৩৪-৭২৭৪ ; টেলিগ্রাম, অ্যালবিপ্যান।

প্রত্যেক পরিবারে
অপরিহার্য

আয়োডিমা

আয়োডিন মলম। গেঁটে বাত, গাঁট ও পেশীর বেদনায় আশ্চর্য ফল দেয়। ব্যবহারে জ্বালা করে না, কাপড়ে দাগ হয় না।

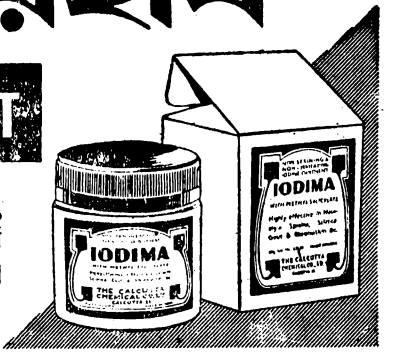

বেনজিটল

সুপরীক্ষিত শক্তিশালী এ্যান্টিসেপ্‌টিক ও সংক্রমণ নিরোধক। কাটা ছেঁড়ায়, রোগীর ঘরে, প্রসূতি পরিচর্যায় বা দাঁড়ি কামানর পরে ব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য রোগবীজ নিবারক রসায়ন।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ,
কলিকাতা ২৯

IBF-58-64

সূচীপত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মামাবাবুর নিদ্রাভঙ্গ"
(অবিস্মরণীয় গল্প চরিত্র ফিরে এল) ৭

অদ্রীশ বর্ধনের "নক্ষত্র"
(চাঞ্চল্যকর গল্প) ১৪৪

মনোরঞ্জন দে'র "ভূগর্ভে টার্জন"
(তিন টাকা দামের সম্পূর্ণ উপন্যাস) ৮

আদিত্যকুমার ভট্টাচার্যের "একটি অবিশ্বাস্য কাহিনী"
(আশ্চর্য কিন্তু এতটুকু-মিথ্যে-নয় গল্প) ১৮২

বিশু দাসের "চাঁদের মেয়ে"
(ধারাবাহিক উপন্যাস—প্রত্যেক পর্বে চমক) ১৬৯

বিশ্বদীপের "মহাজাগতিক জীবন"
(বিস্ময়কর কাহিনী) ১৮৯

প্রদীপ মিত্রের "প্রাগৈতিহাসিক"
(ভয়ানক গল্প) ১৯৩

গৌরীশংকর দে'র "নাগ-নিকেতন"
(শিউরে-ওঠা গল্পকল্প) ... ২০০

"সমুদ্রে কত সম্পদ" (ছবিতে গল্প) ... ২০৪

কার্টুন (অসম্ভব কৌতুক !) ... ১

আজগুবি হাসিরাশি ... ১৫১, ১৯২

'আশ্চর্য !' পত্রিকার সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ।

আপনাদের জন্য আর একটি উদ্দীপনাময় মাসিকপত্র কনসেশন হারে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে—অনুগ্রহ করে এই সংখ্যার ৩য় মলাটে বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন !

আমাদের পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শিল্প উপদেষ্টা হিসাবে চন্দ্রনাথ দে আছেন। এঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বার্ষিক জয়ন্তী সংখ্যা

জানুয়ারী, ১৯৬৫

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক : আকাশ সেন

সহযোগী : ভবানী প্রসাদ ঘোষ

জন্মমাস সংখ্যা

আজ থেকে দুবছর আগে শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকল্পের একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য!'র জয়যাত্রা। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পত্রিকা হয়েও 'আশ্চর্য!' যে অল্প সময়ের মধ্যেই জনচিত্তে স্থান করে নিতে পেরেছে, তার একমাত্র প্রমাণ নিয়মিত প্রকাশ এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা। সবদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিকে পুষ্ট করে তোলার সংকল্প নিয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবীন লেখককেও পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে এই দুবছরে। 'আশ্চর্য!' সায়েন্স-ফিকশ্যন পাঠক এবং লেখক—সবারই মনের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়েছে।

জন্মমাস উপলক্ষ্যেই এই সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হলো। এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি অবিস্মরণীয় গল্প-চরিত্র **মামাবাবুর নিদ্রাভঙ্গ**। সেই গৃহকুঁড়ে অথচ বিপদে তৎপর মানুষটি বহুদিন পর আবার গা-ঝাড়া দিয়েছেন। এঁর নিত্য নতুন অ্যাডভেঞ্চারের চমকপ্রদ কাহিনী এবার থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাবে 'আশ্চর্য!'র পাতায়। আর রইলো অদ্রীশ বর্ধনের একটি বিস্ময়কর গল্প এবং মনোরঞ্জন দের সুবৃহৎ উপন্যাস "ভূগর্ভে টার্জন"।

খাতাপত্র, পুরোন ডায়েরী আবার ঘাঁটতে হল।

স্মরণশক্তি আমার তেমন জোরালো কোন দিনই না। স্কুলে পড়বার সময় সংস্কৃতে ধাতুরূপ শব্দরূপগুলো মুখস্থ করতে না পারার জন্যেই সব চেয়ে বিপদে পড়তাম। এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সে স্মৃতিশক্তির উন্নতি অন্ততঃ হয়নি।

কিন্তু হঠাৎ স্মৃতিশক্তিকে উস্‌কে দেবার জন্যে পুরোনো খাতা ডায়েরীর দরকারই হল কেন?

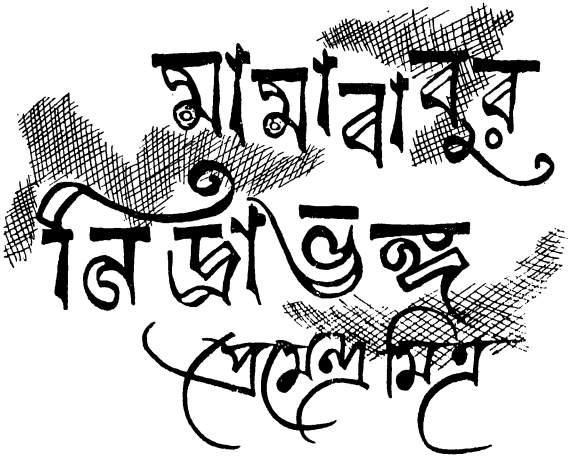

দরকার হল 'আশ্চর্য' কাগজের সম্পাদক মশাইএর জন্যে।

হঠাৎ সেদিন সকাল বেলায় আশ্চর্য ব্যাপার!

ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাইরের দরজায় কে গণপতি বাবু গণপতি বাবু বলে ডাকছেন।

প্রথমটা যেমন হকচকিয়ে গেছলাম তেমনি বিরক্তও হয়েছিলাম একটু। গণপতি আবার কে? না জেনেশুনে এ বাড়িতে এসে গণপতিকে খোঁজবার মানে কি? গণপতি আমার নাম নয় এ বাড়িতে কস্মিনকালে কারুর নাম গণপতি ছিল না।

বেশ একটু রুক্ষ মেজাজ নিয়ে ভদ্রলোককে সে কথা বলবার জন্যে দরজা খুলতে যেতে যেতেই স্মৃতিটা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির বদলে একটু লজ্জাই অনুভব করলাম। তবে বিস্ময়টা সমানই রইল।

গণপতি আমার নাম নয়, তবে একসময়ে এই ছদ্মনামটা ব্যবহার করেছি। ব্যাসদেবের অনুলেখক গণেশের নামটাই এ ছদ্মনামের অনুপ্রেরণা। গণেশ ব্যাসদেবের ভাষণ লিখে গেছেন।

আর আমি লিখেছি মামাবাবুর কীর্তিকাহিনী। ঠিক অনুলেখক না হলেও লিপিকার হিসাবে গণেশের বদলে গণপতি নামটা নিয়েছিলাম। সেই নামেই পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশকের কাছে চিঠিপত্র লেখা ও পাণ্ডুলিপি পাঠানর কাজ করেছি।

কিন্তু এখন হঠাৎ সে নাম ধরে কে খোঁজ করতে এল? কারণই বা কি?

দরজা খোলার পরই রহস্যটা পরিষ্কার হল।

এসেছেন আর কেউ নয়। 'আশ্চর্য!' কাগজের সম্পাদক।

[এরপর ১৫২ পৃষ্ঠা দেখুন]

এ মাসের
সুবৃহৎ
উপন্যাস

ভূগর্ভে টার্জন

মনোরঞ্জন দে

ভয়ানক সরীসৃপ দৈত্যদের
রাজ্যে টার্জনের অ্যাডভেঞ্চার

বনমানুষদের হাতে প্রতিপালিত টার্জন এক অজ্ঞাত জগতে দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চারে নেমেছে·····যে জগতে সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে···যেখানে ভয়ানক সরীসৃপ দৈত্যগুলো আজও রাজত্ব করছে। কেবলমাত্র একটি ছুরি আর চমকপ্রদ বুদ্ধির দীপ্তি নিয়ে টার্জন এই বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে···যে অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। যাঁরা বিপদ আর বন্য এ্যাডভেঞ্চার ভালবাসেন, তাঁরা টার্জনের এই নবতম কাহিনীর আকর্ষণ ছাড়তে পারবেন না। ভূগর্ভে যেখানে সব সময়েই দুপুর, যেখানে মানুষে-মানুষে পশুতে-পশুতে তীব্রতম হানাহানি চলেছে, সেখানে টার্জনের অমানুষিক অভিযান পড়তে পড়তে গভীর উত্তেজনায় আপনি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবেন !

ভূমিকা

পৃথিবীর ভেতরেও যে আর একটা পৃথিবী আছে, একথা অনেকেই জানেন। বাংলায় তাকে বলে পাতাল। পাতালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় এমন লোক বড় একটা দেখা যাবে না আমাদের দেশে। মহাকাব্য রচয়িতাদের উর্বর কল্পনায় এর সৃষ্টি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি

লোকের মনোরাজ্যে এর অধিষ্ঠান। যদিও এর বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান সবাই।

ডেভিড্ ইন্স্ এবং অ্যাবনার পেরী এই সন্দেহেরই নিরসন করলেন। তাঁরা গিয়েছিলেন কয়লার অনুসন্ধানে। আর তাই আবিষ্কার করে ফেললেন একটি অভিনব জগৎ—পেল্যুসিডার। ৫০০ মাইল লম্বা একটা সুড়ঙ্গ কেটেছিলেন তাঁরা। সুড়ঙ্গটা নেমে গিয়েছিল সোজা ভূগর্ভে। অদ্ভুত একটা যন্ত্রযানে চেপে তাঁরা নেমেও গিয়েছিলেন বেশ কিছুটা। অক্সিজেনের অভাবে তৃতীয় দিনে যখন তাঁদের মৃতপ্রায় অবস্থা, তখনই এক অলৌকিক উপায়ে তাঁদের জীবন রক্ষা পেল। এক ঝলক তাজা বাতাসে তাঁদের কেবিন ভরে গেল, আর সম্পূর্ণ নূতন এক রহস্যময় জগৎ দেখা দিল তাঁদের চোখের সামনে।

তারপর শুরু হল অভিযান—কখনও মনোরম, কখনও বা ভয়ঙ্কর। অ্যাবনার পেরী আর ফিরলেন না বাইরের পৃথিবীতে। ডেভিড্ ইনস্ ফিরলেন বটে, তা-ও মাত্র দিন কয়েকের জন্য। তাঁর আবিষ্কৃত জগতে তিনি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সুফলগুলি নিয়ে যেতে চাইলেন। সেখানকার সভ্যতা তখনও প্রস্তর যুগ কাটিয়ে এগোতে পারে নি। তিনি চাইলেন, সভ্যতার বিকাশ ত্বরান্বিত করতে।

কিন্তু চাইলেই তো সব হয় না। পেরীর সাধ ছিল অনেক—সাধ্য ছিল না। সেই আদিম মানুষ, সেই বন্য জন্তু আর সরীসৃপের রাজত্ব, পেল্যুসিডারে সেই প্রস্তর যুগের আধিপত্য—সব কিছুই তো আর রাতারাতি পালটিয়ে ফেলা যায় না। উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে। সভ্য জগতের এই দুই প্রতিভূ না থাকলেও হয়ত এভাবেই উন্নতি হত।

বিরাট জগৎ এই পেল্যুসিডার। তবে কি পৃথিবীর ওপরকার জগতের চেয়েও বিরাট? কয়েকটা কথা বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ভূপৃষ্ঠে স্থলভাগের পরিমাণ পাঁচ কোটি তিরিশ লক্ষ বর্গ মাইল। এখানে তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল। পেল্যুসিডারের অবস্থা কিন্তু একেবারেই বিপরীত। সেখানে তিন ভাগ স্থল আর এক ভাগ জল। বন-জঙ্গল, সমভূমি-মালভূমি মিলিয়ে স্থলভাগের পরিমাণ সেখানে ১২৪,১১০,০০০ বর্গ মাইল। সমুদ্রের পরিমাণ কমবেশী ৪১,৩৭০,০০০ বর্গ মাইল। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, বাইরের পৃথিবীর চেয়েও পেল্যুসিডারের স্থলভাগের পরিমাণ অনেক বেশী। মজার কথাই বটে—ছোট একটি জগতের পেটের ভেতর সেঁধিয়ে আছে বিরাট এক জগৎ! বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি আর কাকে বলে!

পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পেল্যুসিডারের সূর্য। বাইরের সূর্যের সাথে সামঞ্জস্য তার খুবই কম। আলোর দিক দিয়ে যেন অনেকটা নিষ্প্রভ, আকারের দিক দিয়েও তেমনি ছোট একটি বর্তুল ছাড়া আর কিছু নয়! তবু এরই রশ্মিতে সেখানকার জীবজগৎ আর উদ্ভিদজগৎ প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সেখানে রাত নেই—আছে অখণ্ড দিবসের সীমাহীন জয়যাত্রা।

সেখানকার সূর্য গতিহীন অচঞ্চল। আকাশে কোন চাঁদ নেই—তারাও নেই। তাই সেখানে দিকনির্ণয় বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমন কি, দিকচক্রবাল বলেও কিছু নেই সেখানে। যেখানেই দাঁড়ানো যাক না কেন, দেখা যাবে, জমি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। বনজঙ্গল, পর্বতমালা সব কিছুই ওপর দিকে উঠতে উঠতে দৃষ্টির সীমার বাইরে চলে যাবে। দিনরাতের তারতম্য না থাকায় সেখানে সপ্তাহ মাস বৎসর বলেও কিছু নেই। ফলে ঋতুভেদও নিয়মমাফিক হয় না, আর সময় বলে কোন জিনিসেরও অস্তিত্ব নেই। যা আছে তা অনিয়মের রাজত্ব—অফুরন্ত অবসরের আধিপত্য। কেউ সেখানে বলে না—সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।

সভ্য জগতের মানুষেরা তিনবার পেল্যুসিডারের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছিল। পেরেছিল বেতার মারফত। প্রস্তর যুগের মানুষদের কাছে মিঃ পেরীর প্রথম অবদান বারুদ। তারপর একে একে তিনি তাদের দিয়ে তৈরী করালেন বন্দুক, কামান, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি। শেষে নিজে তৈরী করলেন রেডিও। বাইরের জগতের সবরকম দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ধরবার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা এই রেডিও-তে ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন টার্জানা প্রদেশের জ্যাসন গ্রিডলের সাথে যোগাযোগ করতে—পেরেছিলেনও।

বেতার যোগাযোগ চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে তিনি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। পেল্যুসিডারের প্রথম সম্রাট্ ডেভিড্ ইনস্ নাকি বিপদে পড়েছিলেন। সারি রাজ্য থেকে উৎখাত করে তাঁকে নাকি কোর্সারস্ রাজ্যের অন্ধ কারাগারে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল। সভ্য জগতের উদ্দেশ্যে এটাই ছিল তাঁর শেষ আবেদন। সেই আবেদনে কি করে সাড়া দেওয়া হল, এবং তার ফলই বা কি হল, তাই আমরা দেখতে পাব ক্রমে।

[১]

হঠাৎ থেমে গিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিল টার্জন। কান খাড়া করে কি যেন শোনবার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। আপনি কি আমি যদি সেখানে থাকতাম তো কিছুই শুনতে পেতাম না, বুঝতেও পারতাম না—শুধুমাত্র পচা-গলা লতাপাতার দুর্গন্ধ কিংবা পল্লবিত কুসুমিত গাছপালার মধুর সুরভি ছাড়া।

টার্জন কিন্তু শুনতে পেল। বহুদূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ শব্দ কানে ঢুকল তার, শব্দটা কোথা থেকে আসছে ঠিক বোঝা না গেলেও, ওটা যে একদল মানুষের এগিয়ে আসার বার্তা ঘোষণা করছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না। কারণ, হাতি, গণ্ডার কি সিংহ আনাগোনা করলেও সে তা টের পাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। অথচ মানুষের উপস্থিতি মুহূর্তে তাকে সজাগ করে তোলে। মানুষই একমাত্র জীব যার পদক্ষেপ মাত্রই প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে অশান্তির ছোঁয়া লাগে।

গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি প্রাণীদের মাঝে লালিতপালিত হয়েছে সে। তাদের চলাফেরার প্রতিটি ভঙ্গী তার সুপরিচিত। মানুষের সাথে এদের গতিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জঙ্গলের মাঝে পথ করে নিয়ে মানুষেরা যখন এগোতে থাকে তখন বিচিত্র আওয়াজে ভরে ওঠে চারদিক। সত্য বটে, বিভিন্ন জাতের মানুষের সাথে টার্জনের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা আছে। তার অর্থ এই নয় যে, তার আরণ্য রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ সে বরদাস্ত করবে। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলল টার্জন। তারপর গাছের ঝুরি অবলম্বন করে শূন্যপথে এগিয়ে চলল শব্দের উৎপত্তি-স্থলের দিকে।

গন্তব্যস্থল এগিয়ে আসতে লাগল। আর ততই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল বাহকদের নগ্ন পদের ছন্দোময় ধ্বনি এবং 'হুনহুনা' গানের আশ্চর্য সুন্দর সুর। ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারল, বাহকেরা কালো চামড়ার লোক। তবে ওদের মাঝে অন্ততঃ একজন যে সাদা চামড়ার লোক ছিল তা-ও বুঝতে বিলম্ব হল না। পায়ে চলা নাতিদীর্ঘ বুনো পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল টার্জন। সার বেঁধে এগিয়ে আসা দলটির সাথে মোলাকাতের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল সে।

পথটা ঠিক যেখানে বাঁক খেয়েছে সেখানে এসে থমকে দাঁড়াল দলটা। জঙ্গলের সেই সুনিবিড় পরিবেশে অমন জাঁদরেল চেহারার একজন লোকের

আকস্মিক আবির্ভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল সবাই। চাপা কলগুঞ্জন শুরু হয়েছিল তাদের মধ্যে। বলা বাহুল্য, আগন্তুকেরা টার্জনের নাম শুনেছিল বটে, কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না কারোই।

সদম্ভে ঘোষণা করল টার্জন, 'আমারই নাম টার্জন। তোমরা এখানে কি করতে এসেছ?'

দলের পুরোভাগে ছিলেন দলপতি। আনন্দে আত্মহারা হলেন তিনি। বললেন, 'কি ভাগ্য! আপনাকে এত সহজে পেয়ে যাব, আশাই করিনি। সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আমরা আসছি।'

'আপনারা কে? আমার সাথে আপনাদের প্রয়োজনই বা কি?'

'আমার নাম জ্যাসন গ্রিডলে। কেন এসেছি তা বলতে গেলে অনেক সময় নেবে। আগে আমাদের তাঁবু ফেলতে হবে। সবাই আমরা পরিশ্রান্ত। আমাদের পথপ্রদর্শক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় একটা গ্রামে রেখে এসেছি তাকে। পথঘাট আমাদের অচেনা। কতদূর গেলে তাঁবু ফেলার ভাল জায়গা পাওয়া যাবে তা-ও জানি না।'

'আমার সাথে আসুন। আধ মাইল দূরে একটা লেকের পাড়ে ভাল জায়গা আছে।'

'চমৎকার!' গ্রিডলে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। খুশীর আবেগে বাহকেরাও উৎফুল্ল। আসন্ন তাঁবু ফেলার সম্ভাবনায় তারা বেজায় খুশী। এল কাজের কথা। মৃদু হেসে গ্রিডলে বলল, 'যে-কারণে এখানে এসেছি, বললে বিশ্বাস করবেন কি-না জানি না। কি ভাবে আমার বক্তব্য আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না। তবে বলে রাখি, যে-মতলব নিয়ে এখানে এসেছি তা রূপায়িত করবার জন্য ইতিমধ্যে বেশ কিছু অর্থ এবং সময় খরচ করে বসে আছি। প্রয়োজন হলে আমার যথাসর্বস্ব নিয়োগ করতেও পিছপা হব না। খোদ কথা কথা, আমার পরিকল্পিত অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করতেই হবে। কিন্তু একথা শোনাতেই শুধু এখানে আসিনি। এসেছি, আপনার মতামত জানতে এবং এই অভিযানে আপনাকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবার অনুরোধ জানাতে।'

'আমি রাজী আছি। এখন বলুন, অভিযান কোথায় চালানো হবে।'

'বলছি। আচ্ছা, একথা কি আপনি শুনেছেন কখনো যে পৃথিবীটা আসলে নিরেট নয়—একটা শূন্যগর্ভ বর্তুল মাত্র; আর পৃথিবীর ভেতরে বাসযোগ্য আর একটা অঞ্চল আছে।'

'বিজ্ঞানীরা তো কত থিওরীই বার করছেন। যতক্ষণ না অপরের কাছে তার সমর্থন পাওয়া যায় ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করা যায় না।'

'আমি কিন্তু থিওরীটাকে সমর্থন করি। শুধু সমর্থন করি না—বিশ্বাসও করি। সম্প্রতি আভ্যন্তরীণ জগতের সাথে আমরা বেতার মারফত যোগাযোগও করেছি। ভেতরের জগতটাকে বলা হয় পেল্যুসিডার। অ্যাব্‌নার পেরী সেখানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকেই বার্তা এসেছে। খবরটা যখন আমাদের কাছে বেতারে এসে পৌঁছয়, তখন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার পাশে হাজির ছিলেন। খবরটার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে সার্টিফিকেটও নিয়ে এসেছি।'

পোর্টফোলিও থেকে হাতে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি বের করে দিল ম্যাসন গ্রিডলে।

টার্জন বলল, 'আপনি আমাকে অবাক করলেন দেখছি। আর এত বড় পাণ্ডুলিপি পড়তেও তো অনেক সময় নেবে! তার চেয়ে বরং আপনি বলুন—আমি শুনি।'

'তাই ভাল।' উত্তর দিল গ্রিডলে।

আধঘণ্টা ধরে সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে গেল গ্রিডলে। পরিশেষে মন্তব্য করল, 'এজন্যই আমি পেল্যুসিডারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি। ডেভিড্ ইনস্ বিপদে পড়েছেন। কোর্‌সারস্ রাজ্যে তিনি বন্দী হয়ে আছেন। তাঁকে মুক্ত করার জন্যই আমাদের এই অভিযান।'

'কিভাবে এই পরিকল্পনা সফল করা যাবে বলে মনে করেন? ডেভিড্ ইনস্-এর থিওরী কি আপনি বিশ্বাস করেন? উভয় মেরুতেই আভ্যন্তরীণ জগতে প্রবেশের পথ আছে—একথা কি সত্য বলে মনে হয়?'

'কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা নয়, সেটা নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। সত্যতা যাচাই করে দেখতে হবে। তবে থিওরীটা যে মিথ্যে তার পরিচয় পাওয়া গেছে ১৮৩০ সালে লেখা একটা বই-তে। অধুনা প্রকাশিত একটা বইতেও এই থিওরীর সমর্থন মেলে। সেখানে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া আছে, কেন বিজ্ঞান এই থিওরীটা মেনে নেয়।'

'যেমন—।' কথার মাঝখানে বলে উঠল টার্জন।

'যেমন, উত্তর মেরু থেকে তপ্ত বাতাস এবং উষ্ণ সমুদ্রস্রোত বয়ে আসতে দেখা যায় প্রায়ই। সুমেরু অভিযাত্রীরাও একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই

সমুদ্রস্রোতে জীবদেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গাছের ডালপালা এবং আরো এমন সব জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে, পৃথিবীর ওপরের স্তরে যার অস্তিত্ব মোটেই নেই। আমরা সুমেরু প্রভার কথা জানি। ডেভিড্ ইনস্ সেটার ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে। পেল্যুসিডারের সূর্যের আলো মেরুদেশীয় ছিদ্র পথে বাইরে বেরিয়ে আসে। কুয়াশা এবং মেঘের মাঝে তার প্রতিফলনকেই আমরা সুমেরু প্রভা বলি। বরফ এবং হিমবাহের গায়ে মাঝে মাঝে ফুলের রেণু আর ফলের বীজ দেখা যায়। আভ্যন্তরীণ জগৎ ছাড়া কোন জায়গা থেকেই এই ধরনের বীজ এবং পরাগ আসা সম্ভবপর নয়। সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত এস্কিমোরা। এদের পূর্বপুরুষেরা উত্তর থেকেই এসেছিল। সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ জগৎ থেকেই এসেছিল তারা।'

একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল গ্রিডলে, 'মেরুদেশীয় প্রবেশপথ এত বড় যে, একটা জাহাজ কি একটা বেলুন বা এরোপ্লেন অনায়াসে তার মধ্য দিয়ে ঢুকে যেতে পারে। নিরাপদে যদি ফিরে আসতে পারে তো চালকেরা হয়ত বুঝতেই পারবে না, কোথায় গিয়েছিল এবং কতদূরই বা গিয়েছিল! তারা মনে করবে, ওপরের পৃথিবীরই একটা জায়গায় হাজির হয়েছিল তারা। শুধু কম্পাসের খামখেয়ালী ঘুরপাকের কারণটাই তাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকবে মেরু অভিযাত্রীরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটার কূলকিনারা করতে পারেননি এখনো।'

টার্জন বলল, 'আভ্যন্তরীণ জগৎ যে একটা আছে, বোঝা গেল। সেখানে যাবার পথও যে একটা আছে, সেটাও যুক্তির খাতিরে মেনে নিলাম। কিন্তু সে-পথ চেনা যাবে কি করে?'

'আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে সেই পথটিকে খুঁজে বের করা। পরিবহন সমস্যা মেটাবার জন্য বিমান ব্যবহার করতে হবে আমাদের। আধুনিক জেপেলিনের আকারে গঠন করা হবে সেই বিমান। সতর্কতার খাতিরে হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। ফেরবার সময় বিপদ দেখা দিতে পারে—হিলিয়াম গ্যাস নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ফলেই হয়ত বিপদ দেখা দেবে। কিন্তু অভিযাত্রী মাত্রেই তো মরণকে পায়ের ভৃত্য করেই অভিযানে অগ্রসর হয়। সে-কথা নয়। কথা হচ্ছে, বিমানটাকে যথাসম্ভব মজবুত এবং কাঠামোটাকে যদ্দুর হাল্কা করা যায় করতে হবে। হাইড্রোজেন গ্যাস সবচেয়ে হাল্কা ঠিকই।

কিন্তু এটা এত বিপজ্জনক যে পারলে এর ব্যবহার একদম বাতিল করতে হবে। মনে হয়, মাস ছয়েক সময় নেবে বিমানটি তৈরী করতে।'

ঠিক ছয় মাস সময়ই লাগল। আমেরিকার বিখ্যাত একটি কারখানায় তৈরী হল বিমানখানা। সবাই একে জানলো 0-220 হিসেবে। চুরুটের মত দেখতে হল কাঠামোটা, লম্বায় ৯৯৭ ফুট, আর চওড়ায় ১৫০ ফুট। বিমানের ভেতরটা ছয়টি বিরাট বিরাট বায়ু-নিরুদ্ধ কক্ষে বিভক্ত। ওপরের কক্ষ তিনটি লম্বায় বিমানের দৈর্ঘ্যের সাথে সমান। নিচের কামরা তিনটি সমানভাগে ভাগ করা। বিমানটিতে ইঞ্জিন, মোটর এবং পাম্প নূতন ভঙ্গীতে বসানো। গ্যাসোলিন এবং তেল সরবরাহের ব্যবস্থাও অতি উত্তম।

বিমানটির বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়ে এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে, সব দিক দিয়ে একে নিখুঁত করে তোলা হয়েছিল। এতে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের সাথে এক খানা মেশিনগানও ছিল। আর ছিল একখানা মনোপ্লেন। ইঞ্জিনগুলোর সম্মিলিত শক্তি ৫৬০০ অশ্বশক্তির সমান। বিমানখানার বেগ ঘণ্টায় ১০৫ মাইল। অফিসার এবং সাধারণ কর্মচারীদের কক্ষ ছিল পৃথক পৃথক। অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হয়েছিল একটি বড় কক্ষে। খাবার-দাবার এবং জলের ট্যাঙ্ক ছিল একটিতে। প্রভূত পরিমাণ তেল এবং গ্যাসোলিনের সঞ্চয় ছিল আর একটি কক্ষে।

সকল রকম আয়োজন শেষ হল। যোগাড়যন্ত্র যা করবার করা হল। তারপর ঘনিয়ে এল অভিযানের পালা। টার্জন এবং জ্যাসন গ্রিডলেই এ-অভিযানের যথাক্রমে নায়ক এবং উদ্যোক্তা। উত্তর মেরুতে যেতে হবে প্রথমে। সেখানে আভ্যন্তরীণ জগতে প্রবেশের পথ খুঁজতে হবে তাদের। পথ খুঁজে পেলে পেল্যুসিডারে যেতে হবে। এবং সেখানকার সম্রাট্ ডেভিড্ ইনস্-কে কোর্সারস্ রাজ্যের অন্ধ কারাগার থেকে মুক্তি দিতে হবে।

[২]

জুন মাস। [redacted]লের আলো তখনও ফুটে ওঠেনি। পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে 0-220 বিমানখানা। অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্যসম্ভারের কোন অপ্রতুলতা নেই। যাত্রীদের মধ্যে আছে ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার, সহকারী কর্মচারী ভন্ হোষ্ট এবং ডোর্ফ, নাবিক হাইনস্, বারোজন ইঞ্জিনিয়ার, আটজন মেকানিকস্, একজন নিগ্রো পাচক এবং দু-জন কেবিন-বয়। টার্জনকে

করা হয়েছে কম্যাণ্ডার। জ্যাসন গ্রিডলে হয়েছে তার সহকারী। মুভিরো এবং তার ন-জন সুদক্ষ যোদ্ধা নিয়ে একটি বাহিনীও গঠন করা হয়েছে।

এত বড় একটা দল নিয়ে যাওয়ার সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। টার্জনই তার সমাধান করে দিয়েছে। সে বলেছে, 'সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জগতে আমাদের অভিযান শুরু হচ্ছে। এই সফরে কতদিন লাগবে বলা যায় না। আমাদের নানারূপ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে, অনেক লড়াই করতে হবে। আমাদের সবাই হয়তো অক্ষত দেহে ফিরে না-ও আসতে পারি। তাই কিছু লোক বেশী নেওয়াই ভাল। নাহলে ফিরে আসার সময় দারুণ অসুবিধেয় পড়তে হবে। অবশ্য, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন দলের প্রতিটি লোককে নিয়ে আমরা ফিরে আসতে পারি।'

গ্রীণউইচের পূর্বে দশ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ বরাবর উত্তর দিকে এগিয়ে যাওয়া স্থির হল। কড়াকড়িভাবে এই পথ অনুসরণ না করে একটু-আধটু এদিকে-সেদিকে যাওয়ারও প্রয়োজন হয়ে পড়ল, যাতে করে লোকের দৃষ্টি অহেতুক তাদের দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং অভিযানের সারা পরিকল্পনাটাই গোপন থাকে। হ্যামবুর্গকে পশ্চিমে ফেলে উত্তর মহাসাগরের ওপর দিয়ে বিমানখানা বরফের রাজ্য উত্তর মেরুর দিকে এগিয়ে চলল।

দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত্রে বিমানখানা উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে যেতে থাকলে সমস্ত দলটির মাঝে যেন অভূতপূর্ব একটা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। টার্জনের নির্দেশ মতো তুষার এবং হিমবাহ আচ্ছাদিত সুমেরুর কয়েকশো ফিট ওপর দিয়ে বৃত্তাকারে চক্কর খেতে লাগল বিমানখানা।

জ্যাসন গ্রিডলে সারাক্ষণ হাইনস্ এবং জুপ্‌নার-এর পাশে পাশে রইল। কখনো মেতে থাকল কলকব্জার তদারকী কাজে, কখনো বা জনহীন মেরুপ্রদেশের সীমাহীন বরফের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সামনে ছিল নানাবিধ যন্ত্র। যেমন, কম্পাস, অ্যানেরয়েড্, বাব্‌ল স্ট্যাটোস্কোপ, এয়ার স্পীড্ ইনডিকেটর, রাইজ এণ্ড ফল ইণ্ডিকেটর, ঘড়ি, থার্মোমিটার ইত্যাদি। কিন্তু সকল যন্ত্রের মধ্যে কম্পাসের গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক। কারণ এর আচরণ দেখেই মেরুদেশীয় প্রবেশ পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

কয়েকবার চক্কর খেয়ে বিমানখানা ১৭০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা বরাবর এগিয়ে চলল। পাঁচ ঘণ্টা চলার পরে বিমানখানা ক্ষণে ক্ষণে পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইল।

গ্রিডলের উত্তেজিত গলার স্বর শোনা গেল, 'বিমানটিকে সোজা এগিয়ে নিয়ে চলুন, ক্যাপ্টেন। আমার মনে হচ্ছে, মেরুদেশীয় ছিদ্র পথের ঠিক ফাটল বরাবর এগিয়ে চলেছি আমরা। কম্পাসের কাঁটা সরে যাচ্ছে বটে, জাহাজটা কিন্তু মোটেই দিক পরিবর্তন করে নি। এভাবে আমরা যতই এগিয়ে যাব, কম্পাসের কাঁটাটাও ততই চঞ্চল হয়ে উঠবে। এই চাঞ্চল্য ক্রমে এলোমেলো ঘুরপাকে পরিণত হবে—যদি আমরা সোজা ওপরে উঠি, কি খাড়া নিচে নেমে যেতে থাকি, আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পেল্যুসিডারে গিয়ে পড়ব। পরবর্তী চারশো থেকে ছশো মাইল পর্যন্ত কম্পাস কোন কাজেই আসবে না।'

ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার কথাটা সমর্থন করে বলল, 'আবহাওয়া যদি ভাল থাকে তো কোন অসুবিধে হবে না। কম্পাস ছাড়াই ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাব। নাহলে সোজাসুজি বিমানটিকে পেল্যুসিডারের ভেতরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব কি না সন্দেহ আছে।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা তো করুন।' গ্রিডলে বলল। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত কারো সাথে কোন কথার আদান-প্রদান হল না। প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগে প্রতিটি লোক সাময়িকভাবে নির্বাক হয়ে রইল। সহসা সবাইকে সচকিত করে চেঁচিয়ে উঠল হাইনস্, 'দেখুন, সামনেই বিশাল সমুদ্র।'

'ওতে অবাক হবার কিছুই নেই। বাইরের পৃথিবীর সাগরও তো হতে পারে ওটা।' জুপ্‌নার বলল।

গ্রিডলে উত্তর দিল, 'তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু এই ক-ঘণ্টা ধরে কেউ যদি সূর্যের দিকে লক্ষ্য করে থাকেন তো নিশ্চয়ই দেখেছেন যে মাঝ রাতের সূর্য বড় বেশী নিচের দিকে হেলে পড়েছে। আমরা মেরুদেশীয় ফাটল খুঁজে পেয়েছি কি-না জানি না। তবে এই জায়গাটা যে কমলালেবুর মত চাপা সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সূর্যের অবস্থানই তো সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছে। আরো এগিয়ে গেলে সূর্য একেবারেই দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। আর তখনই পেল্যুসিডারের সূর্যের আলো আমাদের নজরে পড়বে।'

কথাটা কতদূর সত্য হয় দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে রইল সবাই। চমকের পর চমক অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। বেশীক্ষণ দেরী করতে হল না। স্থল-ভাগ দেখে প্রথমেই চমকে উঠল ক্যাপ্টেন। বলল, 'আমাদের চার্ট অনুযায়ী সাইবেরিয়া ছাড়া এ অঞ্চলে কোন স্থল-ভাগ নেই। কিন্তু সাইবেরিয়া তো ৮৫°

ডিগ্রীর এক হাজার মাইল দক্ষিণে। আমরা এখন ৮৫° ডিগ্রীর তিনশো মাইল দক্ষিণে আছি। তাহলে কি অমরা মেরুদেশে নূতন স্থলভাগ আবিষ্কার করলাম? না-কি মিষ্টার গ্রিডলের কথাই সত্য হল?

হেসে উত্তর দিল গ্রিডলে, 'আমরা এখন পেল্যুসিডারের দক্ষিণ ভূভাগের দিকে উড়ে যাচ্ছি।'

বিমানের ভেতরকার প্রতিটি লোক নূতন দেশের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। তবু আপন আপন কাজ ফেলে বাইরে তাকিয়ে থাকার অবসর কারো নেই। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ওপর ২০° ডিগ্রী। নীচে নির্জন ভূভাগের ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ বরফের সমাবেশ। 0-220 আরও খানিকটা অগ্রসর হবার পর মেরুদেশীয় মধ্যরাতের সূর্য অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হল পেল্যুসিডারের কেন্দ্রীয় সূর্য। দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজি পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। প্রথমে পড়ল রুক্ষ প্রান্তর। তারপর দেখা দিল বৃক্ষময় পাহাড়। তারপর বনভূমি নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে হতে ঢালু জমির ওপর দিকে উঠে যেতে লাগল। শেষে সীমাহীন দূরত্বের অস্পষ্টতায় মিলিয়ে গেল সব।

টার্জনও পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সব। বনভূমির নিচের দিকে অসংখ্য নির্ঝরিণী বয়ে চলেছিল। বিরাট একটি নদীতে গিয়ে শেষ হচ্ছিল তাদের যাত্রা। বন্যজন্তুর বিরাট এক-একটা দল চরে বেড়াচ্ছিল সেখানে। মানুষের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছিল না কোথাও। মনের আনন্দ মুখে প্রকাশ করল টার্জন, 'কি সুন্দর জায়গা! এবার বিমান নামানো যাক—আমাদের গন্তব্যস্থল এসে গেছে।'

ধীরে ধীরে সেই অতিকায় বিমানটি নেমে এল মাটিতে। ছোট ছোট মই নামিয়ে দেওয়া হল। ভেতরে কয়েকজনকে রেখে বাকী সবাই নূতন জমিতে পদার্পণ করল। হাঁটু-সমান ঘাস বিরাট প্রান্তরটা জুড়ে হিল্লোলিত হচ্ছিল বাতাসের দমকে দমকে।

'এখন কিছু তাজা মাংস না হলে চলছে না', টার্জন বলল, 'কিন্তু বিমানের শব্দে সব প্রাণীই যে পালিয়েছে।'

'যাবে কোথায়—ধারেকাছেই কোথাও আবার চরে বেড়াচ্ছে তারা।' ক্যাপ্টেন উত্তর দিল।

টার্জন বলল, 'শিকার করতে এখন মন উঠছে না। এখন একটু বিশ্রাম নিতে

হবে—ঘুমোতে হবে। হপ্তাখানেক ধরে আমাদের কেউই দু-ঘণ্টার বেশী দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি। কয়েকটা দিন আমরা খেয়ে ঘুমিয়ে আরাম করে নিয়ে কোর্সার রাজ্যে খুঁজতে বের হব। আপনাদের কি মত?'

একবাক্যে রাজী হল সবাই।

ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার বলল, 'দলের কেউই আপনার অনুমতি ছাড়া বনভূমিতে একা ঘুরে বেড়াতে বা শিকারে যেতে পারবে না। যদি কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, কড়া শাস্তি পেতে হবে তার। পদে পদে আমাদের এখন বিপদের মকাবিলা করতে হতে পারে। অবশ্য ইচ্ছে করলে একাকী আপনিই শুধু বনে ভ্রমণ করতে পারবেন। আমাদের কারো আপত্তি নেই তাতে।'

পালা করে সবাই ঘুমিয়ে নিতে লাগল বিমানের অভ্যন্তরে। টার্জন ঘুম থেকে উঠল সবার আগে। প্রথমেই সে বাড়ীতে জামাকাপড় সব খুলে ফেলল। আফ্রিকার জঙ্গল থেকে শহরে যাবার সময় যে-সব কোট-প্যাণ্ট পরেছিল সে, এতকাল তা গায়েই ছিল। কেবিন থেকে যখন নেমে এল সে তখন কৌপীনসর্বস্ব এই পুরুষটিকে দেখে যে-কেউ আদিম মানুষ বলে ভুল করতে পারত। সঙ্গে ছিল তার শিকারের ছুরি, বর্শা, তীর-ধনুক। একখণ্ড লম্বা দড়ি সুন্দরভাবে গুটানো অবস্থায় কোমরে ঝোলান ছিল।

লেফটেন্যাণ্ট ডোর্ফ তখন ডিউটিতে ছিল। টার্জনের বহির্গমন তার দৃষ্টি এড়াল না, উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে টার্জনের সুঠাম দেহখানিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে দেখল সে। বন্য পরিবেশে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল টার্জনকে।

লোকালয় থেকে, সভ্য সমাজ থেকে, এমন কি বিমানের ভেতরকার সীমাবদ্ধ আবেষ্টনী থেকে প্রকৃতির কোলে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল টার্জন। আবার দেখতে পেল বিশালকায় সব মহীরুহ—কতকগুলি তার পরিচিত, আর বাকীগুলি অপরিচিত। অবাক কৌতূহলে সব নিরীক্ষণ করেও তার আশ মিটল না। ঠিক যেন স্কুল-পালানো ছোট একটি ছেলে সে।

অযথা কালক্ষেপ না করে লাফিয়ে উঠল একটা বড় গাছে। ঝুলে পড়া লতাপাতার দোদুল্যমান এক-একটা দড়ি অবলম্বন করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল আনন্দ উচ্ছল বন্য সজীবতার মধ্য দিয়ে। কত অজানিত পাখি কিচিরমিচির শব্দে উড়ে বেড়াতে লাগল তার চারপাশে। অদ্ভুত সব জন্তু তাকে দেখে আত্মগোপন করল। কিন্তু কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। শিকারের প্রবৃত্তি ছিল না

তখন। নূতনকে খুঁজে ফেরার মনোভাবও ছিল না। সেই মুহূর্তে প্রাণভরে জীবনকে উপভোগ করছিল শুধু।

নিজের ভাবে এতই বিভোর হয়েছিল টার্জন যে কতটা পথ সে পাড়ি দিল আর কতক্ষণই বা কেটে গেল তার কোনটাই সে খেয়াল করেনি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে সময় বোঝবারও কোন উপায় ছিল না। মাথার ওপর অনড় অচল সূর্য চিরভাস্বর দ্যুতিতে দীপ্তিমান। বাইরের পৃথিবীতে তখন পৃথিবীর দুর্বার গতির সাথে তাল রেখে জীবনও ছুটে চলেছে অর্থহীন অন্ধ আবেগে। অথচ পেল্যুসিডারের জীবন বয়ে চলেছে ঢিমে তেতালা চালে।

মুগ্ধ আবেশ একটু স্তিমিত হয়ে আসার সাথে সাথে বেগ কমিয়ে দিল টার্জন। পরিষ্কার একটি পথচিহ্ন লক্ষ্য করে নেমে এল সে। পায়ে চলা পথ ধরে যতই এগিয়ে চলল ততই বিজ্ঞানীসুলভ সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল অতিকায় সব গাছপালা। এসব আদ্যিকালের গাছপালার তুলনায় তার নিজস্ব বনভূমির গাছপালাও অতি আধুনিক স্তরের মনে হয়। এই যে সব রাক্ষুসে ফুল অপর্যাপ্ত পরিমাণে চারদিকে ফুটে রয়েছে, ওপরের পৃথিবীতে কতযুগ আগে এদের অস্তিত্ব ছিল বলা যায় না। এসব চিন্তায় যখন টার্জনের মন ভারাক্রান্ত তখন কি যেন একটা সবলে জাপটিয়ে ধরল তাকে। আর পরের মুহূর্তেই একটা ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠে গেল সে।

ঘটনার আকস্মিকতায় এতই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিল তার। তবে বুঝল ঠিকই এবং বুঝতে পেরে একটা ম্লান হাসি খেলে গেল তার অধর পল্লবে। পথের মাঝে বন্যজন্তু ধরার একটা ফাঁদ পাতা ছিল। অসতর্ক হয়ে পথ চলায় সেই ফাঁদে আটকে গেছে সে।

নুয়ে পড়া একটা গাছের ডালে দৃঢ়ভাবে বাঁধা একটা ফাঁদ পথের মাঝে বিছিয়ে দেওয়া ছিল। ফাঁদের ঘোড়ার ওপর পা দেওয়ায় সে উল্টে গেছে, আর ফাঁদের কর্কশ রজ্জু চারদিক দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরে উঠে গেছে ছ-ফুট উঁচুতে। ঊর্ধ্বপদ হেঁট-মুণ্ডু হয়ে অসহায়ভাবে পাক খেতে লাগল সে। নির্মম কঠিন দড়ির দৌলতে কোমর পর্যন্ত হাত দুটো চেপে বসে আছে। কোমরে ঝোলান শিকারের ছুরিটা নাগাল পাবার সামর্থ্যও তাদের নেই।

ফাঁদ যখন আছে তখন মানুষও আছে। তবে তারা যে এখনো সভ্যস্তরে পৌঁছতে পারেনি ফাঁদটার গঠনপ্রণালী দেখলেই সেটা বোঝা যায়। বন্য মানুষদের স্বভাব-চরিত্র টার্জনের একেবারে অজানা নয়। পাছে অন্য জন্তু এসে

তাদের ফাঁদে ধরা শিকারে ভাগ বসায়, তাই ফাঁদটা বেশীক্ষণ তারা অদেখা অবস্থায় ফেলে রাখবে না। কিন্তু কি জাতের লোক এরা? এসব জাতের বন্য লোকের সাথে ইতিপূর্বে কি পরিচিত হয়েছে সে? যে-জাতের মানুষই তারা হোক না কেন, তাদের শিকার মাংসাশী পশুপাখির খপ্পরে পড়ার আগেই হয়ত তারা হাজির হবে।

কিছুক্ষণ পরে অস্পষ্ট পদশব্দ কানে যেতেই দেহে মনে সজাগ হয়ে উঠল টার্জন। না, কোন মানুষের পদশব্দ এ নয়। বাঘ, সিংহ কিংবা হাতির পদশব্দও নয়। ক্ষুরওলা কোন প্রাণী নিশ্চয়ই অবাধ আলস্যে হেলেদুলে এগিয়ে আসছিল। বাতাস বইছিল উল্টোদিকে। ফলে গন্ধ শুঁকে টার্জনের অস্তিত্ব সে টের পায়নি। আবার তার গন্ধ টার্জনের নাকে না আসায়, সেও বুঝতে পারেনি কি জাতের প্রাণী সেটা।

ঠিক তখন অন্য দিক থেকে আর একটা প্রাণীর গন্ধ নাকে আসতেই মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল তার। প্রবল কোন শত্রু নিকটস্থ হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিত তার মধ্যে। বাঘ জাতীয় কোন প্রাণী চোরের মত চুপি চুপি এগিয়ে আসছিল। এই চরম সংকটেও টার্জন নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিল যে হয়ত তার অস্তিত্ব টের পায় নি প্রাণীটা—হয়ত ক্ষুরওলা প্রাণীটাই তার লক্ষ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষুরওলা প্রাণীটা তার নজরে পড়ল। অতিকায় একটি মোষ যেন। মাথায় সুপুষ্ট বিরাট দুটো শিং, গায়ে দারুণ ঘন লোম। জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের মতে বহু কোটি বছর পূর্বে ষাঁড়জাতীয় এই প্রাণীদের অস্তিত্ব ছিল ওপরের পৃথিবীতে।

জালে আটকানো লোকটাকে পথের মাঝে ঘুরপাক খেতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল প্রাণীটা। টার্জন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। ভয় দেখিয়ে প্রাণীটাকে তাড়িয়ে দেওয়া এখন যুক্তিযুক্ত নয়। শিকারী প্রাণীটা এই মোষটার ঘাড়েও তো লাফিয়ে পড়তে পারে। আর এ যদি পগার পার হয়ে যায় তো দুর্ভাগ্যটা একমাত্র টার্জনের বরাতেই দেখা দেবে। নিজের দুর্ভাগ্য যার ঘাড়ে চাপিয়ে টার্জন রেহাই পেতে চায়, তার হাবভাব বড় সুবিধের বলে মনে হল না। চাপা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। সামনের পা দুটো দিয়ে সজোরে মাটি আঁচড়াতে লাগল। আর ঘনঘন ক্রুদ্ধভাবে শিং দুটোকে দোলাতে লাগল। আক্রমণের প্রস্তুতি আর কি! পরক্ষণেই মাথ নিচু করে লেজ উঁচিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে লাগল। টার্জন ভয় পেল, মোষটার

বা শিং-এর মাথা একটা আঘাতও যদি তার খুলিতে লাগে তো মুহূর্তে ফুটিফাটা হয়ে যাবে।

উদভ্রান্তভাবে পাক খাওয়া তখনও থামেনি। তাই একবার দৃষ্টি তার দ্রুতধাবমান প্রাণীটির দিকে পড়ছিল এবং পরক্ষণেই পড়ছিল বিপরীত দিকে। জীবনে আর কখনো সে মৃত্যুর কাছে এমন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। মাটির পাঁচ-ছয় ফুট উঁচুতে তার মাথা উল্টোভাবে ঝুলছিল। অথচ সেটাকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই সে করতে পারছে না। বিপদকে সে ভয় করে না। কিন্তু বিপদের সাথে লড়াই করে মরার যা আনন্দ নিশ্চেষ্ট হয়ে মরায় তা নেই।

সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মৃত্যুকে সে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। আর তখন আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল আর্তকণ্ঠের বীভৎস এক চিৎকারে। তার দৃষ্টিটা আধপাক ঘুরে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল, বহু যুগ ধরে সভ্যজগতের মানুষ তা দেখতে পায়নি।

মোষটার বিরাট কাঁধের ওপর ততোধিক বিরাট থাবা বসিয়ে কামড়ে ধরে আছে ভীমাকার এক বাঘ। মোষটা পালাবার চেষ্টা স্থগিত রেখে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড়ে চেপে বসা মৃত্যু থেকে রেহাই পেতে চাইছে। আর ক্ষণে ক্ষণে পাগলের মত শিং দোলাচ্ছে। প্রতিদানে বাঘটা থাবার বজ্রকঠিন সুতীক্ষ্ণ নখরগুলি মোষের দেহে বসিয়ে দিয়ে নিজের অবস্থান পাকাপাকিভাবে কায়েম করে নিচ্ছে। তারপর একটা থাবা উঁচিয়ে মোষের অস্থির মাথায় প্রচণ্ড এক ঘা। এক আঘাতেই সব ঠাণ্ডা। মোষের প্রাণহীন দেহটা ধপাস্ শব্দে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

লড়াই করার সময় বাঘটা লক্ষ্যই করেনি যে একটা মানুষ বাদুড়ের মত মাথা নিচু করে ঝুলছিল। লক্ষ্য করল, ভোজ শুরু হবার পর। মুহূর্তে তার শান্ত মেজাজ অশান্ত হয়ে উঠল। খাওয়া বন্ধ রেখে টার্জনের দিকে তাকিয়ে চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন শুরু করে দিল সে। লেজটা অস্থির ভাবে আন্দোলিত হতে লাগল। তারপর মৃতদেহটার ওপর থেকে সরে এসে লঘু পায়ে এগোতে লাগল টার্জনের দিকে।

[৩]

জ্যাসন গ্রিডলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে করিডোর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় রবার্ট জোনস্‌কে দেখতে পেল। রবার্ট জোনস্-এর হতবুদ্ধিকর অবস্থা দেখে প্রশ্ন করল, 'কি মিষ্টার জোন্‌স্, প্রাতরাশ সারা হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল জোনস্, 'প্রাতরাশ না মধ্যাহ্ন ভোজন? ঘড়ি অনুযায়ী এখন সন্ধ্যে ছ-টা হওয়া উচিত। কিন্তু সূর্য দেখছি ঠিক একই জায়গায় আছে। কিছু একট গণ্ডগোল নিশ্চয়ই হয়েছে।'

খানিকটা হাসল জ্যাসন গ্রিডলে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'টার্জন কোথায়?'

মিষ্টার ডোর্ফ পাশেই ছিল। বলল, 'গতকাল সেই যে বেরিয়েছেন তিনি, আজও ফেরেননি। তার পক্ষে একলা বেড়ানো অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু বলব, কোন বন্দুক বা রিভলভার না নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।'

ডোর্ফ-এর কথা শুনে সবাই বিস্ময় প্রকাশ করল। আবার বলতে শুরু করল ডোর্ফ, 'চার ঘণ্টা ধরে যেসব জন্তু-জানোয়ার দেখেছি, আপনারা না দেখলে তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। বিরাট একটা ভল্লুকের মত প্রাণী দেখেছি। আর দেখেছি অতিকায় সব বাঘ। আকারে তারা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চেয়েও অনেক বড়। দল বেঁধে নদীতে জল খেতে এসেছিল তারা। বন্দুকের গুলিতেও এদের কাবু করা যাবে না। আর একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি—তার চেহারা এদের চেয়েও ভয়াবহ। পশু বললে ভুল বলা হবে। পাখি বললেও ঠিক বলা হল না। সরীসৃপ—বিরাট একট্রা উড়ন্ত সরীসৃপ সেটা। বিশ ফিটের মত চওড়া বিরাট ডানা দুটোয় ভর করে দূর মাঠটাতে এসে নামল। তারপর উড়ে যেতেই দেখলাম, তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে গেঁথে একটা ভেড়া নিয়ে চলেছে সে। উড়ন্ত প্রাণীটার গায়ে এতই শক্তি যে দু-একটা মানুষও সে অনায়াসে তুলে নিয়ে যেতে পারে।'

দলের বেশীর ভাগ লোককে মুখ ঘুরিয়ে হাসতে দেখা গেল। তার কপোল-কল্পিত কাহিনীকে বিশ্বাস করতে পারছে না তারা। কেউ বা তার অদ্ভুত কল্পনাশক্তির তারিফ করতেও ছাড়ল না। কিন্তু ক্যাপ্টেন জুপনার এবং জ্যাসন গ্রিডলে তার কথা মোটেই হেসে উড়িয়ে দিল না। প্রাণীটা কি টেরোড্যাকটাইল না টেরানোডন, তাই নিয়ে খানিক আলোচনাও চলল তাদের মধ্যে। তারপর স্বাভাবিকভাবে আবার টার্জনের জন্য উৎকণ্ঠা দেখা দিল।

ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার বিমানটাতে করে অনুসন্ধান করার কথা বলেছিল। গ্রিডলে যুক্তি দেখিয়ে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিল। তাদের অবর্তমানে টার্জন যদি এসে হাজির হয় তো কাউকেই দেখতে পাবে না। তাছাড়া বিমানটিকে আবার ঠিক এইখানে নামানো প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কারণ, বিমানের ভেতরকার অনেকগুলি যন্ত্রপাতিই কোন কাজ দেবে না এখানে।

শেষে স্থির হল, একটি দলকে অনুসন্ধান করতে পাঠানো হবে এবং অপর দলটা অপেক্ষা করবে তাদের ফিরে আসা পর্যন্ত। গ্রিডলে, ভন হোর্ষ্ট, মুভিরে এবং ওয়াজিরি যোদ্ধাদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হল। ওয়াজিরি যোদ্ধারা নিগ্রো শ্রেণীভুক্ত। তারা এতই সাহসী যে বন্য জন্তু শিকারেরা সময় রাইফেল ব্যবহার করাকে তারা রীতিমত কাপুরুষতা বলে মনে করে। খেলাচ্ছলে হাতের টিপ পরীক্ষা করতেই শুধু রাইফেল ব্যবহার করে তারা। শিকারের সময় তীর-ধনুক এবং বর্শাই তাদের প্রধান হাতিয়ার। তবু জ্যাসন গ্রিডলের আদেশে প্রত্যেককেই আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিতে হল।

ভোজনপর্ব সমাধা করে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তৈরী হল সবাই। তারপর যাত্রা শুরু হল টার্জনকে খুঁজে বের করতে। রবার্ট জোন্‌স্ বিদায়ী দলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উড়ন্ত সরীসৃপ···হুঃ, যত্তোসব গাঁজাখুরী গল্প। আর নেহাত তাদের অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে তো ওয়াজিরি যোদ্ধাদের হাতেই নির্বংশ হবে তারা। বাব্বা, বাছা বাছা সব যোদ্ধা আছে এই দলে।'

দলের মধ্যে মুভিরোই ছিল একমাত্র লোক যে পায়ের ছাপ দেখে আর গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারত, টার্জন কোন্ পথে গেছে। বহু বছর টার্জনের সান্নিধ্যে থেকে এই গুণটি আয়ত্ত করেছিল সে। এই বিপদের সময় দলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার তার ওপরেই পড়ল। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত এই সহজাত গুণটিকে কাজে লাগাতে পারল সে। তারপর এসে থেমে গেল বিরাট একটা গাছের তলায়।

'কি হল?' কৌতূহলী প্রশ্ন গ্রিডলের।

'মাটি ছেড়ে এখানেই টার্জন গাছে উঠে গেছে।' বলল মুভিরো।

'তাহলে উপায়?'

ভাববার কথাই বটে। এখন থেকে সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে আমাদের। নিজের জঙ্গল হলে টার্জন এক সরলরেখায় এগিয়ে যেতে থাকত যতক্ষণ না কোন পথরেখা নজরে পড়ে। শিকারের ইচ্ছে থাকলে সেই পথের ওপর নেমে এসে অপেক্ষা করত সে। কখনো বা পথ বরাবর ছুটতে থাকত। এখানে কি করেছে জানি না তবে সোজাসুজি চলতে আমাদের কোন বাধা নেই। দেখাই যাক না কি হয়।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে দু-পাশের জঙ্গল সাফ করতে করতে এগিয়ে চলল পুরো দলটি। গ্রিডলের নির্দেশে একজন চিহ্ন এঁকে দিতে লাগল গাছে গাছে। আর

একজন কম্পাসের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল। রাত্রিহীন এই অজানা জগতে হারিয়ে গেলে আর রক্ষে নেই।

ভন হোর্ষ্ট বলল, 'কি ঘন বন রে বাবা! খড়ের গাদায় সূচ হারিয়ে গেলেও বুঝি পাওয়া যাবে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কাউকে এখানে খুঁজে বের করা তার চেয়েও শক্ত।'

গ্রিডলে বলল, 'কয়েক মিনিট পর পর তিনটে করে গুলি ছুড়লে হয়। রিভলভার নয়—রাইফেল। রাইফেলের শব্দই বেশী জোরদার।'

আরও এগিয়ে যাওয়া হল। নিবিড় বন নিবিড়তম হল। তারপর ক্রমেই পাতলা হয়ে আসতে লাগল। সবার উৎসাহও ফিকে হয়ে আসতে আসতে হঠাৎ ঝিলিক মেরে উঠল দ্বিগুণ বেগে। সামনেই চওড়া একটা সুস্পষ্ট পায়ে চলা পথ!

জ্যাসন গ্রিডলে গাছে চিহ্ন দিতে মানা করল। আর এখানেই সে মস্ত ভুল করে বসল। সে ভেবেছিল, চিহ্ন দিতে যতটা সময় লাগবে ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে। এমন সুন্দর পথ থাকায় হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাকে সে মোটেই আমল দিল না।

পথের ধুলোয় অসংখ্য পায়ের ছাপ। না, মানুষের নয়—জন্তু-জানোয়ারের। তাদের কতকগুলি ক্ষুরওলা প্রাণীর, কতকগুলি থাবাওলা প্রাণীর। আর কতকগুলি এমন প্রাণীর যে না দেখলে তাদের সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। গাছের ডালে ডালে অদ্ভুত আকারের সব বানর। কতকগুলির আকার মানুষের মত, কতকগুলি আকারে অনেক বড়। পাতায় পাতায় রংবেরঙের সব পাখি। জঙ্গল থেকে ভেসে আসে হরেক রকম শব্দ। তার মধ্যে ক্ষুরওলা প্রাণীর খটাখট শব্দও যেমন আছে, থাবাওলা প্রাণীর শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার খস্ খস্ আওয়াজও আছে তেমনি। তাই বলে জঙ্গলের সর্বত্রই শব্দময় নয়। এমন জায়গাও আছে যেখানে কোন শব্দ নেই, কোন স্পন্দনও নেই—আছে সমাধিক্ষেত্রের ভয়াবহ শব্দহীনতা।

বন্দুকের শব্দে কতকগুলো প্রাণী আকৃষ্ট হয়েছিল। ফাঁকা আওয়াজ বন্ধ করার পর জ্যাসন গ্রিডলেই প্রথম বুঝতে পারল সে-কথা। পেছন দিক থেকে চাপা গর্জন ভেসে আসছিল। আর হাতীর ডাকের মত গুরুগম্ভীর আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল ডাইনে-বাঁয়ে। তার মনে হয়েছিল বন্য প্রাণীদের বিরাট একটা মিছিল যেন ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে

আসছে। সেই মিছিলে তৃণভোজী প্রাণী থেকে শুরু করে মাংসাশী প্রাণীও হয়ত আছে। তবু মনের এই সন্দেহ মুখে প্রকাশ করেনি গ্রিডলে। শুধু অহেতুক একটু ক্ষিপ্রতা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে।

চমকে উঠেছিল প্রথম ভন হোর্ষ্ট। চমকে উঠেছিল অতিকায় একটা দাঁতালো বাঘ দেখে। ওপরের পৃথিবীতে এ-জাতীয় বাঘ বহু লক্ষ বছর আগেই বিলুপ্ত। ডোর্ফ-এর কাহিনী অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল তখন। কিন্তু এখন? এখন তো আর চোখের দেখা অবিশ্বাস করবে না কেউ। শুধুই কি বাঘ? বিশাল আকারের সব বাঘ ছাড়াও তাদের চারধারে দেখা যাচ্ছিল দানবাকৃতি সব মোষ। লোমশ থলথলে আবরণে দেহ ঢাকা। শিং দুটো ছড়ানো, আর ছিল লাল হরিণ। ছিল বিশালকায় সব শ্লথ। মাস্টোডন ছিল, ম্যামথও ছিল। হাতীর মত দেখতে অথচ হাতী নয়, এমন প্রাণীও ছিল অনেকগুলি। এরাই হচ্ছে মায়োসিন যুগের ডায়নোথেরিয়াম।

সামনেই উন্মুক্ত প্রান্তর। বন দিয়ে ঘেরা এই প্রান্তরটার দিকেই মাংসাশী প্রাণীরা তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল অন্যান্য প্রাণীদের। গাছে চড়ে আত্মরক্ষার কথা মনে হয়েছিল কারো কারো। কিন্তু গ্রিডলে নির্দেশ দিল প্রান্তরটা পেরিয়ে ওপারে বনভূমির দিকে যেতে। গতিক ভাল নয়—অচিরেই সারাটা প্রান্তর জুড়ে প্রলয়ংকর হানাহানি শুরু হবে।

মাঠে পা দেওয়া মাত্রই গ্রিডলে এক লহমা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। চারপাশের বনভূমি থেকে মাংসাশী প্রাণীরা স্রোতের মত এসে ঢুকছিল মাঠটার ভেতর। একটা দিক শুধু ফাঁকা ছিল। সেই দিকেই ছুটে চলল সবাই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীগুলি নিরীহ গোবেচারার মত চরে বেড়াচ্ছিল মাঠে। বাঘগুলোকে দেখে তারা ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। চাঞ্চল্য ক্রমে বেপরোয়া ঔদ্ধত্যে পরিণত হতে থাকল। হাত-পা ছুঁড়ে, শুঁড় দুলিয়ে, কানফাটা চিৎকারে বাতাস কাঁপিয়ে, অর্থহীন দৌড়ঝাঁপ করে অস্থিরতার পরিচয় দিতে লাগল প্রাণীগুলি। তাদের শত্রুরা তখন বৃত্তাকারে ঘিরে ধরেছিল, তাদের বৃত্তটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছিল। সংখ্যায় শ-কয়েক হলে কি হয়, বাঘগুলিও ওদের বেশ সমীহ করেই চলে। তাই ব্যস্ততা না দেখিয়ে ধীরেসুস্থে চক্রব্যূহ রচনা করে চলেছিল বাঘগুলি।

কখনো একটা ম্যামথ, কখনো বা একটা মোষ ক্ষুব্ধ আক্রোশে ছুটে যাচ্ছিল বাঘগুলির দিকে। কিন্তু খুব কাছাকাছি যাবার সাহস তাদের ছিল না—পরক্ষণেই

ফিরে আসছিল নিজের দলে। একটা আশার কথা, শিকার এবং শিকারী কারো নজরই এতক্ষণ মানুষের দিকে পড়েনি। পড়লেও ভ্রূক্ষেপ করেনি। ব্যতিক্রম ঘটালো একটা মোষ। বিপদ ঘনীভূত হবার সাথে সাথে তার মেজাজও সপ্তমে চড়ে গেল। হতভাগা শেষে লেজ উঁচিয়ে মানুষগুলিকেই আক্রমণ করতে ছুটল। বেশীদূর অবশ্য এগোতে হল না। বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাল বেচারা।

হতচ্ছাড়া মোষটা নিজে তো মরলই, মানুষগুলিকে বিপদে ফেলে গেল। বন্দুকের শব্দে শিকার-শিকারী নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাণীর দৃষ্টিই আকৃষ্ট হল মানুষদের দিকে। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। ছুটে আসতে দেখে আর একটি প্রাণীকে গুলি করে মারা হল। তারপর আর একটা। তারপর আরো একটা। এবার উন্মত্ত আক্রোশে সারা দলটাই এগিয়ে আসতে লাগল দুর্বার গতিতে। কোথায়ই বা রইল বন্দুক, আর কোথায়ই বা রিভলভার। সব ফেলে ছড়িয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটল সবাই।

কয়েকটা লাল হরিণ সবার আগে এসে পৌঁছল মুষ্টিমেয় মানুষদের মাঝে। হরিণগুলোকে পথ ছেড়ে দিতে গিয়ে মানুষেরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এরই মধ্যে গ্রিডলে একবার সাহস করে ফিরে দাঁড়াল। সম্মুখ সারির দুটো ম্যামথকে পিস্তল দিয়ে গুলি করল সে। লুটিয়ে পড়ল ম্যামথ দুটির বিশাল বপু। অসহায় সঙ্গীদের দেহের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এল বাকী সবাই। আর দেরী করা ঠিক নয়। গ্রিডলে ছুটল বনের দিকে—যেখানে বিরাট একটা মহীরুহ গাছপালা ছড়িয়ে তাকে আশ্রয় দেবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

এই বিশাল প্রাণীগুলির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় গ্রিডলে জয়ী হল ঠিকই, কিন্তু গাছটা আর একটু দূরে থাকলে দৌড়ের ফলাফল জানবার জন্য তাকে আর বেঁচে থাকতে হত না। গাছের ডালে নিজেকে ভাল মত আড়াল করবার পরই সঙ্গীদের কথা মনে হল আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকাল সে।

মানুষের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। ছোটবড় প্রাণীদের সেই অফুরন্ত স্রোত বনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল। ভন হোষ্টের জন্য ভয় হল তার। সবার পেছনে তো তাকেই দেখা গিয়েছিল। টন টন ওজনের এই প্রাণীদের পায়ের তলায় যদি কেউ পড়ে থাকে তো তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাবে না।

পালের গোদা বড় বড় প্রাণীরা বনের ভেতর ঢুকতেই দুর্বার বেগ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। পেছনের প্রাণীগুলি আর তেমনভাবে ছুটতে না পারায় অস্থির হয়ে উঠল ক্রমশঃ। হরিণগুলো সামনের প্রাণীদের ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা

করল। কেউ পারল, কেউ পারল না। কেউ বা পর্বতপ্রমাণ প্রাণীদের চাপে রক্তাক্ত এক-এক তাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হল।

বাঘেরা তখন সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। পাশ থেকে দুর্বল প্রাণীদের টেনে ফেলছে মাটিতে। পেছন থেকে কারো ঘাড়ে লাফিয়ে উঠে এক-এক আঘাতে মাথার খুলি ফাটিয়ে দিচ্ছে। ম্যামথেরা দুর্বল প্রাণীদের দেহের ওপর দিয়েই সমানে এগিয়ে যাচ্ছে। পিষ্ট প্রাণীদের রক্তে মাংসে তাদের দেহ মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। মর্মান্তিক দৃশ্য। ততোধিক মর্মান্তিক আদিম প্রাণীদের উন্মত্ত তাণ্ডব। রক্তের নেশায় শিকারী বাঘগুলিও যেন পাগল হয়ে উঠেছে। বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তারা।

পশুদের সেই বিরাট মিছিলের একটা অংশ তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলল বাঘেরা। তারপর মূল দল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল তাদের। তারপর আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণের দমকে আকাশ-বাতাস কাঁপতে লাগল থর থর করে। কতকগুলি বাঘ আহত হল। তাদের কতকগুলি মারাও গেল। তবু লড়াই থামল না। অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রুদ্ররোষে ফুঁসতে লাগল প্রাণীগুলি। গ্রিডলে ভাবল, এতক্ষণ এই শক্তি ছিল কোথায়!

সময় নিল বটে, কিন্তু একে একে সব কটা প্রাণীই নিহত হল—শুধু একটা বাদে। এতগুলি শত্রু চক্রাকারে ঘিরে থাকা সত্ত্বেও সাহস হারাল না প্রাণীটা। এটা ছিল একটা পুরুষ ম্যামথ। বিশাল শিং দুটো দুলিয়ে, ক্ষুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে প্রস্তুত হতে লাগল সে। ভাবখানা এই, একবার কাছে এসেই দেখ না, মজাটা বিলক্ষণ টের পাবে! ম্যামথটা যে নিতান্ত অবহেলার পাত্র নয়, বাঘ-গুলোর আচরণ দেখেই তা বোঝা গেল। বৃত্তের পরিধি ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। শেষে ক্ষুরে আগুন ছুটিয়ে, প্রশ্বাসে ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল ম্যামথটা। আকস্মিক আক্রমণের ধাক্কায় দুটো বাঘকে গজদন্তে বিদ্ধ করে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে। আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়। আবার যখন চকিতে প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে গেল, তখন এক ডজন বাঘ একযোগে আক্রমণ করে বসল তাকে।

খানিকক্ষণ কিছুই বোঝা গেল না। প্রচণ্ড এক হুটোপুটি দেখা গেল শুধু। ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। আর্ত চিৎকার আর রুদ্ধ আক্রোশে বাতাসে কাঁপতে লাগল। শেষে যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এল, তখন কয়েকটা আহত বাঘ মাটিতে গোঙাচ্ছে। বাকীগুলো আঘাতে আঘাতে

ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে প্রাণীটাকে। সেই অসহায় মুহূর্তেও ম্যামথটা উঠে দাঁড়াতে চাইছে—শত্রুদের আক্রমণ করতে চাইছে।

নিহত প্রাণীদের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অবশিষ্ট বাঘদের মধ্যে আর একচোট সোরগোল শুরু হল। কতকগুলো বাঘের প্রাণের মূল্যে শিকার সাঙ্গ হল। বাঘের মৃতদেহ পড়ে রইল চারদিকে। সেদিকে কারো নজর নেই। যে যার আহার নিয়ে ব্যস্ত তখন। গুরু ভোজনের পর মাটির ওপর ক্লান্তিহরা বিশ্রাম। সেই অবসরে বন থেকে বেরিয়ে এল দলে দলে পালে পালে শেয়াল, হায়না, আর শিকারী কুকুর।

[৪]

এদিকে টার্জনের অবস্থা তখন কাহিল। অতিকায় বাঘটা লঘু পদক্ষেপে তার দিকেই এগিয়ে যেতে লাগল। এবার বুঝি আর মৃত্যুকে ঠেকান গেল না। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও শিকারী বাঘটার রাজকীয় চাল প্রশংসার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল সে।

এতদিনে বুঝি পার্থিব জীবনে সমাপ্তির পর্দা নেমে এল তার। কিন্তু মৃত্যুর পরে কি হবে? সে কি স্বর্গে যাবে, না নরকে যাবে? না-কি তার সমস্ত অস্তিত্ব মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাবে? কোথায় যেন শুনেছিল সে, আত্মার কোন বিনাশ নেই। বিজ্ঞান আত্মার কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারে না। আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করা চলে না। বিজ্ঞানের যেখানে ইতি, আধ্যাত্মিক জগতের সেখানে শুরু। যাই হোক, তার মন বলছে, সে আবার ফিরে আসবে এই পৃথিবীতে—ফিরে আসবে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শে ভরা প্রকৃতির মাঝে।

মনের মাঝে চিন্তার স্রোত বয়ে যেতে লাগল তার। অচিরেই হয়ত বাঘটা এসে এক থাপ্পড়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। কিংবা বেড়াল যেভাবে ইঁদুর ধরে সেভাবে কামড়ে ধরবে তার ঘাড়টা। আবার এও হতে পারে, আঘাতে আঘাতে তীক্ষ্ণ ধারালো নখরগুলো মাংস ভেদ করে হাড়ে গিয়ে ঠেকবে।

না, এর কোনটাই হল না। মাঝপথে থমকে দাঁড়াল বাঘটা। কি যেন একটা দেখতে পেয়ে ওপর দিকে তাকাল সে। গাছপালার ওপরে অস্থির

চাঞ্চল্যের সাথে সাথে খস্‌খস্‌ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। টার্জন দেখতে পেল, ঠিক ওপরের ডালটাতে বসে তারই দিকে কুতকুত করে চেয়ে আছে একটা অতিকায় গরিলা।

ভাল করে তাকাতেই বুঝতে পারল, আশপাশের গাছগুলোতে আরও অনেকগুলো গরিলা ছিল। আরো ভাল করে তাকাতেই বোঝা গেল, ওরা ঠিক গরিলা নয়। গরিলার সাথে সাদৃশ্য অবশ্য আছে। দেখতেও অনেকটা আদিম মানুষদের মত, অথচ ঠিক মানুষও নয়। মানুষের মত খানিকটা বুদ্ধি যে তাদের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, লোমশ সুপুষ্ট হাতের মধ্যে এক-একটা গদা শোভা পাচ্ছিল। ওদের অস্তিত্ব টের পেয়েই বাঘটা ইতস্তত করছিল—খানিকটা বিরক্ত হয়ে, খানিকটা ক্রুদ্ধ হয়ে।

পরের মুহূর্তেই একযোগে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। একটা গরিলা ফাঁদের দড়ি ধরে ঝুলন্ত টার্জনকে ফাঁদ শুদ্ধ ওপর দিকে টেনে নিল। নিজের শিকার এভাবে হাতছাড়া হতে দেখে বাঘটাও লাফ দিল। আর বজ্রসম এক-একটা গদা এসে পড়তে লাগল বাঘটার গায়ে, মাথায় আর থাবায়। বাঘের হাত থেকে টার্জন রক্ষা পেল বটে, কিন্তু গিয়ে পড়ল নির্মম নির্দয় আর এক জাতের প্রাণীর হাতে। ওদের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে টার্জন ভাবল, এর চেয়ে বুঝি বাঘের হাতেও মরা ভাল ছিল।

চার-পাঁচজনে টার্জনকে ধরে রাখল। একজন প্রশ্ন করল, 'কা গোদা!'

ভাষাটা চেনা চেনা ঠেকল টার্জনের কাছে। আশৈশব বিভিন্ন গোষ্ঠীর বানরদের মাঝে থেকে তাদের ভাষাও আয়ত্ত করে নিয়েছিল টার্জন। তাই কথাটার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হল না। 'কা গোদা' কথাটার অর্থ দাঁড়ায় এই—'তুমি নির্বিবাদে আমাদের হাতে নিজেকে সঁপে দিচ্ছ তো?'

হনুমান, গরিলা, বানর, বেবুন প্রভৃতি জাতের প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা আদান-প্রদান করে, তার কতকগুলি হুবহু একই রকমের হলেও বেশীর ভাগই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে মিল খায় না। আভ্যন্তরীণ জগতে পরিচিত ভাষার আভাস পেয়ে টার্জন ভাবল, বাইরের জগতের সাথে হয়ত কোনদিন এদের যোগাযোগ ছিল। এরা হয়ত বাইরের জগতের প্রাণীদেরই একটা শাখা। আর একটা সম্ভাবনাও ছিল। হয়ত বিবর্তনবাদের নিয়মে সকল প্রাণীদেরই একদিন এই ভাষায় কথা বলতে হয়।

আবার প্রশ্ন হল, 'কা গোদা?'

টার্জন উত্তর দিল, 'কা গোদা।'

টার্জনকে তাদের ভাষায় কথা বলতে শুনে প্রতিটি প্রাণীই বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাদের ভাষায় আবার প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

'আমার নাম টার্জন। সুদক্ষ শিকারী, নামকরা যোদ্ধা আমি।'

'এখানে মাওয়া-লটের দেশে কি করছ তুমি?'

'আমি এখানে বন্ধুভাবে এসেছি। তোমাদের সাথে আমার কোন ঝগড়া বা বিবাদ নেই।'

গাছের ওপরেই এসব কথাবার্তা চলছিল। ততক্ষণে আরো কতকগুলো প্রাণী এসে ঘিরে ধরেছিল টার্জনকে। আবার প্রশ্ন, 'স্যাগোথদের ভাষা জানলে কি করে তুমি? অতীতে গিলাকদের কয়েকজনকে বন্দী করেছিলাম আমরা। কিন্তু তারা তো আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারেনি!'

'আমি কালা এবং অন্যান্য জাতের বানরদের কাছ থেকে ভাষাটা শিখেছি।

'কৈ, আমরা তো ঐ নামের কোন বানরগোষ্ঠীকে চিনি না।'

একজন বলল, 'নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে—মেরে ফেল ওকে।'

আর একজন বলল, 'না, ওকে বরং মাওয়া-লটে নিয়ে চল। ওকে ঘিরে নাচ হবে আমাদের। তারপর মেরে ফেলা হবে।'

বানর এবং গরিলাদের ভাষা মানুষের সাথে মোটেই মিল খায় না। চিৎকার, ঘড়ঘড়ানি, ঘোঁতঘোঁতানি, দাঁত খিঁচুনি সব কিছু মিলিয়ে মনের ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম মাত্র। সে-ভাষার যথাযথ অনুবাদ একেবারেই অসম্ভব। তবু টার্জন এবং স্যাগোথদের মাঝে যেসব মনের ভাব বিনিময় হয়েছিল, তাই ভাষায় প্রকাশ করা হল।

বাঘটা ফিরে গিয়েছিল শিকার-করা প্রাণীটার কাছে। খাওয়া ভুলে সে তখন ফ্যালফ্যাল করে স্যাগোথদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এতক্ষণ টার্জনের দিকে মন থাকায় স্যাগোথেরা বাঘটার দিকে নজর দেয়নি। টার্জনকে লতাপাতা দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে বাঘটার সদ্গতি করতে উঠে পড়ে পড়ে লাগল তারা।

এক ফাঁকে তলায় ছুঁড়ে মারা গদাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এল একজন। তারপর শুরু হল সুপরিকল্পিত পন্থায় বাঘ-তাড়ানো অভিযান। এক-একটা গদা অব্যর্থ লক্ষ্যে এসে পড়তে লাগল বাঘের নাকে, মুখে, চোখে। কিছু করবারও উপায় নেই বেচারার। কোন দিক থেকে কখন গদার আঘাত

আসবে, সেটা বোঝা একেবারে অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। অগত্যা রণে ভঙ্গ দিল। স্যাগোথদের তখন পোয়াবারো। নিহত মোষটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে তার মাংস উদরে চালান দিতে লাগল নিশ্চিন্তমনে। কোন বিশেষ দেহাংশের জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারির উপক্রমও হয়েছিল। আবার নিজেরাই মিটমাট করে নিয়েছে তা।

এই বর্বর দৃশ্যের নীরব দর্শক ছিল টার্জন। প্রাণীগুলোকে এবার খুঁটিয়ে দেখল সে। গরিলার মত অতটা মজবুত গড়ন নয় এদের। হাত-পায়ের আকারও গরিলার মত নয়—অনেকটা মানুষের মত। সারা শরীরে ঘন বাদামী লোমে ঢাকা থাকায় পশুর মতই মনে হচ্ছিল এদের। মুখের হিংস্র কুটিল আদলের মাঝেও পশুত্বের পরিচয় ছিল। শুধু মাথার খুলিটাই ছিল মানুষের মত। পরিধানে কোন পোশাকের বালাই নেই। নিরলঙ্কার দেহ বোঝা যায়, সৌন্দর্যবোধ এখন জাগে নি এদের মধ্যে। পাথরের গদাই এদের একমাত্র আয়ুধ।

পশুর মত দেখতে হলেও এরা যে ইতিমধ্যে বিবর্তনবাদের নিয়মে মানুষের ধাপে এসে পৌঁচেছে, এদের শিকার ধরার পদ্ধতি দেখেই তা বোঝা যায়। খাওয়া শেষ হলে ফাঁদটাকে আবার বিছিয়ে রাখল মাটিতে। লতাপাতা এবং মাটি দিয়ে ভালভাবে ঢেকে রাখল ফাঁদের ঘোড়াটাকে। তারপর টার্জনকে নিয়ে এগিয়ে চলল পথ বরাবর। বলা বাহুল্য, মানুষের মতই পায়ে ভর দিয়ে দেহটাকে সোজা রেখে হাঁটতে শিখেছে এরা।

অনেকে বলেন,—আদিম মানুষ ছিল ভীরু ভয়কাতর! ভয়ঙ্কর প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে তারা গুহায় আশ্রয় নিত। তাই যদি হবে, তাহলে পাথরে অস্ত্র মাত্র সম্বল করে অগণিত ভয়ঙ্কর পশু-পাখির মাঝে তারা বেঁচে রইল কি করে? অতিকায় সব প্রাণী ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবী থেকে, অথচ সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে মানুষ বেঁচে রইল। শুধু কি বুদ্ধি, না সাহসও এর মূলে ছিল? বুদ্ধি ছাড়াও কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি অবশ্য মানুষের পক্ষে দারুণ সহায়ক হয়েছিল। যেমন, আঘ্রাণ শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি। এদের সাহায্যে মুহূর্তে বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারত তারা। এই স্যাগোথদের মাঝেও সেই শক্তি পুরোপুরি বজায় ছিল। এদের প্রবল আত্ম বিশ্বাস এবং অকুতোভয় চরিত্র টার্জনের কাছেও ভাল লাগল।

পথের পাশে শূন্যগর্ভ প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল। একজন সেটার গায়ে গদা দিয়ে আঘাত করল—একবার দুবার…একবার দুবার…একবার

দুবার তিনবার। তারপর খানিক বিরতি। তারপর আবার আঘাতের পুনরাবৃত্তি। শেষে সঙ্কেতকারী থামল। অপরেরা মাটির বুকে কান রেখে কি যন শুনতে লাগল। ক্ষীণভাবে দূর থেকে ভেসে এল প্রত্যুত্তর। মাটির মাধ্যমে সেটা আরো স্পষ্ট শোনা গেল। একই সঙ্কেত—এক দুই···এক দুই···এক দুই তিন।

এরপর সদলবলে সবাই গাছে উঠে গেল। টার্জনকেও উঠতে সাহায্য করা হল। যেন গাছে চড়তে সে জানেই না! কিসের জন্য প্রতীক্ষা করা হবে বোঝা গেল না। টার্জন বলল, 'আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও—আমি তোমাদের শত্রু নই।'

টার্জন যাকে এই কথা কটি বলল, সে আর একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তর দিল, 'ওর নাম টারগাস—ওকে বল।'

টারগাস হয়ত ওদের দলপতি ছিল। একটু ভেবে আজ্ঞা দিল, 'খুলে দাও ওর বাঁধন।'

আর একজন সাথে সাথে প্রতিবাদ জানাল, 'কেন?'

'কারণ, আমি টারগাস বলছি।'

'তুমি তো মাওয়া-লট নও। রাজা মাওয়া-লট যদি বলে তবেই আমরা খুলে দেব—নাহলে নয়।'

'যা বলছি তাই কর।'

'আমরা রাজার আজ্ঞা মানি—টারগাসের নয়।'

'টোয়াড, মুখ সামলে কথা বলবে বলছি।'

'হয়েছে হয়েছে—।'

স্যাগোথেরা মানুষের মত অযথা বাদ-প্রতিবাদে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নয়। ঝগড়ার ফয়সালা হাতে বিলম্ব হয় না ওদের। এক্ষেত্রেও হল না। দলপতি-সুলভ তৎপরতার সাথে টারগাস ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর। গাছের ওপরই হুড়োহুড়ি চলল। তারপর পাকা ফলটির মত টুপ করে উভয়ে মাটিতে পড়ল। জড়াজড়ি চলল সামনে। হার মানল টোয়াড। টারগাস ততক্ষণে তার বুকের ওপর চড়ে বসেছে।

টারগাস বলল, 'কা গোদা?'

উত্তর হল, 'কা গোদা।'

টারগাস তাকিয়ে দেখল ওদের মধ্যে আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী আছে কিনা।

কোন প্রতিবাদ আর হল না। টার্জন বন্ধনদশা হতে মুক্ত হল। টারগাস অবশ্য শাসিয়ে দিতে ছাড়ল না, 'পালাবার চেষ্টা করলেই কিন্তু জান খতম করে দেব তোমার।'

টার্জন মনে করছিল, তার ছুরি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। ধনুক আগেই হারিয়েছিল। তীরও বেশীর ভাগই পড়ে গেছে। ফাঁদে পড়বার সময়ই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। এবার বুঝি একেবারেই নিরস্ত্র হয়ে যাবে সে। কিন্তু তা হল না। টার্জনকে ওরা আমলই দিল না। ওদের দৃষ্টি ছিল পথের দিকে।

টার্জন গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারল, কারা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে সঙ্কেতের অর্থ পরিষ্কার হল। কিন্তু বুঝতে পারল না, কেন ওরা এখানে জমায়েত হতে চলেছে। তবে চেহারা দেখে ওদের রাজাকে চিনতে মোটেই বিলম্ব হল না। গাছ থেকে সবাই মাটিতে নেমে এসেছিল। আনুষ্ঠানিক কথা আদান-প্রদানের পর রাজা টার্জনকে দেখিয়ে বলল, 'এটা কে?'

টারগাস বলল, 'ফাঁদে আজ একেই পাওয়া গেছে।'

'আর একে খাওয়ার জন্য আমাদের এখানে ডেকে এনেছ?···হুফ্!'

'এর মাংস খাওয়ার জন্য তো সঙ্কেত দেওয়া হয় নি। ফাঁদটার কাছেই একটা মোষ মরে আছে···বাঘে মেরেছে···সে জন্যই ডেকেছি।'

'ঠিক আছে, এটাকে পরে খাওয়া যাবে। বহুদিন আমরা নাচিনি। এই গিলাকটাকে হত্যা করার সময় নাচ হবে। এখন কোথায় নিয়ে যাবে চল।'

এই সাংঘাতিক পরিবেশেও টার্জন বেশ স্বচ্ছন্দেই চলাফেরা করতে লাগল। স্যাগোথদের মেয়েরা এবং বাচ্চারা অবাক কৌতূহলে টার্জনকে ঘিরে ছিল। টোয়াড ছিল রাজার পাশেই। কানে কানে কি যেন কথা হচ্ছিল ওদের। টারগাস দলের পুরোভাগে ছিল। রাজার দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে গিয়ে পড়ছিল তার দিকেই। কথাটা যে তার সম্বন্ধেই হচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাজার মুখ উত্তরোত্তর রাগে লাল হতে লাগল। হাতের গদাটা ঘনঘন ওঠানামা করতে লাগল। আর রাজার ক্রোধের প্রতিফলন দেখা গেল বাদবাকী সকলের চাঞ্চল্যের মধ্যে।

সারা দলের মধ্যে টার্জনের বন্ধু নেই একজনও। পক্ষান্তরে টারগাসও হয়ত রাজার ক্রোধানলে অচিরেই নিহত হবে। তার পক্ষে ওকালতি করার মত লোক একজনও থাকবে না দলের মধ্যে। সুতরাং নিজের স্বার্থেই ওর পক্ষ অবলম্বন করতে হবে টার্জনকে। অবশ্য খানিকটা কৃতজ্ঞতাও আছে বৈকি।

সব দিক বিবেচনা করে টার্জন প্রস্তুত হয়ে রইল। কিন্তু রাজার ন্যায়দণ্ড যে এত শীগ্‌গির টারগাসের ওপর নেমে আসবে বোঝা যায় নি। উদ্যত গদা হাতে রাজা এক লাফে হাজির হল টারগাসের পেছনে।

কালবিলম্ব না করে টার্জন চেঁচিয়ে উঠল, 'টারগাস, ক্রিগা।'

আর একমুহূর্ত বিলম্ব হলেই গদার আঘাতে টারগাসের মাথা চৌচির হয়ে যেত। সতর্ক বাণী শোনার সাথে সাথেই টারগাস সরে গিয়েছিল এক ঝটকায়। কে তাকে সতর্ক করেছে দেখবার জন্য চোখ ফেরাতেই আর একচোট বিস্ময়ের পালা। টার্জনের ডান হাত ততক্ষণে রাজার গলা বেড়িয়ে ধরেছে। তারপরই যুযুৎসুর মোক্ষম এক প্যাঁচে রাজা কুপোকাত।

টার্জন রাজাকে ছেড়ে টারগাসের পাশে দাঁড়াতেই দলের সবাই রুখে দাঁড়াল ওদের দু-জনের বিরুদ্ধে। টার্জন জিজ্ঞেস করল, 'এখানে থেকে লড়াই করবে না পালাবো?'

'তুমি তো আবার গাছে চড়তে জান না—পালাবে কি করে?'

'সে ভাবনা ভাবতে হবে না—চলে এসো।'

না, পলাতক দুজনকে আর ধরতে পারে নি স্যাগোথেরা। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে টারগাসই প্রথম কথা বলল, 'আমাকে কেন বাঁচালে তুমি?'

'আমি তো আগেই বলেছি, আমি তোমাদের শত্রু নই—বন্ধু। তাছাড়া তুমিই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ আগে—আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছ।'

'এখন তুমি যাবে কোথায়?'

'আমার দলের লোকজনের কাছে ফিরে যাব।'

'তারা কোথায়?'

কোন উত্তর দিতে পারল না টার্জন। যে দিকে তাকানো যায় শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। লতাপাতার বেড়াজাল ভেদ করে সূর্যের দু-এক টুকরো আলো ভেতরে এসে পড়েছিল। কিন্তু সূর্য তো এখানে স্থির অচঞ্চল। সূর্যের গতি দেখে দিক্‌নির্দেশ করার কোন উপায় নেই। হায়, সে এখন পথহারা দলভ্রষ্ট!

[৫]

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে জ্যাসন গ্রিডলে দেখে গেল সব কিছু। এমন বীভৎস দৃশ্য, এমন পাইকারী হত্যা কদাচিৎ দেখা যায়। গাছের কোটরে

নিজেকে সেঁধিয়ে দিয়েছিল বলে বিপদের ভয়ও নেই। যতখুশী দেখে যাও—যতখুশী ভেবে যাও। শুধু সুযোগমত এখান থেকে পালালেই হল।

ওপরের পৃথিবী থেকে এসব প্রাগৈতিহাসিক আমলের প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আগেই। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই ভয়াবহ দৃশ্যের মাঝেই রয়েছে শিকারী বাঘদের এই রকম আচরণ বর্তমানে ওপরের পৃথিবীতে একদম দেখা যাবে না। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমন ব্যাপক হত্যার নজির কোথাও মিলবে সেখানে। এতে বুদ্ধির পরিচয় যেমন আছে, ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তাও আছে তেমনি; কারণ, এই ধরনের শিকারের ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পশু মারা পড়ে। মজুত মাংসে কিছুদিন ভোজন চললেও বেশীর ভাগই পচে নষ্ট হয়। যতদিন না নিতান্ত অথর্ব হয়ে যায় ততদিন পচা মাংস রুচে না বাঘেদের মুখে। ফলে আবার ব্যাপক হত্যা, আবার মাংসের অপচয়। এভাবে একদিন শিকারযোগ্য প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—যেমন ওপরের পৃথিবীতে কয়েক জাতের প্রাণীর এই অবস্থা হয়েছে। শেষে ক্ষুধার তাড়নায় একই জাতের প্রাণীরা একে অপরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। ফলে শিকারী-প্রাণীদেরও বিলুপ্তি ঘটে।

বাইরের পৃথিবীতেও এককালে অতিকায় বাঘেদের রাজত্ব ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধিই তাদের কাল হয়েছে। শেষ ধাপে তারা যে শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, পেল্যুসিডারেও একদিন সেই অবস্থা আসবে। বিজ্ঞানীরা বলেন,—জুরাস্থিক যুগের মাংসাশী ডায়নোসরদের অবলুপ্তির এই একই কারণ। প্রথমে তারা তাদের আহার্য প্রাণীদের নিঃশেষ করেছে। তারপর খাদ্যের অভাবে নিজেরাও বিলকুল লোপাট হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। গত দুটো শতাব্দী ধরে যে-হারে লোক বেড়েছে পৃথিবীতে, সেই হার বজায় থাকলে সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্যাভাব দেখা দেবে। ফলে মানুষ আবার অতীতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে—নরভুক হবে। তাহলেই পৃথিবী হতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিশেষ বিলম্ব হবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, এক-এক সময় এক-এক জাতের প্রাণীর প্রাধান্য ছিল। অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জীবেরাই অপরের ওপর প্রভুত্ব করেছে। তবু পরিপূর্ণতার পক্ষে প্রাণীদের যাত্রা শেষ হয় নি এখনও। বিবর্তনবাদের নিয়মে অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে মাছ প্রভৃতি জলচর প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছে; মাছ থেকে হয়েছে সরীসৃপ; সরীসৃপ থেকে পাখি এবং স্তন্যপায়ী জীবদের

সৃষ্টি। এইভাবে বিবর্তন মানুষে এসে ঠেকেছে। পূর্ণতা এখনও আসে নি; পরিবর্তন এখনও চলছে। কিন্তু মানুষের পরে কি হবে? হয়ত মানুষের পরে আরো এক জাতের প্রাণীর সৃষ্টি হবে। আর সেই সৃষ্টিই হবে সৃষ্টিকর্তার মারাত্মক ভুল।

হ্যাঁ, ভুল গ্রিডলেও করেছে। এতক্ষণ সে আবোল-তাবোল চিন্তায় এতই মশগুল হয়েছিল যে, সঙ্গীদের কথা মনেই পড়েনি। মাঠের কোথাও দেখা গেল না কাউকে। চেঁচিয়ে সবার নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু ভোজন বিলাসী বাঘেদের গর্জনের মাঝে সে আওয়াজ ডুবে গেল। সবাই হয়ত নিরাপদে বনে পৌঁচেছিল। তবু ভন হোষ্টের জন্য উদ্বেগ রয়েই গেল তার।

নিজেকে নিয়েও উদ্বেগ তার কম ছিল না। সে একা। ভালয় ভালয় বিমানে ফিরতে হবে তাকে। যেমন হয়েছে এই বাঘগুলো! খাওয়াও শেষ হয় না—স্থান ত্যাগ করবারও নাম নেই। যেন না ঘুমোবার প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে ওরা। রাত নেমে এলে যদি কোন সুরাহা হয়, এই আশায় আকাশের দিকে তাকাল সে। সূর্য এক চুলও নড়ে নি। আর তখনই মনে পড়ল, এটা তো চিরদিবসের রাজ্য। ঘড়ির দিকে তাকাল। কিন্তু বোঝা গেল না কিছুই। ঘণ্টার কাঁটা হয়ত এরই মধ্যে এক পাক চক্কর খেয়ে এসেছে। সূর্য না ঘুরলে সময় জানতে মানুষ যে কত অসহায় বোধ করে, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল সে।

বন্য কুকুর এবং হায়নারা দলে দলে ঘুরঘুর করছিল চারদিকে। পরিত্যক্ত কোন দেহাবশেষ থেকে দু-এক খাবলা মাংসও খাচ্ছিল কেউ কেউ। হায়নার কুৎসিত চেহারা দেখবার মত। ছোট ছোট শক্তিশালী পা। চওড়া শক্ত চোয়াল; হাড় গুঁড়ো করে ফেলতে পারে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে। পিঠে ও পাশে কাল ঘন লোম। বুক আর পেটের নিচেটা সাদা লোমে ঢাকা।

সর্বগ্রাসী ক্ষুধার চাড় অনুভব করল গ্রিডলে। এদিকে রাজ্যের ঘুমও এসে জড়ো হয়েছে দুই চোখে। গাছের নিচেই মরে পড়ে ছিল একটা হরিণ। তাই দিয়েই ক্ষুধা মেটাবার জন্য নেমে এল সে। অবশ্য নামবার সময় একবার দেখে নিল চারদিক। কারণ, এই বাঘগুলি হাইজাম্পে যেমন ওস্তাদ, লং জাম্পেও কোন অংশে কম নয়।

ত্রস্ত হাতে চাকু চালিয়ে হরিণের পেছন দিককার খানিকটা মাংস কেটে

নিল গ্রিডলে। কয়েকটা বাঘ তার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়েও ছিল। কিন্তু গা করেনি বিশেষ। চক্ষু মুদিত করে আবার তারা আরব্ধ কাজে মন দিল—কেউ আহারে, কেউ বা বিশ্রামে।

গ্রিডলে ততক্ষণে গাছে উঠে গেছে। শুকনো পাতা আর ডালপালা সংগ্রহ করে গাছের ওপরই আগুন জেলে দিল সে। মাংস ঝলসানো হল তাতে। হলফ করে বলতে পারত গ্রিডলে যে, সারা জীবনে এমন সুস্বাদু মাংস আর খায়নি কখনো।

কতক্ষণ খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল তার খেয়াল নেই। হুঁশ হতেই দেখে, ময়দান সাফ—বাকী বাঘ কটা ধীর মন্থর গতিতে ফিরে যাচ্ছে বনে। উদরের বহর দেখে বোঝা যায়, বেশ কিছুকাল এখন হিংসা ছেড়ে দেবে এরা। হায়নারা তখন মহাভোজে মেতেছে। তাদের প্রতাপে বন্য কুকুর এবং শেয়ালেরা কাছে ঘেঁষতে পারছে না। পরিতৃপ্ত হয়ে হায়নারা চলে গেলে কুকুরেরা গোগ্রাসে গিলতে লাগল মাংস। শেয়ালেরা ভোজে বসল সবার শেষে।

ঘুম পেলেও দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি গ্রিডলে। এখন তেষ্টা পেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাসী মাংসের গন্ধ নাকে আসতেই খেয়াল হল, বহু সময় নষ্ট করছে সে। বাঘেরা আবার ফিরে আসতে পারে। অগত্যা গাছ থেকে নেমে পথের সন্ধানে চলল সে। দু-একটা কুকুর যে খেঁকিয়ে না উঠেছিল তা নয়। কিন্তু যতক্ষণ তাদের উদর পূর্ণ থাকবে ততক্ষণ ক্ষতির কারণ হবে না তারা। তাই নির্ভয়ে মাঠের কিনারা বরাবর চলতে লাগল গ্রিডলে।

আধ পাক ঘুরে নিজের বোকামিকে গালাগাল দিতে লাগল সে। গাছে গাছে চিহ্ন দিয়ে রাখতে বারণ করায় কি ভুলই না করেছে। এখন তার ফল ভুগতে হবে। একটা নয়, দুটো নয়—অসংখ্য পথ এই প্রান্তরে এসে মিশেছে। কোন পথ ধরে এখন ফিরে যাবে সে? নিজেদের পায়ের চিহ্নও আর নেই যে তাই দেখে পথ চিনবে। থাবাওলা পায়ের ছাপে সারাটা পথ ভরে আছে। অগত্যা ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিল সে। আন্দাজের ওপর ভরসা করে একটা পথ বেছে নিল।

গাছে গাছে নানা আকারের সব বানর ছিল। মানুষেরই পূর্বপুরুষ এরা। অথচ নিজেদেরই উত্তর-পুরুষের একজন সন্তানকে দেখে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভদ্রতার পরিচয় দিচ্ছিল তারা। গ্রিডলে ভাবল, শেষে কি এদের মাঝেই

সারা জীবনের জন্য ঘর বাঁধতে হবে? কিন্তু নিজের চেয়েও দলের লোকদের জন্য তার ভাবনা বেশী। তাদের সমস্ত দায়িত্ব তো তারই।

তৃষ্ণা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার আগেই একটা নির্ঝরিণীতে এসে পৌঁছল সে। সঙ্গে নিয়ে আসা ঝলসানো মাংস খেল, তৃষ্ণা মেটাল, বিশ্রাম করল। তারপর একাকীত্বের সমস্ত দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে এগিয়ে চলল ভাগ্যের পরিহাস সফল করতে।

গ্রিডলে জানত না যে ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল সে। এও জানত না যে, বিমানের লোকেরা তার জন্য দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন জুপনার ঠিক তখনই ডোর্ফকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি ব্যাপার বলতো? বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেল, অথচ না গ্রিডলে ফিরে এল, না ফিরে এল টার্জন।'

ডোর্ফ এবং হাইন্‌স্‌-কে নিয়ে পর্যবেক্ষণ কেবিনে বসে সারাক্ষণ জঙ্গলের দিকে নজর রেখেছে ক্যাপ্টেন। ডোর্ফ বলল, 'এখন কি করবো না করবো তাও বুঝতে পারছি না ছাই।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'ওপরের পৃথিবী হলে এতক্ষণে বন-জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলা হত। মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসার কোন অসুবিধেই হত না। কিন্তু কেউ এখানে বুক ঠুকে বলতে পারবে না যে অভিযান শেষ করে সে আবার ঠিক পথ চিনে ফিরতে পারবে। দলের লোকগুলো ফিরে আসবে এই আশায় আমরা বিমান নিয়েও খুঁজতে যেতে পারছি না।'

দূরবীণ দিয়ে দেখতে দেখতে প্রতিটি গাছপালা, ঝোপঝাড় মুখস্ত হয়ে গেল হাইন্‌স্‌-এর। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে এই সন্ধান, তারাই ফিরল না। শেষে কি একটা দেখে লাফিয়ে উঠল সে।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার—কি দেখলে তুমি?'

'ওটা একটা লোক—আমি জোর গলায় বলতে পারি।'

'কোথায়? দেখি—।' বলে ডোর্ফ এগিয়ে গেল। দূরবীণ চোখে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, লোকই বটে। গ্রিডলে না ভন্‌ হোষ্ট বলতে পারছি না। যেই হোক না কেন, তার সাথে আর কেউ নেই—সে একা।'

ক্যাপ্টেন আদেশ দিল, 'এক্ষুনি জনা দশেক লোক নিয়ে এগিয়ে যাও। দেখো, একটুও যেন বিলম্ব না হয়।'

লোকটা আর কেউ নয়—জ্যাসন গ্রিডলে। ঘাঁটিতে ফিরতে পেরে আনন্দ

পেল যেমনি, দলের আর কেউ না ফেরায় মুষড়েও পড়ল ভীষণ। দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে আহার করে নিল। ছোটখাট একটা ঘুমও দিল। তারপর স্থির করল, মনোপ্লেনটা নিয়ে সে একাই বের হবে। খুঁজে বের করতেই হবে সবাইকে।

মনোপ্লেনটা গর্জন করতে করতে উঠে গেল ওপরে। বাকী সবাই সাফল্য কামনা করে বিদায় জানাল হাত নেড়ে নেড়ে। গ্রিডলের সেদিকে মন ছিল না। সে তখন দিগন্তের পানে তাকিয়ে ছিল। দিগন্ত বলতে অবশ্য কিছুই নেই এখানে। জমি এখানে উঠে গেছে ওপরদিকে। পাহাড়-পর্বতও আছে। কিন্তু পশ্চাতে আকাশের পটভূমিকা নেই। দুবার সে চক্কর খেল। তার সন্ধানী দৃষ্টি সারাক্ষণ নিচের দিকেই ছিল। কিন্তু সবুজের সমারোহ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না সে।

অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে জেনেও সন্ধান করে চলল সে। প্রথমে বৃত্তাকারে পাক খেল। তারপর এলোমেলো এবং শেষে সোজা চালিয়ে চলল প্লেনখানা। সবুজ গাছপালার ঐ নিবিড় চন্দ্রাতপ ভেদ করে কিছুই নজরে আসছিল না। হয়ত সহকর্মীদের মাথার ওপর দিয়েই উড়ে গেছে সে। তারা হয়ত তাকে দেখেছেও। অথচ বহুদূর বিস্তৃত সবুজের মেলা ছাড়া কিছুই নজরে আসছে না তার।

সন্ধান শেষ করে ঘাঁটির দিকে ফিরে চলেছিল সে। হঠাৎ ঠিক মাথার ওপর কি যেন একটা দেখে ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল তার। অতিকায় একটা দানব পাখি তার দিকেই নেমে আসছিল। ডানা দুটো তার প্রায় মনোপ্লেনটার মতই ছড়ানো। বিশাল লম্বা চোয়ালের ভেতরে ঝকঝকে সারি সারি দাঁত। দানবটা যেভাবে তেড়ে আসছিল তাতে গ্রিডলের মত সাহসী পুরুষেরও প্রাণ উড়ে গেল।

গ্রিডলে বিমানটাকে সোজা ডাইভ খাওয়ালো। তবু ঐ কদাকার টেরানোডন-এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। প্রপেলারের গায়ে এসে পড়তেই দুর্ঘটনাটা চোখের নিমেষে ঘটে গেল। কাঠ এবং ধাতুর তৈরী কাঠামোটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার শব্দ এবং পাখির আর্তনাদ কাঁপিয়ে তুলল চারদিক। সাথে সাথে গ্রিডলে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করল বটে, কিন্তু মাথায় আঘাত পেয়ে সংজ্ঞা হারাল সে। একটা

অচেতন দেহ নিয়ে ছত্রাকারে ছড়ানো প্যারাস্যুটটা ধীরে ধীরে নেমে চলল মাটির দিকে।

[৬]

টারগাস আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দলের লোকজন সব কোথায় ?'

টার্জন মাথা নাড়ল, 'বলতে পারি না।'

আবার প্রশ্ন, 'কোন্ দেশের লোক তুমি ?'

'আমার দেশ এখানে নয়—অনেক অনেক দূরে।'

হতে পারে অনেক দূরে, কিন্তু পথ চিনে টার্জন সেখানে যেতে পারছে না কেন ? টারগাসের মাথায় কিছুতেই এ-রহস্যের কিনারা হল না। সে তো কোনদিন নিজের পথ চিনে ঘরে ফিরতে একটুও ভুল করেনি। টারগাস তো আর জানত না যে পেল্যুসিডারের প্রতিটি প্রাণীর মত তার মধ্যেও প্রকৃতিদত্ত একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতা বলেই যে কোন জায়গা থেকে ঘরে ফিরতে পারে তারা—তা সে যতদূরে আর পেল্যুসিডারের যেখানেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক না কেন।

টার্জনের এই হতবুদ্ধিকর অবস্থা দেখে টারগাস আবার বলল, 'সেজন্য ভেব না। নূতন একজাতের লোক দেখেছি আমি। তারাই হয়ত তোমার দলের লোক। তোমাকে তাদের কাছেই নিয়ে যাব।'

'কোথায় দেখেছ তাদের ? কবেই বা দেখেছ ?'

টারগাস কিন্তু এ-প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। যথেষ্ট কারণও ছিল। মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা এখনও সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট হয়নি টারগাসের মধ্যে। তাছাড়া তার কাছে সময়বোধ বলতে কিছু নেই। কয়েকদিন আগে দেখে থাকতে পারে, আবার কয়েক বছর আগেও দেখে থাকতে পারে। ওর সাথে যাওয়া ছাড়া টার্জনের করবারও কিছু ছিল না।

জুটি জুটেছিল বেশ। একজন সবেমাত্র সভ্যতার চৌকাঠে এসে পৌঁচেছে। আর একজন সভ্যতার প্রতিভূ হয়েও বেশবাস আচার-আচরণে আদিম পন্থাই বেছে নিয়েছে। টারগাস প্রথমে অবহেলার চোখেই দেখত টার্জনকে। দৈহিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা, সাহস এবং পথ চেনার ব্যাপারে টার্জন তার তুলনায় একেবারেই নিকৃষ্ট জাতের জীব—এই ধারণাই ছিল তার। যতই সময় কাটতে লাগল,

এই ভুল ধারণার নিরসন হয়ে টার্জনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগে ভরে উঠল তার অন্তর।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শিকার করল তারা। সমান তালে দোল খেয়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছে গেল। ফুলে ফুলে ছাওয়া তৃণাচ্ছাদিত মাঠের মধ্য দিয়ে শিকারের পেছনে ধাওয়া করল। বন্য পরিবেশে নির্ভয়ে নিদ্রাসুখও উপভোগ করল।

নতুন ধনুর্বাণ তৈরী করল টার্জন। সুদৃঢ় বর্শা বানাতেও ছাড়ল না। টারগাস প্রথমে তাচ্ছিল্যভরেই দেখল অস্ত্রগুলোকে। পরে ওগুলোর কার্যকরী ক্ষমতা দেখে উৎসাহে ফেটে পড়ল তার বন্য সরল মন। টার্জন মনের মত করে অস্ত্রের ব্যবহার শেখাল তাকে।

তাদের চলার পথে অনেক বাধা এল। দুর্ভেদ্য জঙ্গল পড়ল, বেগবতী নির্ঝরিণী পথ রোধ করে দাঁড়াল, উন্মুক্ত প্রান্তরে অতিকায় সব জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল, হিংস্র শিকারী পশু দেখা গেল, কখনো-শেষ-না-হওয়া চনচনে রোদে শরীর দগ্ধ হল। আবার ক্লান্তিহরা গাছের ছায়ায় শরীর জুড়িয়েও গেল। তবু গন্তব্যস্থল এল না।

সেজন্য টার্জনের ভাবনাও ছিল না বিশেষ। তার মধ্যে জেগে উঠেছিল বন্য সৌন্দর্য উপভোগ করার রোমাঞ্চ, বিপদকে সস্নেহে আলিঙ্গন করার আকুলতা। অদেখা দৃশ্য, অচেনা শব্দ তার দেহের অণুতে অণুতে শিহরণ জাগিয়েছিল। যদি সে জানতে পারত, তাকে খুঁজতে গিয়ে তার দলের লোকেরা কতটা বিপদের মোকাবিলা করতে উদ্যত হয়েছে তাহলে এতটা তন্ময় থাকত না তার।

অবশেষে তারা এমন একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল, চরে-বেড়ানো পশুর সংখ্যা যেখানে নিতান্ত নগণ্য। হয়ত পশুরা তৃণ-গুল্ম শেষ করে অন্য কোথাও চলে গেছে। তাদের সাথে গেছে মাংসাশী প্রাণীরাও। প্রান্তরের এখানে সেখানেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-চারটে গাছ দূরে বনভূমি ক্রমশঃ উতরাই বয়ে উঠতে উঠতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। দুই সুদক্ষ শিকারী মাঠের মাঝখানটায় পৌঁছতেই একটানা যান্ত্রিক গোঙানি ভেসে এল দূর থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল উভয়ে। দূরত্বের অস্পষ্টতা থেকে ক্ষুদ্র একটা বিন্দু স্পষ্ট হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

টারগাস ব্যস্ত হয়ে বলল, পালাও—'থিপ্‌ডার আসছে।'

টার্জন অবাক হল, 'থিপ্‌ডার অবাক কি ?'

'থিপ্‌ডার মানে থিপ্‌ডার।' টারগাসের সহজ উত্তর।

'থিপ্‌ডারের প্রাণ আছে ?'

'হ্যাঁ। এটা একটা জলজ্যান্ত জিনিস···ভীষণ শক্তি এর গায়ে···মারাত্মক।'

'তাহলে এটা থিপ্‌ডার নয়।'

'তবে ?'

'এটা একটা এরোপ্লেন।'

'সে আবার কি জিনিস ?'

'তোমাকে কি করে বোঝাই বলতো। আমাদের পৃথিবীর লোকেরা এটাকে তৈরী করেছে। আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এটা। আমারই বন্ধু এর ভেতরে আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জলদি লুকিয়ে পড়ো, নাহলে তুমিও ওর পেটে চলে যাবে।'

সাথীর সমর্থনের অপেক্ষা না রেখে টারগাস বিরাট একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল। হাত নেড়ে দৌড়িয়ে পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল টার্জন। কিন্তু ফল হল না কিছুই। বিমানটি সোজা বেরিয়ে গেল। পাইলট নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি টার্জনকে। বিমানের আবির্ভাব টার্জনকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে গেল। কেউ হয়ত নিজের জীবন বিপন্ন করে টার্জনকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

টার্জন বুঝতে পারল না, বিমানটি সবে ঘাঁটি থেকে উড়ে আসছে, না ঘাঁটির দিকেই ফিরে যাচ্ছে। নাকি বৃত্তাকার পথে ঘোরা শুরু করেছে। বিমানের গতিবিধি দেখে ঘাঁটির অবস্থান বুঝতে পারা একেবারেই অসম্ভব। তবু বিমানটা যেদিকে গেল সেদিকেই যাওয়া স্থির করল সে। অবশ্য তারা যাচ্ছিলও সেদিকেই।

টারগাস এসে টার্জনকে বলল, 'না, এটা থিপ্‌ডার নয়। তার চেয়েও হয়ত ভয়ঙ্কর কোন জীব। দেখলে না কেমন গোঁ গোঁ করতে করতে গেল। নিশ্চয়ই রেগে গেছে খুব। নয়তো ক্ষুধায় দিশেহারা হয়ে গেছে।'

টার্জন আবার বোঝাবার চেষ্টা করল, 'তুমি যা মনে করছ তা নয়। এটা একটা অচেতন পদার্থ। আমারই এক বন্ধু চালাচ্ছে ওটাকে। আমাকেই খুঁজছে সে।'

টার্জন দেখল, অপাত্রে জ্ঞান দান করে কোন লাভ হবে না। মানুষও যে উড়তে পারে একথা বোঝবার মত বুদ্ধি এখনো ঘটে গজায় নি এর।

বিমানের শব্দ মিলিয়ে যেতেই আবার যাত্রা শুরু হল। সামনে পড়ল একটা গিরিখাত। চারিদিকে ছোটখাট সব পাহাড়, অসংখ্য গিরিগুহা আর ফাটল। গিরিপথে ছোটবড় নানা আকারের সব পাথর ছড়ানো। আবহাওয়া রুক্ষ শুষ্ক। প্রাণী যেমন নেই, জল তেমনি নেই কোথাও। স্থানটা দ্রুত পার হয়ে যাবার জন্য জোর কদমে হেঁটে চলল দুজনে।

টার্জন উন্মুখ হয়ে ছিল বিমানের শব্দ আবার শোনবার আশায়। শব্দ সে শুনল ঠিকই। তবে বিমানের নয়—পাখির। এমন চিৎকার যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। আওয়াজটা আসছিল গিরিখাতের ওপার থেকে। টারগাস থেমে গেল। তার চোখে ভয়ার্ত চাহনি।

'কি হল?' প্রশ্ন করল টার্জন।

'ডায়াল আসছে!'

'সেটা আবার কি?'

'ডায়াল…পাখি…ভয়ঙ্কর এর স্বভাব! কিন্তু এর মাংস বড় চমৎকার। আর টারগাসও এখন ক্ষুধার্ত।'

ব্যস, টারগাস ক্ষুধার্ত তো সাতখুন মাপ আর কি! পাখিটা যতই ভয়াবহ হোক, যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। সেটি তার চাই-ই চাই। কি করে, দেখবার জন্য টারগাসের পিছু পিছু টার্জনও ছুটে চলল। বাতাসের ঝাপটার সাথে উৎকট একটা গন্ধও ভেসে আসছিল গিরিখাত দিয়ে। গন্ধটা অনেকটা উটপাখির মত। চিৎকারের সাথে পাখিটার আঁচড়ানো-কামড়ানোর শব্দও শোনা যাচ্ছিল।

একটা পাথরের চাঁই-এর আড়ালে লুকিয়ে থেকে উভয়েই দেখতে পেল, বিরাট আকারের সেই পাখিটা পাহাড়ের ফাটলের গায়ে পাগলের মত পাখার ঝাপটানি দিচ্ছে। অজানা জগতের এই অজানা পাখিটার নাম ছিল ডায়াল —অবশ্য টারগাসের কাছে। টার্জনও জানত না যে মাইয়োসিন যুগের একটা ফোরোর‍্যাকস্-এর দিকে সে তাকিয়ে ছিল। ঘোড়ার চেয়ে বড় মাথা। মাথায় প্রকাণ্ড ঝুঁটি। মাটি থেকে মাথাটার উচ্চতা আট ফুটেরও বেশী। দেহের তুলনায় ডানার আকার দারুণ ছোট। বাঁকানো মজবুত চঞ্চু। সুগঠিত দুটি পা—প্রতিটিতে তিনটি করে নখর। সহজাত হিংস্রতা নিয়ে একটা বর্শার গায়ে আঘাত হানছিল প্রাণীটা। একি! বর্শা নয়—বর্শাধারী একজন

মানুষকে আক্রমণ করছিল সে। মানুষটার সাহসেরও বলিহারি যাই। সামান্য একটা বর্শা নিয়ে অত বড় প্রাণীটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সে।

আরো দু-জন শত্রু যে আড়ালে আড়ালে এগিয়ে এসেছে, প্রাণীটা তা জানে না। মাত্র বিশ ফিট ব্যবধান থাকতেই গদা বাগিয়ে ছুটে গেল টারগাস। ধনুকে তীর লাগিয়ে টার্জনও ছুটল তার পেছনে।

পাখিটা ইতিমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গদাটা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে টারগাস তখনও এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য—এক আঘাতে পাখিটার পায়ের হাড় গুঁড়ো করে দেবে। বলিষ্ঠ হাতের মোক্ষম এক ঘা অবশ্য তা পারে। কিন্তু আঘাত যদি না লাগে? নিশ্চয়ই টারগাসকে মৃত্যু বরণ করতে হবে তখন।

টার্জন যা ভেবেছিল তাই হল। গদার আঘাত ব্যর্থ হল। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে টার্জন তীর ছুঁড়ল। সিধে পাখিটার বুকের মধ্যে গেঁথে গেল তীরটা। টারগাস পাশে সরে যেতেই আরো একটা তীর গিয়ে বিঁধল পাখিটার বুকে। পাখিটা এবার টারগাসকে ছেড়ে টার্জনকে নিয়ে পড়ল। টারগাস ইতিমধ্যে অব্যর্থ লক্ষ্যে একটা পাথর ছুঁড়ে বসেছে। পাখিটার মাথায় সেটা ঠকাস্ করে লাগতেই টলতে লাগল সে। সুযোগ বুঝে আরো দুটো তীর ছুঁড়ল টার্জন। তবু পাখিটার বেগ প্রতিহত হল না। ঠিক তখন টার্জনের কাঁধের ওপর দিয়ে সাঁ করে একটা বর্শা বেরিয়ে গেল। শেষ অস্ত্রের আঘাতে পাখিটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। চোখের নিমেষে খোলা ছুরি হাতে ছুটে গেল টার্জন এবং সেটা আমূল বসিয়ে দিয়ে বুকের ধুকধুকুনি বন্ধ করে দিল পাখিটার।

এবার টার্জন ফিরে দাঁড়াল তার ত্রাণকর্তার দিকে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সুন্দর এক যোদ্ধা। গায়ের রং তামাটে। কোমর থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত চামড়ার পোশাক। এ ছাড়া দেহে আর কোন আবরণ নেই। মাথার চুল পেছন দিকে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। পাথরের ছুরি কোমরে গোঁজা। হাতে পাথরের বর্শা। সুন্দর আয়ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সুঠাম দেহ। প্রথম সভ্যতার এক সুন্দর নমুনা।

টারগাস তেড়ে এল গদা নিয়ে। বলল, 'আমি টারগাস—যুদ্ধ চাই।'

এক ঝটকায় পাথরের ছুরি খুলে নিয়ে আগন্তুক একবার টারগাসের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

টার্জন এসে দাঁড়াল উভয়ের মাঝে। বলল 'করো কি, করো কি! এ হচ্ছে তোমার বন্ধু—কেন মারতে চাও একে?'

'এ হচ্ছে গিলাক। একে না মেরে ফেললে এ-ই আমাকে শেষ করে দেবে।'

'তা কেন! দেখলে না এ আমাদের ডায়ালের হতে থেকে বাঁচাল।' তারপর আগন্তুকের দিকে ফিরে বলল, 'আমাদের ভাষা বুঝতে পার তো? যদি পেরে থাক, তাহলে এসো আমরা বন্ধুত্ব পাতাই। আচ্ছা, তোমার নাম কি?'

আগন্তুক উত্তর দিল, 'আমার নাম থোর। একটু একটু কথা বলতে পারি স্যাগোথদের ভাষায়। কি আমাকে বন্ধু হতে বলছ কেন?'

'আমরা শত্রুতা চাই না বলে।'

'কিন্তু এখানে তো এ নিয়মই চলে আসছে—এক গোষ্ঠীর লোক অপর গোষ্ঠীর লোক পেলেই হত্যা করে।'

'তা করুক। কিন্তু আমরা তা চাই না। ছাখো, আমরা যদি না আসতাম তুমি পাখিটার হাতে নিহত হতে। আবার তুমি যদি বর্শা না ছুঁড়তে তো আমাদেরও প্রাণে বাঁচা দায় হতো। উভয়েই আমরা উভয়ের প্রাণ রক্ষা করেছি, তাই শত্রুতা নয়—বন্ধুত্ব। আচ্ছা, এখন যাবে কোন্‌দিকে?'

টার্জন যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করল থোর। টার্জন খুশী হয়ে সঙ্গীটাকে জিজ্ঞেস করল, 'একে আমরা বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারি তো টারগাস?'

মাথা চুলকে উত্তর দিল টারগাস, 'কখনো এমন হয় নি।'

'হয় নি—এবার হবে। চলে এসো।'

এমনভাবে কথাগুলো বলল টার্জন যেন তার আদেশ মানতে বাধ্য ওরা। টার্জনকে ছুরি দিয়ে পাখিটার দেহ খণ্ডবিখণ্ড করতে দেখেও আদিবাসী লোক দুটি একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। শেষে উভয়েই এগিয়ে এল টার্জনকে সাহায্য করতে। পাথরের ছুরি ব্যবহার করল থোর। টারগাস সুতীক্ষ্ণ নখর ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন অনুভব করল না।

পাথরের ছুরি অপেক্ষা টার্জনের ইস্পাতের ছুরি অনেক বেশী কাজ দিচ্ছিল। তাই দেখে কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল থোরের চোখে। টারগাসের মত টার্জনও মাংস কাঁচাই খাওয়ার উপক্রম করেছিল। এমন সময় দেখল, চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়েছে থোর। অগত্যা মাংসটুকু ঝলসে নেবার জন্য তার কাছেই গেল সে। টারগাস নিজের ভাগের মাংস আড়ালে নিয়ে খেতে

লাগল। সম্ভবতঃ তার মধ্যে আদিম বন্য প্রবৃত্তির প্রাবল্য একটু বেশীই ছিল।

ক্ষুধা নিবৃত্ত করে তিনজনে এগিয়ে চলল। অনেক চড়াই-উৎরাই ভেঙে, অনেক গিরিখাত পার হয়ে তারা এসে পৌঁছল একটা উপত্যকায়। থোর স্যাগোথদের ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত না। তার সাথে আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে টার্জন তার ভাষা শিখতে শুরু করেছে। থোরও অত্যধিক আগ্রহে তাকে শিখিয়েছে। পরস্পরের আন্তরিক চেষ্টায় অল্প সময়েই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে টার্জন।

উপত্যকায় এসে থোর বলল, 'ঐ যে জোরাম—আমাদের দেশ। পাহাড়ের ওপারে থিপ্‌ডারের রাজ্যে আমাদের বাস।'

থিপ্‌ডার শব্দটা টারগাসের মুখ দিয়েও শোনা গেছে ইতিপূর্বে। কিন্তু প্রাণীটার বর্ণনা সে দিতে পারেনি। টার্জন তাই জিজ্ঞেস করল, 'থিপ্‌ডার কি?'

থোর বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথাকার লোক হে তুমি? থিপ্‌ডার কাকে বলে জানো না, আর গিলাকদের ভাষায়ও কথা বল না!'

'আমি পেল্যুসিডারের লোক নই।'

'সেটা বিশ্বাস করতাম যদি মোলোপ্‌-আজ্‌ ছাড়া আর কোন জায়গা আমাদের জানা থাকত। সেখানকার লোকেরা তো এক-একটা ক্ষুদে দানব। তুমি তো তাদের মত নও।'

'না, আমি সেখানকার লোক নই। তবে আমাদের দেশেও মানুষের ছদ্মবেশে দানব অনেক আছে।'

সময় গড়িয়ে চলল। তিনজনের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা একটু একটু করে ঘনীভূত হল। একের সাথে অপরের কত ব্যবধান! সভ্যতার যাত্রাপথে তিন যুগের মানুষ এরা তিন জন। শত সহস্র বৎসরের ব্যবধান তাদের মধ্যে। তবু তারা কত আপন।

ঘাঁটিতে ফেরবার সকল সম্ভাবনাই হয়ত তিরোহিত হয়ে গেছে। হয়ত ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছে টার্জন। ফিরেও এখন লাভ নেই। ক-দিনের পথ এসেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কতবার তারা খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে তারও কোন হিসেব নেই। এমন সময় দূরে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু একটা দেখে খটকা লাগল তার মনে। জিনিসটা আর যাই হোক, কিছুতেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন

অঙ্গ নয়। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামবার সময়ও বোঝা যায় নি, জিনিসটা কি। বোঝা গেল একেবারে কাছে গিয়ে আর, বুঝতে পেরেই চোখ দুটো কপালে উঠল তার। এ যে সেই এরোপ্লেনটারই ভগ্নাবশেষ!

[৭]

হাঁফাতে হাঁফাতে জানা এসে থামল পাহাড়ের একদম চূড়ায়। চারজন কদাকার লোক ছিনে জোঁকের মত তখনও তার পেছনে লেগে ছিল। দূর পাহাড়ের ওপারে ফেলি নামে একটা জাগা আছে। সেখান থেকেই এসেছে তারা। এসেছে মেয়ে চুরি করতে। জোরামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে জানা। 'জানা' শব্দের অর্থ লাল ফুল। হ্যাঁ, অনাঘ্রাত লাল ফুলই সে।

উপলময় বন্ধুর পর্বত। পেছনে যাবার উপায় নেই। সামনে পাহাড়টা খাড়া নেমে গেছে। লোকগুলো এখনো ধরতে পারেনি জানাকে। চঞ্চল হরিণীর মত ক্ষিপ্র গতি তার। কিন্তু একা অতগুলো লোকের সাথে কতক্ষণ পেরে উঠবে সে? চার দিককার রুক্ষ গ্রানাইট পাথরের মত লোকগুলোর হৃদয়ও দয়ামায়াহীন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে জানাকে। এবার সে দেখিয়ে দেবে, এই কোমল শরীরেও যথেষ্ট তেজ আছে—বিপদের সাথে লড়বার ক্ষমতা আছে।

শৌর্যে বীর্যে জোরাম সুপরিচিত। এখানকার গৌরব মেয়েদের সৌন্দর্যে। সৌন্দর্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত যে দূর সমুদ্র থেকেও কতকগুলো জাতি আসত মেয়ে চুরি করতে। এরই বোন ছিল লানা। তাকেও একদল দুর্বৃত্ত চুরি করে নিয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও জোরামের দুটি মেয়ে চুরি গেছে। জানার ভাগ্যেও এখন ঘটতে যাচ্ছে সেই একই ব্যাপার। কিন্তু প্রাণ থাকতে ফেলির লোকজনের হাতে সে ধরা দেবে না। ফেলি নিচু জমির দেশ। জোরামের লোকেরা সর্বদাই সেখানকার অধিবাসীদের ঘৃণার চোখে দেখে। ধরা পড়লে তাকে সেই নিচু জমির দেশেই নিয়ে যাওয়া হবে। বাকী জীবন সেখানেই কাটাতে বাধ্য হবে সে। ভবিষ্যতে এই জোরামের লোকেরাই তাকে ঘৃণা করবে—তার সন্তানদের অবজ্ঞার চোখে দেখবে। এর চেয়ে অসম্মানের আর কি থাকতে পারে?

জোরামের বহু যোদ্ধাই জানাকে হৃদয় দান করে বসে আছে। অথচ জানার

হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নি কেউই। ভবিষ্যতে অবশ্য এদেরই একজনকে বেছে নিতে হবে জীবনসাথী রূপে। যদি না ইতিমধ্যে অন্য কোন দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে।

পাহাড়ে একা বেরুনোই তার অন্যায় হয়েছে। পাখির ডিম খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল সে। তখন কি জানত যে পাহাড়ের আড়ালেই ওৎ পেতে বসে আছে বিজাতীয় চারটি লোক। আচমকা এসে প্রথম লোকটি তার হাত ধরতেই পিছলে সরে এসেছিল সে। ভেবেছিল, বৃত্তাকার পথে তাকে এড়িয়ে গিয়ে গ্রামে ফিরলেই হবে। কিন্তু সৌভাগ্যের ফোঁটা কপালে চড় চড় করে। নাহলে আরো তিনজন লোক কেন তার পাছু নিল।

পাহাড়ের নিচেই থেমে গিয়েছিল লোকগুলি। পরস্পর বলাবলি করছিল, 'কি সাংঘাতিক মেয়ে বাবা! চারজন পুরুষকে ঘোল খাইয়ে দিল। পাছু নিয়ে আর কাজ নেই—চল ফিরে যাই।'

দলপতি ধমকে উঠল, 'কোন কাজ অসমাপ্ত রেখে ফেরার অভ্যেস নেই আমার। একে পাকড়াও করবোই আমি। এজন্য যদি সাগর পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয় তবু এ বন্দা দমবার পাত্র নয়।'

একজন বলল, 'আর তাহলেই নির্ঘাত মারা পড়তে হবে আমাদের। হাত-পা ছড়ে গেছে, স্যাণ্ডেলটাও ক্ষয়ে গেছে।'

'মারা পড়তে হবে—মারা তো পড়ো নি এখনো। চল।' দলপতি খেঁকিয়ে উঠল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকগুলো অনুসরণ করল দলপতিকে। নিচু জমির বাসিন্দা তারা। পাহাড়ে চড়ায় তেমন দক্ষতা নেই। মেয়েটাও কম নয়। এমন দুর্গম পার্বত্য পথে নিয়ে এসেছে যে প্রতিপদে হোঁচট না খেয়ে চলাও দায়। তাছাড়া পদে পদে থিপ্‌ডারের ভয়ও আছে। আর রয়েছে উচ্চতা সম্বন্ধে ওদের অহেতুক দুর্বলতা।

ওপরে দাঁড়িয়ে জানা উঠে আসতে দেখল ওদের। দাঁতে দাঁত চেপে একটা চেপে একটা সঙ্কল্প করে বসল সে—প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে ওদের। পরিধেয় নরম চামড়ার পোশাকখানা বাতাসের দমকে দুলছিল। নাভির নিচ থেকে জানু পর্যন্ত লম্বমান সেই বস্ত্রখণ্ড। ঊর্ধ্বাঙ্গে নরম চামড়ার একটি কাঁচুলি ছাড়া আর কোন আবরণ নেই। পীন পয়োধর অবাধ ঔদ্ধত্যে সমুন্নত। দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙ্। নিরাবরণ নিটোল পা দুটি আভরণহীন।

বাদামী রং-এর রেশমী চুলগুলো ঘাড়ে-পিঠে এসে পড়েছিল, কখনো বা উড়ছিল বাতাসে। হাতে ছিল রাঙানো চামড়ার দু-প্রস্থ বলয়। পায়ে ছিল চামড়ার স্যাণ্ডেল। মাথায় ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল বহুরঙা একটি পাখির পালক। কোমরে ঝুলছিল একটি পাথরে ছুরি। হাতে ধরা ছিল হাল্কা একটা বর্শা।

কয়েকখণ্ড নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল জানা। চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার, এগোবে না বলছি। ফিরে যাও তোমাদের সেই নোংরা দেশে। জানাকে ধরবার সাধ্যি নেই তোমাদের।'

তার বাঁ দিকেই ছিল জোরাম। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। বিরাট একটা ফাটল পথ রুদ্ধ করে আছে। অগত্যা পাহাড়ের ঢালু বেয়েই নামতে লাগল সে। এই প্রথম একটা নূতন দেশের সাথে তার পরিচয় ঘটল। এমন দেশ জীবনে আর দেখেনি। বুঝল, বিশাল শৈলশ্রেণী পার হয়ে উপত্যকার কাছাকাছি এসে পড়েছে। বিস্তৃত উপত্যকার ওপারেই সুরু হয়েছে দুর্ভেদ্য বন।

নূতন হলেও জায়গাটা দেখবার জন্য বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করল না জানা। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এবং ততোধিক হিংস্র ওখানকার মানুষের কথা তার অজানা নয়। বাঁয়ে খাড়া গিরিখাত, ডাইনে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, পেছনে দুর্বৃত্তদল, আর সামনে এই ভয়ঙ্কর জঙ্গল। এবার বুঝিবা ধরাই পড়ল সে।

মন স্থির করতে সময় নিল। শত্রু তখন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে খানিকটা ব্যবধান রচনা করে খাড়াই বেয়ে নামবার জন্য তৈরী হল জানা। একশো ফুটের মত খাড়াই। নামতে পারলে নিশ্চিন্তে খানিকক্ষণ দাঁড়ানো যাবে—সাময়িকভাবে রেহাই পাওয়া যাবে। পা হড়কে গেলে অবশ্য চিরতরে মুক্তি।

বর্শার ফলকে বাঁধা চামড়ার ফিতেটা গলার চারদিকে বেঁধে নিল। তারপর বর্শাটাকে ঝুলিয়ে দিল পিঠ বরাবর। বুকে ভর করে খাড়াই বেয়ে একটু একটু করে নামতে লাগল। কখনো ধরবার কিছু পেল—কখনো পেল না। পা রাখবার মত সামান্য একটু অবলম্বন পেয়ে হাতড়াতে লাগল অন্য একটা চিড় আবিষ্কার করতে।

ওপরে তাকিয়ে দেখে শত্রুদের একজন ঝুঁকে পড়েছে তার দিকে। কর্কশ কুৎসিত মুখে বীভৎস হাসি লেগে আছে। সাথীরা পা দুটো ধরে রেখেছে তার। আর নিচের দিকে হাত চালিয়ে মেয়েটার নাগাল পাবার চেষ্টা

করছে সে। কয়েকবার মাথার চুল ঘেঁষে আঙুলগুলো বেরিয়ে গেল লোকটার। এত সামনে এসে শিকার হাতছাড়া করবার মত দুঃখ আর নেই। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। মেয়েটা আরো কয়েক ফিট নীচে নেমে গেল।

ভয় হল দলপতির—যেমন বেপরোয়া মেয়ে, শেষে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে প্রাণটাই সে খোয়াবে নাকি! বেঁচে থাকলে বরং পরে আবার ধরা যাবে। অগত্যা ফিরে যেতে মনস্থ করল সে। চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার কাছে হার মানছি আমরা। উঠে এস। এখন আর তোমাকে জ্বালাতন করবো. না। কিন্তু মনে রেখো, এখন ফিরে যাচ্ছি বটে, তবে আবার আসবো। তোমাকে আমার চাই-ই চাই।'

জানা উত্তর দিল, 'তোদের আশায় ছাই পড়ুক। এবার যেন থিপ্‌ডারের কবলে পড়িস তোরা। থিপ্‌ডার যেন তোদের মাংস ছিঁড়েখুঁড়ে খায়।'

দুর্বৃত্তরা কোন উত্তর দিল না। ওদের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানা তা বুঝতে পারল না। তবে, ওরা ফিরে যাক আর নাই যাক, জানা সরাসরি নিচেই নেমে যাবে। তারপর সুবিধে মত একটা পথ বেছে নিলেই হল। তাড়াহুড়ো করবার কিছুই নেই—ধীরেসুস্থে নামতে হবে তাকে।

ভাগ্য ভালই বলতে হবে—কিছুদূর নামতেই শুয়ে বসে বিশ্রাম করবার একটা চমৎকার জায়গা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়—থিপ্‌ডারের একটা ডিমও পাওয়া গেল সেখানে। দ্বিধা না করে ডিমটা দিয়েই ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটালো জানা। এভাবে দেহমনে শক্তিসঞ্চয় করে আবার নেমে চলল।

উপত্যকায় নেমে একবার ভাবল, গিরিপথ দিয়েই জোরামে ফিরবে সে। শত্রুদের কথা মনে হতেই তাতে বিরত হল। কী সুন্দর উপত্যকা! এতদিন এর সম্বন্ধে বিরূপ ধারণাই ছিল তার মনে। এটা নাকি ভীষণ খারাপ জায়গা। তাদের মত পর্বতবাসীদের নাকি মোটেই বাসযোগ্য স্থান নয়। তার নিজের মন বলছে, এখানে না এলে তার সৌন্দর্যপিপাসু মন অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হত।

তার মন যখন এভাবে বিভোর হয়ে ছিল, তখন অদ্ভুত একটা আওয়াজে চমকে উঠল সে। একটা থিপ্‌ডারকে উড়ে আসতে দেখল আকাশ দিয়ে। এত বড় থিপ্‌ডার জীবনে দেখেনি সে। আর তাকে এমন গর্জন করতেও শোনেনি কখনো। তারপরের ব্যাপারটা আরও মজার। আর

একটা থিপ্‌ডার 'রণংদেহি' মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রথমটার গায়ে। খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি আর ভাঙ্গাচোরার শব্দ। সেই প্রচণ্ড সোরগোলের মাঝে অতিকায় একটা ব্যাঙের ছাতার মত জিনিসের আবির্ভাব। সেই ছাতাটা মাটির কাছাকাছি নামতেই স্পষ্ট দেখা গেল, একজন মানুষ ঝুলছে তাতে।

ভয়ে বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল জানার চোখ। সভ্যতার পথে বেশীদূর এগোয়নি তারা। কিছু কিছু কুসংস্কার স্বাভাবিক ভাবেই গজিয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু পাখির পেট থেকে জীবন্ত মানুষ বেরিয়ে আসা। এ যে অবিশ্বাস্য! চোখের দেখাকেও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। ফলে আগুপিছু না ভেবে গিরিখাতের দিকেই ছুটল সে। কিছুদূর গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল। মূর্তিমান বিপদের মত সামনেই মেয়েচোর দলের সেই চারজন লোক!

মধ্য আকাশের ঐ কাণ্ডকারখানা লোকগুলোও দেখেছে। তারাও ভয় পেয়েছে দারুণ। গিরিখাত ধরে ছুটতেও শুরু করেছিল তারা। কিন্তু এমন আকস্মিকভাবে জানাকে পাবার আশা করেনি। জানাকে তাদের দিকেই আসতে দেখে দলপতির নির্দেশে ফিরে দাঁড়িয়েছিল সকলে। সামনে পেছনে বিপদ দেখে তীরবেগে ডাইনে ঘুরে দৌড়তে লাগল জানা।

এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়তেই মাথায় আঘাত লেগে জ্যাসন গ্রিডলে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। জ্ঞান ফিরতেই দেখে, সবুজ নরম ঘাসের ওপর সে শুয়ে আছে। গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতেই মাথাটা একটু টনটন করে উঠল। প্রপেলারের ভাঙা টুকরো মাথায় এসে লেগেছিল মাত্র—আঘাত গভীর নয়। প্যারাস্যুটের দড়িদড়ার কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্থান নিরীক্ষণে মন দিল সে। একপাশে গভীর জঙ্গল। অপর পাশে উচ্চ পর্বতশ্রেণী। অদূরেই একটা গিরিপথ। তারই কিছুদূরে চারটে হায়না পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চাপা গর্জন করছে।

তা করুক। তার মন তখন অন্যদিকে। বিমানের দেহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও সেটিকে খুঁজে বের করতে হবে। আর কিছু না হোক, অস্ত্রগুলো তার চাই। কিন্তু একি! হায়নাগুলো তো তাকে তাক করছে না। তাক করে আছে একটি মেয়ের দিকে। মেয়েটি—কিছু না জেনেই হয়ত—ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মেয়েটির পেছনে ছুটে যাচ্ছে চারজন লোক।

হায়নাগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটি। জন্তুগুলো

তখনও আক্রমণ শুরু করেনি। একটা পথই শুধু খোলা ছিল মেয়েটির কাছে। সেটা হচ্ছে গ্রিডলের দিকে। এক মুহূর্ত ভাবল। শেষে গ্রিডলের দিকেই ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। গ্রিডলেও সাহস দিতে দিতে মেয়েটির দিকেই ছুটে যাচ্ছিল। হাতে ছিল তার ·৪৫ ক্যালিবারের রিভলভার।

হায়নাগুলো মেয়েটির পাছু নিতেই লোক চারজনও ব্যস্ত হয়ে উঠল। মেয়েটিকে কোনমতেই হায়নার কবলে পড়তে দেবে না তারা। একটা জন্তু লাফ দিতেই অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি করল গ্রিডলে। প্রাণহীন দেহটা মেয়েটির গায়েই লুটিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দে বাকী জন্তুগুলি যেমন থেমে গেল, তেমনি লোকগুলোও দাঁড়িয়ে গেল তাদের পেছনে। হায়নার মৃতদেহটাকে লাথি দিয়ে সরিয়ে গ্রিডলে হাত বাড়াল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিকে টেনে তুললেও গ্রিডলের নজর ছিল হায়না গুলোর দিকে। অনুসরণকারীদের কাছে পেয়ে জন্তুগুলো তাদের দিকেই রুখে দাঁড়িয়েছিল। সে মুহূর্তে গ্রিডলে জানত না, যাকে সে রক্ষা করল, পাথরের ছুরি দিয়ে সে-ই তখন মারতে উদ্যত হয়েছে তাকে। পেল্যুসিডারের নিয়মই এই—নিজ গোষ্ঠীর লোক ছাড়া যাকে কাছে পাবে তাকেই মেরে ফেলবে; নইলে নিজেকেই মরতে হবে তার হাতে। ছুরি তো তুলল। কিন্তু গ্রিডলের চকিত চাহনির মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেল সে যাতে উদ্যত হাত মাঝপথেই থেমে গেল তার। এমন মুখ আর এমন হাসি আর দেখেনি কখনো। সে হাসিতে কি ছিল কে জানে, হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল তার। 'গুড্ডুম্' শব্দ শুনে আর ধোঁয়া দেখে অপর সকলের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শব্দে তো তার কোন ক্ষতি হয় নি। বরং জন্তুগুলোর হাত থেকে রক্ষাই পেয়েছে সে। হাতের ছুরি নামিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে আগন্তুকটির মতই তার মুখেও দেখা দিল মৃদু হাসির রেশ।

লোকগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে জন্তুগুলোর আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিল। প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি করে মুগুর। দুটো জন্তুকে প্রাণপণে আঘাত করেছিল তারা। আহত হয়েছিল একটি। মুগুরের আঘাতে একটা পা-ই খোঁড়া করে দিয়েছিল জন্তুটার। দ্বিতীয় জন্তুটা একটা লোককে ধরাশায়ী করতেই আর একজনের কাছ থেকে মুগুরের নির্মম কঠিন আঘাত এসে পড়েছিল তার মাথায়। ফলে বেঁচে গিয়েছিল লোকটা। পা-ভাঙা জন্তুটা একজনকে সাপটে ধরতেই

ছুরি দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল সে। বাকী লোকগুলো সঙ্গীকে রক্ষা করতে একযোগে মুগুর ভাঁজল জন্তুটার মাথায়।

গ্রিডলের তখন ওদিকে তাকাবার ফুরসতই নেই। শেষ জন্তুটা পা পা করে তার দিকেই এগিয়ে আসছিল। গ্রিডলের এক হাতে ছিল রিভলভার, অন্য হাতটা ছিল জানার কাঁধের ওপর। পালাবার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ছিল জানার। সবারই দৃষ্টি হায়নাগুলোর দিকে কেন্দ্রীভূত। গ্রিডলের হাত তার কাঁধে এত আলতোভাবে রাখা ছিল যে, এক লাফেই তার নাগালের বাইরে যেতে পারত জানা। পালাবার জন্য দুর্বার ইচ্ছা যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু গ্রিডলের স্পর্শে এত সমবেদনার ভাব ছিল যে, সমস্ত নিরাপত্তার ভার ঐ অপরিচিত লোকটির ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। গ্রাম ত্যাগের পর নিজেকে এতটা নিরাপদ আর কখনোই মনে হয় নি তার। তাই পালিয়ে যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

জন্তুটাও লাফ দিল তখনই। গ্রিডলের রিভলভারও গর্জন করে উঠল সাথে সাথে সাথে। জন্তুটা তাকে নিয়ে ডিগবাজি খেল। রিভলভার গর্জন করে উঠল আবার। হায়নার ভারী দেহটা এলিয়ে পড়ল গ্রিডলের গায়ে।

কালান্তক মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হল গ্রিডলে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, জন্তুটার গায়ে বাঁ পা-টা রেখে মেয়েটি দু-হাতে গভীরভাবে গেঁথে যাওয়া বর্শাটা মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। তাহলে কি বর্শাটাই গ্রিডলের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখল? মেয়েটির সাহসের পরিচয় পেয়ে গ্রিডলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

বিপদ তখনও কাটেনি। মেয়েটি হঠাৎ তার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ দ্যাখো, ওরা এসে পড়ল। তোমাকে মেরে ওরা আমাকে নিয়ে যেতে চায়। বাঁচাও ওদের হাত থেকে।'

কথার এক বর্ণও বুঝল না গ্রিডলে। তবে সুন্দর মুখটিতে উদ্বেগের ছায়া দেখে বুঝতে পারল, সে কি চায়। হিংস্র জন্তুগুলোকেও সে এতটা ভয় করেনি, যতটা করছে লোকগুলোকে দেখে। অবশ্য কারণও ছিল। লোকগুলো দেখতে যেন মূর্তিমান জহ্লাদ। চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে কুটিলতা আর হিংস্রতা। গ্রিডলে ভাবল, মানুষের এসব গুণের জন্যই হয়ত মানুষকে জানোয়ারের সাথে তুলনা করা হয়।

গ্রিডলের নিষ্ক্রিয়তা ভাঙবার জন্য মেয়েটি বারবার অস্থিরভাবে রিভলভারটা

স্পর্শ করল, আর লোকগুলোকে দেখিয়ে দিল। গ্রিডলে চেঁচিয়ে বলল, 'এগোবে না—খবরদার।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। অগত্যা গুলি ছুঁড়ল গ্রিডলে। কিন্তু আঘাত করবার জন্য নয়—ভয় দেখাবার জন্য। লোকগুলো প্রথমে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যেই তারা দেখতে পেল, কারো কোন ক্ষতিই হয় নি, তখন চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল দু-জনকে। পিস্তল নেই বটে ওদের কাছে, কিন্তু মুগুরের একটা ঘা খেলেই মালুম হবে, বুলেটই বা কেমন আর মুগুরই বা কেমন। এবার যথার্থই গুলি ছুঁড়ল গ্রিডলে, এবং গুলি ছুঁড়ল প্রাণে মারবার জন্য। লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, বুকে হাত দিল, বেদনায় মুখ কোঁচকালো এবং ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে।

আবার গুলি ছুটল। আবার একজন পড়ে গেল। অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয় বিবেচনা করে দলপতি বাকী লোকটিকে নিয়ে চম্পট দিল।

জানাকে বলা হয় জোরামের অনাঘ্রাত লাল ফুল। চিরকাল অপরকে মুগ্ধ করে এসেছে সে। এই প্রথম তার নিজের মুগ্ধ হবার পালা এল। লোকটিকে যত দেখে ততই অবাক লাগে তার। প্রতিটি কাজই তার কৌতূহল জাগায়। অপরিচিত লোকটির যেমন চেহারা, তেমনি মুখের ছাঁদ। পোশাক-আশাকও তেমনি জমকালো। এমন পোশাক জীবনে আর কখনো দেখেনি জানা। এমন অস্ত্রই কি আর দেখেছে। একটু আলোর ঝিলিক, একটু ধোঁয়া, আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দ—ব্যস্, একটা লোক মরে যাবে! অজানা অচেনা লোক—নিজ গোষ্ঠীর কেউ নয়—অথচ একটুও সন্দেহ বা ভয় হচ্ছে না তাকে। ভিন্ন গোষ্ঠীর লোককে হত্যা করবার আজন্মলালিত প্রবৃত্তির মূলে এই লোকটিই প্রথম কুঠারাঘাত করেছে। হয়ত অবচেতন মনে লোকটির প্রতি অন্ধ অনুরাগ জন্মেছে তার। তাই পালিয়ে যাবার সকল প্রচেষ্টায় ইস্তফা দিতেছে জানা।

এদিকে গ্রিডলের হয়েছে দু-দফা বিপদ। পথভ্রষ্ট পথিক সে। নিজেরই কোন ঠিকানা নেই, আবার সাথে একটি মেয়ে। মেয়েটির সম্বন্ধে কিছুই জানে না। শেষে কি মেয়েটিই তার বিপদের কারণ হবে? না-কি সেই হবে একঘেয়ে বন্য পরিবেশে প্রাণোচ্ছল উৎসাহ—ভবিষ্যতের নিরন্ধ্র অন্ধকারে একমাত্র আলোক-বর্তিকা। কিন্তু উভয়ের কেউ-ই যে কারো কথা বুঝতে পারে না—মুশকিল তো সেখানেই।

[৮]

বিমানের ভাঙাচোরা অংশটা দেখে টারগাস এবং থোর দুজনেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। টার্জন খোঁজ করছিল পাইলটের। কোন মৃতদেহ না পেয়ে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আশেপাশে ঘাসের চাবড়ার ওপর দু-রকমের পায়ের ছাপ ছিল—ভারী বুটের আর হালকা স্যাণ্ডেলের। বুটের ছাপ নিশ্চয়ই গ্রিডলের। বড় রকমের কোন আঘাত যে পায়নি তার প্রমাণ পরিষ্কার পায়ের ছাপ। কিন্তু অন্য ছাপটা কার? হয়ত কোন মেয়ের অথবা আদিবাসী কোন কিশোরের।

পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, দুজনে একসাথে এখানে এসেছিল এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর যে-পথে এসেছিল আবার সে-পথেই ফিরে গেছে। গ্রিডলে হয়ত প্যারাস্যুটে করেই নেমে এসেছে। কিন্তু সাথীটিকে কিভাবে জোটালো বোঝা যাচ্ছে না।

টার্জনের মতই উদগ্র কৌতূহলে ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করছিল থোর। টার্জনের কাছে টারগাস শুধু নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে একবার জানতে চেয়েছিল, 'এটা কি জিনিস?'

টার্জন উত্তর দিয়েছিল, 'যেটাকে উড়ে যেতে দেখলাম এটা সেটাই। তখন বলেছিলাম না যে আমার একজন বন্ধু এর ভেতরে আছে। কিছু একটা হয়েছে যাতে করে মাটিতে আছড়ে পড়েছে এটা। অবশ্য আমার বন্ধুর কোন ক্ষতি হয়নি।'

টারগাস বলল, 'এর তো কোন চোখ নেই—ওড়বার সময় পথ দেখে কি করে?'

'এর কোন প্রাণ নেই বলেছি না।'

'আমি একে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে শুনেছি!'

বকবক করা নিরর্থক জেনে ওদের নিয়ে এগিয়ে চলল টার্জন। কিছুদূর যেতেই টেরানোডন-এর একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করল সে। এতক্ষণ পরে দুর্ঘটনার কারণটা পরিষ্কার হল। পাখিটার বিরাট মাথাটা থেঁতলে গিয়েছিল একেবারে। প্রপেলারের খানিকটা অংশ গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল মাথায়।

আরো কিছুদূর যেতে ছত্রাকারে ছড়ানো প্যারাস্যুটটা পড়ে থাকতে দেখল মাটিতে। আর ছিল চারটে হায়না আর দুজন আদিম মানুষের মৃতদেহ।

মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করে জানা গেল, দুটো হায়না আর দুজন লোক রিভলভারের গুলিতেই মারা গেছে। গ্রিডলের সাথে সম্ভবতঃ লড়াই হয়েছিল ওদের। আরো দুজন লোক যে সেই লড়াই-তে যোগ দিয়েছিল, তাদের পায়ের ছাপই সে-কথা বলে। লোকগুলো যে একই গোষ্ঠীর সেটা বুঝতেও কষ্ট হয় না। গ্রিডলের সাথীটির সাথে সব দিক দিয়েই আকাশ-পাতাল পার্থক্য লোকগুলোর। স্যাণ্ডেলের ছাপ দেখেই সেটা বোঝা যায়।

টার্জন আরো বুঝতে পারল, লোকগুলো পালিয়েছে গিরিপথ দিয়ে। লড়াই শেষ হলে গ্রিডলে তার সাথীটিকে নিয়ে প্রথমে গেছে বিমানের ধ্বংসাবশেষের কাছে। পরে আবার ফিরে এসেছে লড়াই-এর স্থানে। তারপর লোকগুলো যে-দিকে পালিয়েছে, দুজনে এগিয়ে গেছে সেদিকেই—তবে ভিন্ন পথে।

থোরও খুঁটিয়ে-নাটিয়ে দেখছিল সব। কিন্তু কোন মন্তব্য করেনি। টার্জন বলল, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আমার বন্ধুর সাথে একজন মেয়ে বা কিশোর ছিল। আর ছিল চারজন আদিম লোক। তোমার কি মনে হয়?'

'আদিম লোকই বটে—একেবারে জংলী। ফেলির লোক ওরা। শেষের জন জোরামের অর্থাৎ আমার দেশেরই মেয়ে।'

'তুমি জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল টার্জন।

'স্যাণ্ডেলের ছাপ দেখে। নিচু জমির দেশের লোকেরা আমাদের মত মজবুত এবং পুরু সোলের স্যাণ্ডেল বানাতে জানে না। তাই সহজেই ক্ষয়ে যায় তাদেরটা। মৃত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ—ওদের স্যাণ্ডেল ফুটো হয়ে গেছে। ওদের সাথীদের সেই একই অবস্থা। মাটির ওপর স্যাণ্ডেলের যে ছাপ পড়েছে সেদিকে তাকালেই তা বুঝতে পারবে। আমাদের মত মাপসই স্যাণ্ডেলও বানাতে জানে না ওরা।'

'মেয়েটি যে তোমার দেশের মেয়ে সেটা জানলে কি করে?'

'স্যাণ্ডেলের ছাপে তিনটে খাঁজকাটা দাগ দেখে। তা ছাড়া, ও যে আমারই বোন। ওর স্যাণ্ডেলের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আমার জানা।'

'কিন্তু তোমার বোন এখানে এসেছিল কেন? তোমার দেশ তো এখান থেকে অনেক দূরে।'

'জংলী লোকগুলো হয়ত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল তাকে। এদ্দুর পালিয়ে

এসেও রেহাই পেল না। তোমার বন্ধু জন্তুগুলোকে মেরে লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের জন্য ধরে নিয়ে গেল ওকে।'

হেসে জবাব দিল টার্জন, 'পায়ের ছাপ তো সে-কথা বলে না। তোমার বোনের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্নই নেই। বরং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নিজের ইচ্ছায়ই সে আমার বন্ধুর সঙ্গ নিয়েছে।'

মাথা চুলকে উত্তর দিল থোর, 'তা-ও বটে। তবে আমার বোন তো বাইরের কারো সাথে মেশবার পাত্রী নয়। বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার।'

'দাঁড়াও, আমার বন্ধুকে আগে খুঁজে বের করি—সব ব্যাপারই খোলসা হয়ে যাবে তখন। দেখবে তোমার বোনের কোন ক্ষতিই হয়নি।'

'আর ক্ষতি যদি হয়, তোমার বন্ধুর কপালে নিশ্চিত মৃত্যু আছে জেনে রেখো।'

এদিকে মুভিরো এবং তার দশজন নিগ্রো যোদ্ধা গোলোকধাঁধাঁর মত বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রিডলেকে পথ দেখাবার জন্যই মুভিরো সাথে গিয়েছিল। অথচ গ্রিডলে হারাবার পর থেকেই তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। কিছুতেই আর ঘাঁটির পথ খুঁজে পেল না।

উন্মত্ত প্রাণীদের আক্রমণের হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিল তারা। বনের খুব গভীরেও যে ঢুকেছিল তা নয়। তবু উন্মুক্ত প্রান্তরটা—যেখানে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল—কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারল না। শেষে ভন হোর্ষ্ট নির্দেশ দিল, যতদূর সম্ভব ফাঁকা জায়গায় থাকতে হবে তাদের। বিমান অবশ্যই পাঠানো হবে তাদের খোঁজে।

ওদিকে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পরও গ্রিডলের মনোপ্লেনখানা ফিরল না দেখে মূল ঘাঁটির সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ডোর্ফ-এর নেতৃত্বে জনা দশেক লোক নতুন করে অভিযানে পাঠানো হল। তাদের কর্তব্য ছিল ত্রিবিধ। টার্জন-এর সন্ধান করা, হারিয়ে যাওয়া নিগ্রো যোদ্ধাদের দলটাকে খুঁজে বের করা এবং গ্রিডলের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া।

আগেকার দলটির মতই তারাও এসে বিশাল প্রান্তরটাতে পড়ল। সারা

মাঠ জুড়ে পড়ে ছিল অতিকায় প্রাণীদের সব কঙ্কাল। মাংসপচা ভাপসা গন্ধে সারাটা মাঠ ভরে ছিল। শেয়ালেরা তখনও জায়গাটা ছেড়ে যায় নি।

ঘাঁটিতে ফিরে তারা জানালো, কারো কোন পাত্তাই নেই। তাদের অভিমত, কেউই আর বেঁচে নেই। যে-সব অতিকায় বাঘ তারা দেখেছে, তাদের কবলে পড়লে কি আর কেউ বেঁচে থাকতে পারে! তবু শেষ চেষ্টা করবার জন্য বাকী দলটাকে নিয়ে 0-220 বিমানখানা আকাশে উঠে গেল।

জংলী লোকগুলো পিট্‌টান দিতেই ছ-ঘরা রিভলভারটা হোলষ্টারে ঢুকিয়ে রাখল গ্রিডলে। উৎসাহের কমতি ছিল না তার। মুচকি হেসে মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'বেশ, এবার কি করতে হবে বলো দিকি।'

মেয়েটিও প্রত্যুত্তরে মুখ খুললো, 'কি ভাষায় যে কথা বল, বুঝিও না ছাই।'

গ্রিডলের অবস্থাও তাই। এই অচেনা জায়গায় মেয়েটিকে তার প্রয়োজন। প্রথমে বন্দুক আর গোলাবারুদ কিছু উদ্ধার করতে হবে। বিমানটা এদিকেই কোথাও পড়েছে। শেষে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে, কি করা যায়। আর মেয়েটির নির্দেশিত পথে যেতে হয় তো ক্ষতি কি! বিমানটি গিরিখাতের উল্টো দিকেই হয়ত পড়েছে, একথা চিন্তা করে সেদিকেই যাত্রা করল সে। মেয়েটিকে বলল, 'চলে এসো।'

'না-না, ওদিকে নয়—এদিকে।' গ্রিডলের হাত ধরে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যে চাইল মেয়েটি।

বুঝবে না জেনেও অনেক কিছু বোঝাল গ্রিডলে। ফুলের মত নরম হাতখানাকে ধরে নিজের দিকে আকৃষ্ট করল সে। এবারেও তার মুচকি হাসিরই জয় হল। মেয়েটি নির্দ্বিধায় এগিয়ে চলল তার সাথে।

আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল বিমানখানা। আগুন ধরেনি—আবার একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণও হয়ে যায়নি। অবশ্য এমনভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল যে সারাবার কোনও উপায় ছিল না। হাতিয়ারগুলো সব অক্ষত অবস্থায়ই পাওয়া গিয়েছিল।

চপল বালিকার মত নেচে নেচে ভাঙা বিমানখানাকে দেখতে লাগল জানা। ঔৎসুক্য ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল তার। এই একটি লোকই ছিল যার কাছে সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব মিলত। জানার ইচ্ছেও হয়েছিল, প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করে দেয় গ্রিডলেকে। কিন্তু কি লাভ? বুঝতে তো সে পারবে না

কিছুই। মুহূর্তে সে রাগ করে বসল। আবার পরের মুহূর্তেই কন্দর্পজয়ী পুরুষটির একটু হাসিতেই সমস্ত অভিমান গলে জল হয়ে গেল।

গ্রিডলে বলল, 'ওগো আমার মন-মজানো অপ্সরা, কোথায় যাবে চল—তোমাকে নিয়ে স্বর্গেও যেতে পারি, আবার নরকেও নামতে পারি।'

জঙ্গলে ঘোরার চেয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা অনেক ভাল। 0-220 বিমানখানা নিশ্চই তার খোঁজে আসবে। পাহাড়ের পথে গেলে ওটাকে সহজে দেখতেও পাওয়া যাবে। তিন-চারদিনে যতটা পথ পাড়ি দেবে গ্রিডলে, বিমানটা হয়ত কয়েক ঘণ্টায়ই ততটা পথ অতিক্রম করবে।

মেয়েটি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পর্বতশ্রেণীর ওপারে আমার দেশ জোরাম—সেখানেই চল।'

গ্রিডলেও উত্তর দিল, 'ওহে সুন্দরী, ওহে কন্দরবাসিনী, তোমার আজ্ঞাই কবুল করে নিলাম আমি—চল।'

জানার প্রাণে তখন কবিত্ব ছিল না। এমন অদ্ভুত লোকটির কথা বুঝতে না পারায় আক্ষেপে মরছিল সে। একটা কিছু করতেই হবে তাকে। ভাষাশিক্ষা দিতে হবে লোকটাকে। কখনো কাউকে নিজের ভাষা শেখাবার প্রশ্ন আর ওঠেনি। তাই কিভাবে সম্ভব বুঝতে পারছে না সে।

প্রস্তর যুগের একটি মেয়ের পক্ষে ব্যাপারটা যে কত কঠিন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। শুধু কঠিনই নয়—এতে তার বুদ্ধির পরিচয়ও মেলে। ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে অনেক থিওরীই লেখা যায়। কিন্তু বাষ্প সম্বন্ধে যার কোন ধারণাই নেই, তাকে যদি একটি স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে চালাতে বলা হয়, তার কি অবস্থা হবে? জানার সমস্যাও ছিল অনেকটা সে-রকম।

তবু মোটেই দমল না জানা। জানার একটা সুবিধে ছিল, যাকে শেখাচ্ছে, আদিম মানুষদের মত নিরক্ষর গেঁয়ো ভূত সে নয়। তাছাড়া শিক্ষাদাত্রীর মত শিক্ষাগ্রহীতারও প্রবল উৎসাহ ছিল। কারণ, যুগ পালটাতে পারে, পোশাক-আশাক পালটাতে পারে, কিন্তু মানব প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়। চিরন্তন এই স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক অনুরাগ—সনাতন তাদের রূপের প্রতি মোহ।

তাই জোরামের রূপসী মেয়ে তর্জনী নিজের বুকে ঠেকিয়ে যখন বারবার বলতে লাগল—জানা···জানা···জানা, তখন ক্যালিফোর্নিয়ার সুদর্শন যুবকও চটুল চাহনির জবাবে নিজেকে দেখিয়ে বলল—গ্রিডলে···গ্রিডলে···গ্রিডলে।

এভাবে শুরু হল কষ্টসাধ্য শিক্ষাদানের পালা। গ্রিডলে সব কথা ওর মনের মত করে উচ্চারণ করতে না পারলে, হেসে কুটিপাটি হত মেয়েটি। গ্রিডলেও কৌতুক অনুভব করত কম নয়।

আরো অনেক রোমাঞ্চকর অভিযানে অংশ নিয়েছে গ্রিডলে। কিন্তু এমন মনোরম সফর তার এই প্রথম। খুবসুরত মহিলাও তার জীবনে অনেক এসেছে। কিন্তু তাদের সেই চটকদার ঘষা-মাজা রূপ জানার রূপের কাছে নিষ্প্রভ। এমন কষিত কাঞ্চনের মত বর্ণ, এমন অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গি, এমন ক্ষীণ কটিদেশ, এমন পার্বত্য নদীর মত চঞ্চল যৌবন আর কোথায় পাওয়া যাবে! প্রকৃতি যেন নিজের হাতে একে কঠিনে কোমলে মিশিয়ে তৈরী করেছে। যদি মনে হয় এর দাঁত গুলোই সবচেয়ে সুন্দর, পরক্ষণেই মনে হয় এমন নাক বুঝি আর কারো হয় না। কোন নির্দিষ্ট অঙ্গকে বেশী সুন্দর বলতে গিয়ে দেখা যায়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবই একই পর্যায়ে পড়ে। আদিম বর্বরতা যেন ঘাঘরা আর কাঁচুলি পরে থমকে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির মধ্যে। যেন এক খণ্ড সুন্দর কবিতা সে। সারাক্ষণ দেখেও বুঝি আশ মেটে না।

সব কাজই করে জানা। অমসৃণ পাথরের ছুরি দিয়ে শিকার করা পশুর ছাল ছাড়ায়। পাথরে পাথরে ঘষে আদিম পন্থায় আগুন জেলে দেয়। খণ্ড খণ্ড করে কাটা মাংস আগুনে ঝলসাতে থাকে। চঞ্চল হরিণীর মত ক্ষিপ্রপদে পাহাড়ে পাহাড়ে পাখির ডিমের খোঁজ করে। আঁজলা ভরে শীতল জল পান করে। নিষ্পাপ ঈভেরই মত বিবসনা হয়ে স্নান সারে। শিশুর সারল্য নিয়ে ঘুম যায় ঘাসের বিছানায়।—এর সাথে কথা বলতে পারলে না জানি আরো কত ভাল লাগত। বিপরীত একটা চিন্তাও যে মনে না আসে তা নয়। যদি বাস্তবের কশাঘাতে কল্পনার সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়!

এভাবে সময় কেটে যায়। তারা পালাক্রমে জেগে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী ভয় থিপ্‌ডারের। দূর থেকে থিপ্‌ডারের ক্ষীণতম আওয়াজ ভেসে এলেও জানা টের পায়। এমনই তার প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা।

কতটা পথ যাওয়া হল বা কতটা সময় কেটে গেল, বোঝবার কোন উপায় নেই। তবে এই আদিম ভাষা কিছুটা রপ্ত করে এনেছে গ্রিডলে। এখন সে ছোট ছোট বাক্য বলতে পারে। অশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে জানা।

পেল্যুসিডারে সময় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সেখানকার লোকেরা সময়ের দাস নয়। যেখানে সময় নেই সেখানে ভবিষ্যৎ বলতেও কিছু নেই। সবাই বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত। যা ঘটেছে—ঘটছে। এজন্য কাউকে ভেবে মরতে হয় না। ভবিষ্যতের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার তোলা থাকে না। মানুষ নিজের বা অপরের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে না। অনিবার্য পরিণতি হিসেবে গ্রিডলের মধ্যেও সেই পরিণতি হিসেবে গ্রিডলের মধ্যেও সেই পরিবর্তন এসেছে। তার কাছেও সময়ের কোন দাম সেই। সে এখন কর্তব্যবিমুখ।

অবশ্য মনের কোণে সঙ্গীদের কথা উঁকি মেরেছিল দু একবার। জানার দিকে তাকাতেই আবার বিলকুল ভুলে গেছে সব। আধো আধো বোলে মনের কথা জানাকে বলতে পারলেই যেন খুশী সে।

জানা একবার বলে বসল, 'এত ঘন ঘন আমার দিকে তাকাও কেন বলতো?'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে গেল গ্রিডলে। সত্যিই তো, এভাবে তার এতক্ষণ তাকিয়ে থাকা ঠিক হয়নি। দেখার মধ্যেও একটা আর্ট আছে। সে এখন কায়দা-কানুন সবই ভুলে বসে আছে দেখছি। একটা আদিম যুগের মেয়ের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছে সে। মেয়েটি সুন্দর বটে। কিন্তু একথা কি মুখ ফুটে বলা যায় তার কাছে!

আবার প্রশ্ন, 'উত্তর দিচ্ছ না কেন, জ্যাসন?'

'কি আবার বলবো?'

'বলবে—তুমি আমার দিকে অমনভাবে তাকাও কেন। তোমার দৃষ্টিটা যেন কেমন কেমন। কি আছে সে দৃষ্টিতে?'

হতভম্ব হয়ে গেল গ্রিডলে। কথার অর্থটা একেবারে স্বচ্ছ। একমাত্র নপুংসকেরাই কথাটার ভুল অর্থ করতে পারত। কিন্তু গ্রিডলে পুরুষ—নপুংসক নয়।

সে কি তবে মেয়েটিকে পেতে চেয়েছিল? প্রস্তর যুগের এই মেয়ে, যে এখনও দুহাতে মাংসখণ্ড চেপে ধরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খায়, বনের পশুর মত নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও যার সংকোচ নেই, তাকে কি সে ভালবেসে ফেলেছে? অনভিজ্ঞ বর্বর মেয়েটি কি তার মনের অভিপ্রায়ও ধরে ফেলেছে? হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতার কৃত্রিমতা এরূপ চিন্তার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্করভাবে রুখে দাঁড়াল। ঔচিত্য-অনৌচিত্যের দ্বন্দ্ব শুরু হল তার মনের মধ্যে।

কাষ্ঠ হাসি হেসে উত্তর দেবার দায় এড়িয়ে যেতে চাইল জ্যাসন গ্রিডলে।

তীব্র সার্চলাইটের মত জানার চোখ দুটো তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে সত্যিকার খবর টেনে আনতে চাইল। প্রস্তর যুগের অনভিজ্ঞ বর্বর মেয়ে সে হতে পারে, কিন্তু নির্বোধ সে নয়। সে হচ্ছে মেয়ে, আর তাই পুরুষের চাহনি আর দৃষ্টির পার্থক্য সে বোঝে। আর কোন উচ্চবাচ্য না করে জানা সরে দাঁড়াল এবং পাথরের বিরাট বিরাট চাঁই-এর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল।

হুঁশ হতেই কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল গ্রিডলে, 'জানা···লক্ষ্মীটি···ফিরে এস। আর কখনো এমন হবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূকুটি করে জানা জবাব দিল, 'কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না, পশু কোথাকার। তুমি তোমার পথ ধরো, জানা নিজের পথ ভালই চেনে।'

[৯]

যেদিকে চোখ যায় শুধু পর্বত আর পর্বত। উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো অসংখ্য পর্বত। থিপ্‌ডারের রাজ্যও বটে। কিন্তু টার্জন এবং তার সঙ্গীদের এখন থিপ্‌ডারের ভয় নয়। ভয় এখন মেঘের। ঘন কৃষ্ণবর্ণ ক্রুদ্ধ মেঘে পর্বত ছেয়ে গেছে। টার্জনের মনেও শঙ্কার ছায়া পড়ে, যদিও বিপদের প্রকৃতি সম্বন্ধে ততটা অবহিত নয় সে।

পেল্যুসিডারের এটা আরেক রূপ। আঁধারে ঢাকা পেল্যুসিডার এই প্রথম দেখতে পেল টার্জন। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল শন্‌শন্ শব্দে। পশুগুলি নেমে আসছিল পাহাড়ের ঢালু বেয়ে। সব রকম প্রাণীই ছিল তাতে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসন্ন হওয়াতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ভুলে পাশাপাশি ছুটে চলেছিল তারা। মানুষ তিনটি যে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখেও গ্রাহ্য করল না তারা। টার্জন প্রশ্ন করল, 'জন্তুগুলো আমাদের কিছু বলছে না কেন, থোর?'

'কারণ, তারা এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত।'

'বিপদের ভয় এতই বেশী?'

'উঁচু জমিতে থাকলে অবশ্য ততটা ভয় নেই। বৃষ্টি নামার সাথে সাথে গিরি-পথ, গিরিখাত কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলেও আমরা যেখানে আছি সে-জায়গা জলের ওপরেই জেগে থাকবে। কিন্তু এখানে থাকলে ঠাণ্ডা বাতাসে জমে যেতে হবে। এখানকার আর একটা বড় বিপদ আগুনের হল্কা। মেঘ থেকে এক-একটা আগুনের হল্কা নেমে আসবে, আর তার শব্দে কান ফেটে যাবার যোগাড় হবে।

গায়ে যদি লাগে তো চোখের নিমেষে জান খতম। এই আগুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ভুল করেও গাছের তলায় যেও না যেন। তাহলে আরো বেশী বিপদে পড়বে।'

ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হওয়ামাত্র টার্জন শুকনো কাঠ কুটো জড়ো করে এক জায়গায় রাখল। থোর এবং টারগাসও সাহায্য করল তাকে। আগুন পোহানোর ফলে শীত কিছুটা কমলো বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ তাদের কপালে এ-সৌভাগ্য স্থায়ী হল না। ঝেড়ে বৃষ্টি নামতেই আগুন নিভে গেল, আর ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল সামান্য ছাইটুকু পর্যন্ত।

বাইরের পৃথিবীর মত বৃষ্টিধারা এখানে প্রথমে ঝিরিঝিরি, তারপর ফোঁটা ফোঁটা এবং শেষে মুষলধারে নামে না। আরম্ভ হয় যেমন প্রচণ্ডবেগে, আবার থেমেও যায় তেমনি হঠাৎ। বৃষ্টির মাঝে চোখ দুটি খুলে রাখতে পারলে অনেক অভূতপূর্ব দৃশ্যই দেখা যায়।

দেখা যায়, সূর্যের আলো আড়াল করে মেঘের ছায়া এগিয়ে যেতে থাকে। আর সূর্যের মুখ দেখবার জন্য মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে পশু-পক্ষী, নর-বানর আর আর কীট-পতঙ্গ। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যায় তারা, ভুলে যায় পারস্পরিক হিংসা। সেই অপূর্ব সহাবস্থান দেখে মনে হয়, তারা যেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তাদের একমাত্র চেষ্টা থাকে, কাকে ফেলে কে আগে এগিয়ে যাবে। তাদের সেই 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক ত্রাণ তার লাগি তাড়াতাড়ি' নীতির ফলেই বহু নিরীহ প্রাণী পিষ্ট হয়ে মারা পড়ে।

আরো অনেক দৃশ্য দেখা যায়। কোথাও হয়ত একটা অতিকায় টেরানোডন ডানার ব্যবহার মুলতুবী রেখে মাটিতে নেমে আসে। অভ্যাস না থাকলেও পায়ে ভর দিয়েই ছুটতে হয় তাকে। বৃষ্টিতে ভিজে তার নাকানি-চোবানির একশেষ।

তবে পৃথিবীর সভ্য মানুষদের মত এখানকার লোকেরা চরম বিপদেও ইষ্টমন্ত্র জপ করে না, ভাগ্যকে দোষারোপও করে না; আবার বিধাতার আদ্য-শ্রাদ্ধও করে ছাড়ে না। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই তারা অন্যান্য প্রাণীদের মতই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে। প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হোক আর নাই হোক; চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে না। তারা জানে, দুর্যোগ অনন্তকাল স্থায়ী হয় না—মেঘ কেটে গিয়ে আবার সূর্য উঠবেই।

টার্জন না থাকলে থোর কি করত বলা যায় না, তবে টারগাস নিশ্চয়ই

অন্যান্য প্রাণীদের সাথেই ছুটতে থাকত। কেন একাজ করছে, সেটা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করত না। সহজাত প্রেরণাই তাকে এপথে নিয়ে যেত।

সারাক্ষণ বৃষ্টিতে বসে ভিজছে তিনজন। কারো মুখেই কোন রা ছিল না। বৃষ্টি থামতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় টার্জন। কতক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে বুঝতে না পারলেও এটা বেশ পরিষ্কারই উপলব্ধি করল যে, প্রচণ্ড ক্ষুধা পেটের আনাচে-কানাচে উঁকি মারছে।

এগিয়ে যাবার তাড়াহুড়োয় অনেক প্রাণীই মারা গিয়েছিল। আগুন জ্বালাবার সুবিধে না থাকায় এ-যাত্রা তিনজনকেই কাঁচা মাংস খেতে হল। তারপর আবার শুরু হল তাদের যাত্রা।

পাহাড়ে পথে অনেকদূর এগিয়েও জানা বা গ্রিডলে কারোই কোন সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে টার্জন বলল, 'ওরা নিশ্চয়ই অন্য কোন পথ ধরে জোরামে ফিরেছে। তোমার কি মনে হয়?'

'আমারও তাই মনে হয়। চলো, জোরামেই বরং যাওয়া যাক। সেখান থেকে আমার দলের লোকজন নিয়ে জানাকে খোঁজ করা যাবে। এর মধ্যে সে যদি সেখানে পৌঁছে গিয়ে থাকে তো ভালই হবে।' থোর বলল।

অনেক কষ্টে একটা পর্বতের চূড়ায় উঠে এল তারা। যুগ-যুগান্ত ধরে কত প্রাণীর পদচিহ্নই না অঙ্কিত হয়েছে এই পথে। এমন ভয়াবহ উচ্চতা এবং বিপদসঙ্কুল খাড়াই-ও পার হতে হয়েছে যে, পেরোবার পর টার্জনের মনে বিস্ময় জেগেছে, কি করে এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হল।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ডানা ঝাপটানির ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। থোর ভয়ে ভয়ে বলল, 'এবার কি হবে? থিপডার আসছে, অথচ লুকোবার কোন জায়গা নেই এখানে।'

টার্জন উত্তর দিল, 'ভয়ের কি আছে? সংখ্যায় আমরা তিনজন, আর ওটা হচ্ছে একা।'

'তুমি ওর স্বভাব জানো না বলেই একথা বলতে পারছো। থিপডারের সাথে লড়াই করা যে কি শক্ত ব্যাপার আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। পাখিটার মাথায় ঘিলু বলে কিছু নেই। শত আঘাতেও ওকে কাবু করা যায় না। ওর যেন ব্যথা-বেদনা বোধ বলে কিছু নেই। মরার আগে পর্যন্ত মরিয়া হয়ে লড়াই করে। হয়ত আমরা মারতে পারব ওকে, তবু একটা গাছ থাকলে বড় ভাল হত।'

'ওটা যে আমাদেরই আক্রমণ করবে একথা জোর করে বলো কি করে? আমাদের আক্রমণ তো না-ও করতে পারে।'

'উঁহু, ওটা যে এদিকেই আসছে। আমাদের নিশ্চয়ই দেখতে পাবে সে। আর জীবন্ত কিছু দেখলেই আক্রমণ করার বদভ্যাস ওর।'

'অতীতে নিশ্চয়ই থিপডারের সাথে লড়াই করেছ তুমি?'

'তা করেছি।'

'তাহলে এখনই বা ভয় পাচ্ছ কেন?'

'কারণ, এখন আমার সাথে আমার দলবল নেই। ধারেকাছে একটা গাছপালাও নেই। তাছাড়া, ওর সাথে লড়তে গেলে দু-চারজন মারা যাবেই। তাই ভয় পাই।'

টারগাস চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ এসে পড়ল বলে!'

থোর বর্শা হাতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। টার্জন ধনুকে তীর লাগালো। টারগাস পাথরের গদাটা মাথার ওপর ঘোরাতে লাগল বন্‌বন্ শব্দে। ডানায় পত্‌পত্ আওয়াজ তুলে, মুখে হিস্ হিস্ শব্দ করে, বাতাসের বুকে ঝড়ো আবর্ত রচনা করে সরীসৃপটা একেবারে কাছাকাছি এসে গেল। তিনজনে তৈরী হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। অভ্যর্থনা জানালো টার্জন প্রথম। এক ঝাঁক তীর পরপর গিয়ে বিঁধল ওটার বুকে। এমন সাদর সংবর্ধনা লাভ করে পাক খেয়ে রণে ভঙ্গ দেবার অভিনয় করল সে। তারপর প্রচণ্ডবেগে বাজপাখির মত গোত্তা খেয়ে নেমে এল টার্জনকে লক্ষ্য করে। টার্জনের পক্ষে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই রইল না। ধারালো নখরে পেঁচিয়ে ধরে মুহূর্তে টার্জনকে নিয়ে উঠে গেল শূন্যপানে। বাকী লোক দুটো হাঁ করে তাকিয়েই রইল। কোন কিছু করবার উপায় ছিল না, পাছে আঘাত গিয়ে টার্জনের গায়েই লাগে।

উড়ন্ত সরীসৃপটা পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হতেই হতাশায় বলে ফেলল টারগাস, 'টার্জন আর বেঁচে নেই!'

থোরও তার কথা সমর্থন করল। পরের মুহূর্তেই দু-জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। যে-পথে উঠে এসেছিল সে-পথেই নেমে গেল টারগাস আর থোর এগিয়ে চলল নিজের দেশে। দুটি বিজাতীয় মানুষকে বন্ধুত্বের সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল টার্জন। সে চোখের আড়াল হতেই সেই বন্ধন ছিঁড়ে গেল। একে অপরের সাথে মানিয়ে নিতে পারল না।

সারি সারি পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে গেল টেরানোডনটা। টার্জন তার থাবায় আবদ্ধ হয়ে অসহায়ভাবে ঝুলে রইল। নিজেকে মুক্ত করবার কোন চেষ্টাই সে করল না। করে লাভ নেই। শূন্যপথে ওটার সাথে লড়াই করা মানেই নিজের বিপদ স্বেচ্ছায় ডেকে আনা। টার্জন অত নির্বোধ নয়। ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল সে।

কতকগুলো শিকারী পাখি আছে যারা জীবন্ত প্রাণীদের উঁচু থেকে মাটিতে ফেলে দেয়। এভাবে প্রাণীটাকে মেরে ফেলে তবেই তারা তারা মাংস খায়। কথাটা মনে হতেই ভয়ের শিহরণ খেলে গেল টার্জনের মধ্যে। এই ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত হল যে, পেল্যুসিডারের উড়ন্ত প্রাণীরা অন্ততঃ এই জিনিসটা এখনো শেখেনি।

মাইল কুড়ি পাড়ি দিয়ে তার বাসার কাছে পৌঁছল সরীসৃপটা। পাহাড়ের মাথায় তার বাসা। বাসাটার গা ঘেঁষে নেমে গেছে একটা খাড়া গিরিখাত। বাসাটাকে ঘিরে কয়েকবার উড়ে বেড়ালো পাখিটা। বাচ্চাগুলো মাকে দেখেই কোলাহল শুরু করল। আর একটুও যেন তর সইছে না তাদের।

সরীসৃপটার সাথে লড়বার পক্ষে জায়গাটা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। তবু টার্জন প্রস্তুত হল। সাবধানে ছুরিটা খুলে ফেলল খাপ থেকে। ডান হাতে সেটাকে শক্ত করে ধরল। বাঁ হাত দিয়ে আঁশযুক্ত একটা পা জুৎ করে ধরে ছুরিটা বাগিয়ে রাখলো সুযোগের প্রতীক্ষায়।

ধীরে ধীরে নেমে আসছিল টেরানোডনটা। বাচ্চাগুলো অধীর আগ্রহে ছোট ছোট লম্বা চোয়াল মেলে টার্জনকে নাগাল পাবার চেষ্টা করছিল। বলিষ্ঠ হাতের একটিমাত্র নির্ভুল আঘাত, এবং তার ওপরই টার্জনের জীবন নির্ভর করছিল।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করল না টার্জন। মওকা বুঝে তার ছুরিটা আমূল ঢুকিয়ে দিল প্রাণীটার বুকে। কাতর আর্তনাদ করতে করতে ধড়ফড় করে মারা গেল বেচারা। টার্জন পাকা ফলটির মত টুপ করে পাখির বাসায় পড়তেই বাচ্চাগুলোর নিষ্ঠুর ঠোকরানির পালা আরম্ভ হল। বরাত ভাল, বয়সে নিতান্ত ছোট এরা। সংখ্যায়ও মোটে তিনটে। ডাইনে বাঁয়ে ছুরি চালিয়ে বাচ্চাগুলোর কবল থেকে রেহাই পেতে চাইল সে। পায়ের কয়েক জায়গা ছড়ে গেল। বাসাটা ছেড়ে বাইরে আসতেই বাঁচোয়া। বাসাটার সীমাবদ্ধ আবেষ্টনী ছাড়িয়ে টার্জনকে অনুসরণ করবার কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না বাচ্চাগুলোর।

খাড়া গিরিখাতের কিনারে টেরানোডনটার মৃতদেহ পড়েছিল। একটা ধাক্কা দিতেই দেহটার সৎকার হয়ে গেল। কয়েকশো ফিট নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ল মৃতদেহটা।

বাচ্চাগুলো কিচির মিচির শব্দে মাত করে রেখেছিল জায়গাটা। টার্জনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়েও বিশেষ খুসী হল না টার্জন। চারদিকেই পাহাড় নেমে গেছে খাড়াভাবে। নীচে নামবার সামান্যতম আশাও বুঝি নেই। পেটে ভর রেখে ঝুঁকে পড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল সর্বত্র—কোথাও যদি একটু যদি সুবিধে হয়। শেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম হল।

কিন্তু এখানে তো আর বেশীক্ষণ থাকা যাবে না। যেভাবেই হোক নামতেই হবে। টার্জনের তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটিও ছিল মা। এমনও হল, একই জায়গা হয়ত তিনচারবার জরীপ করে বসেছে সে। খতিয়ে দেখেছে কতটা নামলে পা রাখবার জায়গা পাওয়া যাবে। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে একটা জায়গা বাছাই করে নিল সে।

তারপর টেনে খুলে ফেলল দড়িখানা। প্রান্ত দুটো এক হাতে ধরে রেখে দড়িটাকে ছেড়ে দিল খাড়াই বরাবর। কোন ফলই হল না তাতে। অগত্যা শুধু একটা প্রান্ত হাতে ধরে রেখে পুরো দড়িটাকে ছেড়ে দিল। গ্রানাইট পাথরের একটা ধাপের ওপর গিয়ে ঠেকল দড়ির প্রান্তটা। দূরত্ব তিরিশ ফিটের মত হবে। তার পরের খাড়াইটাও প্রায় ও-রকমই হবে মনে হল। কিন্তু তারপর?

আর সময় নষ্ট করার ধৈর্য রইল না টার্জনের। দড়ির মাঝখানটাতে একটা ফাঁস তৈরী করে গ্রানাইট পাথরের একটা চূড়ায় গলিয়ে দিল সে। তারপর প্রান্ত দুটি একহাতে শক্ত করে ধরে পাহাড়ের কিনারা থেকে দেহটাকে নিচে নামিয়ে দিল। বিশ ফিট নেমে পা রাখবার জায়গাও যেমন পেল, তেমনি পেল একটা ফাটল—হাত রাখবার উপযুক্ত। ওপরে দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, নীচে ভয়াবহ খাড়াই।

খুব সাবধানে দড়ির একটা প্রান্ত ধরে আস্তে আস্তে টানতে লাগল টার্জন। যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সে-জায়গাটা বিশেষ নিরাপদ নয়। একটু বেসামাল হলেই আর রক্ষে নেই! গিঁট লাগানো অপর প্রান্তটা পাথরের সূচ্যগ্র চূড়াটায় গিয়ে পৌঁছতেই আবার নামতে শুরু করল টার্জন। অবশেষে এসে দাঁড়াল পাহাড়ের আর একটা চূড়ায়।

আবার মাপজোপ। আবার নতুনভাবে দড়িটাকে আটকে নিয়ে নামতে শুরু করা। শেষে আরও তিরিশ ফুট নেমে আসা। কিন্তু পরের খাড়াইটা যেন অসংখ্য ফাটল এবং চিড় খাওয়া পাথরে সমাকীর্ণ। ওপর থেকে একথা ঘুণাক্ষরেও বোঝা যায় নি। পাহাড় বেয়ে দ্রুত নামবার পক্ষে এমন জায়গাই প্রশস্ত। তাই এখান থেকে তড়িঘড়ি নেমে যেতে লাগল টার্জন।

খানিকটা সমতল জমিতে পা পড়তেই স্বস্তির শ্বাস নিল টার্জন। বাচ্চা থিপ্‌ডারদের দাঁত এবং নখরের আঁচড়ে পা থেকে চুইয়ে রক্ত ঝরছিল। পিঠে যে ক্ষত হয়েছিল তার তুলনায় এটা অবশ্য কিছুই না। যেমন নির্মমভাবে বড় থিপ্‌ডারটা নখরে পেঁচিয়ে ধরেছিল টার্জনকে, তাতে করে গভীর ক্ষত সৃষ্টি না হয়ে পারে না। এতক্ষণে বেদনার অনুভূতি ফিরে এল তার। অথচ ক্ষতস্থানটাকে নাগালও পাচ্ছিল না সে। চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে বীভৎস করে তুলেছিল পিঠটা।

থোর এবং টারগাস এখন কোথায় কে জানে! তাদের সাথে মিলতে হলে মাইলের পর মাইল এই দুর্ভেদ্য বন্ধুর পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে যেতে হবে। তারা হয়ত আসছিল এদিকেই। টারগাস টার্জনকে নিয়ে যাচ্ছিল তার দলবলের সাথে মেলাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু 0-220 বিমানখানা তো এই পার্বত্য অঞ্চলের ধারেকাছেও নেমে আসে নি। তাদের বিমানটা নেমে এসেছিল জঙ্গলাকীর্ণ সমভূমিতে। যেভাবেই হোক সেই সমভূমিতেই ফিরে যেতে হবে তাকে। নিচে বহুদূরে অস্পষ্ট বনভূমি নজরে আসছিল। সহজতম পথ ধরে সেদিকেই এগিয়ে চলল টার্জন।

বন্ধুর পথ ক্রমেই শেষ হয়ে এল। প্রয়োজনমত দু-একবার অবশ্য দড়ির ব্যবহারও করতে হয়েছিল। সমভূমি আসতেই ক্রমে ঘাস আর আর লতাগুল্মের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তারপর গাছপালা, পরে মহীরুহ এবং শেষে বন-বাদাড়। বনে পৌঁছতেই সুন্দর একটি পথরেখা অসীম সম্ভাবনা নিয়ে নজরে এল। পথটা বনভূমিকে একটা পাক খেয়ে সোজা উঠে গেছে একটা পাহাড় বেয়ে। পাহাড়ের গা ঘেঁষেই একটা গভীর খাদ।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল টার্জন। এগিয়ে চলেছিল নিশ্চিত নির্ভীক নীরব সাবধানী পদক্ষেপে। জঙ্গলে ঢাকা পথের বেশী দূর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। সামনে অপর কয়েকটি পদশব্দের সাড়া পেয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সে। কে বা কারা যেন তার আগে আগে একই পথ ধরে ছুটে যাচ্ছিল।

বাতাসের গতির কোন স্থিরতা ছিল না। খাদ থেকে ঘূর্ণিবায়ু এলোমেলো ছুটে যাচ্ছিল। ফলে বাতাস বাহিত হয়ে প্রাণীটার দেহ নিঃসৃত গন্ধ যেমন টার্জনের কাছে আসছিল, তেমনি টার্জনের গন্ধও গিয়ে পৌঁচচ্ছিল তার কাছে। টার্জন টের পেয়েছিল, প্রাণীটা বা প্রাণীগুলি আর যাই হোক, মানুষ নিশ্চয়ই নয়।

পথটা ছিল সংকীর্ণ। তার ওপর অনেক চড়াই-উৎরাই ভেঙে ঢেউ খেলানো অবস্থায় চলে গিয়েছিল সেটা। এমন বিশ্রী জায়গায় কোন বন্য প্রাণীর কবলে পড়লে ভোগান্তির একশেষ হবে। বিপদ যা-ই থাক, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাটা টার্জনের কোষ্ঠীতে লেখা নেই। সামনের প্রাণীটা মানুষই হোক আর অন্য কোন হিংস্র জন্তুই হোক, টার্জন এই পথ ধরেই এগিয়ে যাবে। টার্জনের মত নিঃশব্দে অথচ নক্ষত্রবেগে ছুটে যাবার কলাকৌশল আর কারো জানা আছে কিনা সন্দেহ। যাকে সে অনুসরণ করে সে জানতেই পারবে না যে, ছায়ার মত কেউ তার পিছু নিয়েছে।

বিকট একটা চিৎকার শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল টার্জন। জন্তুটা হয়ত কাউকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। টার্জন আন্দাজই শুধু করল, জন্তুটার স্বরূপ বুঝতে পারল না তখনও। কোনক্রমে আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল, প্রায় একশো ফিট দূরে পথটা গিয়ে মিশেছে একটা প্রকাণ্ড গিরিগুহায়। ছিমছাম চেহারায় এক আদিমবাসী বালক গুহার মুখে দাঁড়িয়ে। আর কুশ্রী বিরাট একটা পাহাড়ে ভাল্লুক তার দিকেই ছুটে যাচ্ছে।

টার্জনকে দেখে আশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বালকটির মুখমণ্ডল। কিন্তু বেশীক্ষণ সেটা স্থায়ী হল না। সে মনে করে বসল, টার্জন বুঝি তার প্রতি কণামাত্র অনুগ্রহও দেখাবে না। কারণ, এখানকার জঙ্গুলে আইন অনুযায়ী এক গোষ্ঠীর লোকেরা অন্য গোষ্ঠীর লোককে বিপদে আপদে মোটেই সাহায্য করে না।

মৃত্যুর করাল গ্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ছেলেটি সাহস বজায় রাখলো। বিন্দুমাত্র কাতরানিও শোনা গেল না তার মুখ থেকে। বরঞ্চ পাথরের ছুরি আর বর্শা বাগিয়ে ধরে প্রস্তুত হয়ে রইল সে। তার দুর্ভাগ্য, অজান্তেই সে ভাল্লুকটির গুহায় এসে হাজির হয়েছে। নিজের গুহায় বিধর্মী জীব দেখে ভাল্লুকটির মেজাজও সপ্তমে চড়ে গেছে। ছেলেটির ত্রিশঙ্কু অবস্থা—লড়তে হবে, নয় মরতে হবে।

অনেক কটু অভিজ্ঞতা থেকে টার্জন বুঝতে পেরেছে, এ-জাতীয় ভাল্লুকের সাথে

কলহ বাঁধানোর অর্থ নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা। অজানা অচেনা জাতির এই ছেলেটিকে রক্ষা না করলেও কারো কাছে তাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। টার্জনের ওপর ছেলেটির কোন দাবিও থাকতে পারে না। তবু বিবেকের নির্দেশে নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করেও সে অপরের জীবন রক্ষা করতে শিখেছে। স্বভাবতঃই ভাল্লুকটির বেয়াদবি তার কাছে মাপ করার অযোগ্য বলে মনে হল। তীর-ধনুক নিয়ে বহু পূর্বেই সে তৈরী হয়ে ছিল। বাঁ হাতের তালুতে দড়িটা গুটানো অবস্থায় ঝুলছিল। ডান হাতে বর্শা, ধনুক আর তিনটি তীর অপেক্ষা করছিল।

শক্তিতে এই ভাল্লুকের সাথে পারা যাবে না। কৌশলে একে কাবু করতে হবে। অন্ততঃ একে ভিন্ন পথে ফেরাতে পারলে ছেলেটি পালাবার সুযোগ পাবে। আর কালক্ষেপ না করে ধনুকে টঙ্কার দিয়ে একটা তীর ছেড়ে দিল টার্জন। তীরটা গিয়ে বিঁধল পিঠে শিরদাঁড়ার পাশে। মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল ভাল্লুকটা। আর কেউ হলে অমন হিংস্র কদাকার চেহারা দেখেই ভিরমি খেয়ে পড়ত। টার্জন সে ধাতের লোক নয়। আগুনের ভাঁটার মত ভয়ঙ্কর চোখ দুটোকে লক্ষ্য করে আরো তিনটে তীর ছুঁড়ল সে। সেগুলো গিয়ে বিঁধল বুকে।

জখম হওয়াতে রাগে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল ভাল্লুকটা। এবার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে টার্জন বর্শাটা ছুঁড়ে মারল। ফল কি হল দেখবার অপেক্ষা না রেখে উল্টোপথে ফিরে চলল সে। কর্ণভেদী আর্তনাদ তুলে ভারী দ্রুত পদক্ষেপে হিংস্র জন্তুটাও তার সঙ্গ নিল।

পথ যতই সংকীর্ণ হোক, যতই বন্ধুর হোক, টার্জনের গতি রোধ করবার ক্ষমতা তার নেই। ভাল্লুকটাও যত জোরেই ছুটুক টার্জনকে ধরবার সাধ্যি তার নেই। অন্ধ অনুরাগীরা নাকি টার্জনের গতি সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করত। তারা নাকি একথাও বলতে ছাড়েনি যে, টার্জন অপেক্ষাও দ্রুতগামী যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ।

জোড়ের অপর ভাল্লুকটি ইতিমধ্যে এসে হাজির হলে বিষম বিপদ। কিন্তু সেটা হচ্ছে দূরের সম্ভাবনা। আপাততঃ এই দৌড় প্রতিযোগিতার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। এতগুলি আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও যে-রকম অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছিল প্রাণীটা, তাতে তার অফুরন্ত জীবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিষ্ঠুর নিয়তি যেন যমরাজের কাছ থেকে মৃত্যুর পরোয়ানা

নিয়ে টার্জনের পেছনে ধাওয়া করছিল। এই বিষম ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার, এবং দরকার অবিলম্বেই।

টার্জনের একহাতে দড়ির গুটানো অংশ এবং অপর হাতে ফাঁসটা ধরা ছিল। পথের একপাশে পাহাড়টার একটা অংশ খাড়া বিশ ফিটের মত উঠে গিয়েছিল। দড়িটা ছুঁড়ে দিতেই ছুঁচলো একটা পাথরের চাঁই-এর চারদিকে আটকে গেল ফাঁসটা। একবার টেনে দেখে নিল ফাঁসটা ঠিকমত আটকেছে কিনা। তারপর তিলমাত্র বিলম্ব না করে কাঠবিড়ালীর মত অনায়াস চেষ্টায় তড়তড়িয়ে উঠে গেল বেশ খানিকটা। ভাল্লুকটা ততক্ষণে ঠিক নিচে এসে গেছে।

নিরালম্ব হয়ে ঝুলতে ঝুলতে কটাস্ করে একটা শব্দ হতেই ওপর পানে তাকালো টার্জন। চোখ দুটো তার ভয়ে ছানাবড়া হল। কালঘাম ছুটলো দেহ দিয়ে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হবার জন্য।

[১০]

জানা যে রেগে গিয়েছিল তা বোঝবার জন্য শার্লক হোম্স্-এর মত তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেন রেগে গেল সে? জ্যাসন গ্রিডলের মগজে কিছুতেই এর উত্তর জোগাল না। জানার প্রতি তার অনুরাগ দেখানোটাই কি দোষের? না-কি আরো একান্তভাবে গ্রিডলেকে কাছে পেতে চেয়েছিল জানা? নিজের মনগড়া স্ত্রী-মনস্তত্ত্ব দিয়ে সে বিচার করেছিল জোরামের রূপসী মেয়েকে। রূপের গর্ব জানার ছিল কি-না কে জানে। না থাকলেও নিজের রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত সে। জোরামের প্রতিটি পুরুষ তাকে জীবন সাথী হিসেবে পেয়ে ধন্য হতে চেয়েছিল সে। অথচ কারো কাছে ধরা দেয়নি সে। হয়তো নিজের মনোমত সাথী খুঁজে পায়নি। হয়তো তাদের কাউকে সে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেনি। প্রথম প্রথম তারা রূপের জলুসে মুগ্ধ হলেও আজীবন কেউ তার কদর করবে কি-না এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হয়তো দানা বেঁধে উঠেছিল তার মনে। তাই ক্ষেপা যেভাবে পরশ পাথর খুঁজে ফেরে সেভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার মনের মানুষকে। সম্মানের জীবন সে চায়। আর চায় অবাধ স্বাধীনতা। তার জিজ্ঞাসু মনের খোরাক যোগাতে পারে এমন মানুষ সে চায়। তবে কেন গ্রিডলের ওপর বিমুখ হল সে? সে যা চায় তার কিছুরই তো কমতি নেই গ্রিডলের মধ্যে।

বহু আগের সব ঘটনা মনে পড়ল গ্রিডলের। যখনই কোন মেয়ের সাথে মতের অমিল হত, তখনই সে তাকে এড়িয়ে চলত। খোশামোদের ধার সে ধারত না—তাতে তার পৌরুষের হানি হত। অবশ্য মেয়েটির সাথে একদম ছাড়াছাড়ি না হয় সেদিকেও নজর রাখত খুব। সুফল ফলতেও বিলম্ব হত না। নিজের ভুল বুঝতে পারামাত্র মেয়েটি এসে আত্মসমর্পণ করত গ্রিডলের কাছে।

সে-ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি এখানেও হবে না? নিশ্চয়ই হবে। জানাকে তার ভুল শোধরাবার অবকাশ দিতে হবে। বিপদসঙ্কুল পথে তাকে একা যেতে দেওয়াও ঠিক হবে না। দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করলেই হবে। তা না হয় হল। কিন্তু একটা কথা যে অনবরত তার সম্ভ্রমে কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে। জানা তাকে পশু বলেছে। এত বড় অসম্মান কি কি নির্বিচারে হজম করে যাবে সে? জানাকে এর জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে।

গ্রিডলেকে আসতে দেখে জানা ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত রুখে দাঁড়াল। পাথরের ছুরিটা এক টানে খাপ থেকে বের করেই চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাকে না বলেছি তোমার পথ ধরতে। যাও, তোমার মুখ যেন দেখতে না হয় আমাকে।'

শান্তভাবে জবাব দিল গ্রিডলে, 'তোমাকে আমি একা যেতে দেব না জানা।'

'আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার মত লোকের কাছ থেকে জানা কোন সাহায্য চায় না, বুঝলে?'

'কেন অযথা রাগ করছ? এতকাল আমরা একসঙ্গে কাটালাম। কি মজার দিনগুলিই না কেটে গেল। আমি তোমাকে আমার প্রাণের চেয়েও—।'

কথা শেষ করবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল জানা, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাকে তুমি ভালবাস আর নাই বাস, আর ভারি বয়েই গেল। আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি···বুঝলে, ঘৃণা করি। তোমার মুখে এক কথা, আর কাজে আরেক কথা। তোমার ঠোঁট, তোমার চোখ, তোমার হৃদয় সবই মিথ্যে কথা বলে। তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না, যাও।'

'অধীর হয়ো না—আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর, জানা।'

'আমার আর বোঝার কিছু বাকী নেই। তুমি বুঝে রাখ, এগিয়েছ কি আমার ছুরির আঘাতে মারা পড়বে।'

'আমাকে মারলেই যদি তোমার রাগ ঠাণ্ডা হয়, তবে তাই কর।'

আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকে গ্রিডলে। রাগে জানার চোখ

থেকে আগুন ঠিকরে পড়ে। হাতে-ধরা পাথরের ছুরিটা শূন্যে ঝিলিক মেরে ওঠে। বুক চিতিয়ে তবু এগিয়ে যায় গ্রিডলে।

সহসা জানা ছুরি ব্যবহার না করেই ছুটে যায় পাহাড়ের কিনারা দিয়ে। গ্রিডলে তাকে থামতে বলে। তারপর ভারী অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই গ্রিডলের শরীরটাও তাকে অনুসরণ করে। একদিকে চঞ্চল ক্ষিপ্র পদক্ষেপ, অপরদিকে আয়াসসাধ্য মন্থর গতি। ক্রমে উভয়ের মাঝে দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে।

জানার আঁতে ঘা লাগতে পারে, সূক্ষ্ম সম্ভ্রমবোধ আহত হতে পারে, কিন্তু প্রেমভাব একদম উবে যায়নি। তারই ফলশ্রুতি, গ্রিডলের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত না কেটে তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া। গ্রিডলের কাছেও এখন অতীত বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে গেছে। সঙ্গীদের কথা বিস্মৃত হয়েছে সে। বিস্মৃত হয়েছে সমস্ত কর্তব্যবোধ। তার কাছে এখন মেয়েটিই সব। তাকে বন্য শ্বাপদের হাত থেকে রক্ষা করাই তার একমাত্র চিন্তা।

ক্ষুদে বর্বর মেয়েটির প্রতিটি আচরণ বিস্ময়াবহ। প্রথমে গ্রিডলের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, তারপর অকারণ বিরাগ, ছুরি তুলে মারবার দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য, শেষে পলায়ন। বন্য পরিবেশে মানুষ হওয়ায় আচার-আচরণে কাঠিন্যের ভাব যতই থাক্ না কেন, মেয়েলিসুলভ কোমল বৃত্তিগুলি একেবারে শুকিয়ে যায় নি। ছুটতে ছুটতে এসব কথাই চিন্তা করতে লাগল গ্রিডলে।

এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নিচু পাহাড়িয়া এলাকায় জানা ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছিল। জ্যাসন প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও দৌড়ে এঁটে উঠছিল না তার সাথে। তবু নাছোড়বান্দার মত লেগে রইল সে—পাছে জানা বিপদে পড়ে, পাছে কোন হিংস্র জন্তু আকস্মিকভাবে তাকে আক্রমণ করে বসে। জ্যাসন চিরকালই আশাবাদী। এখনো সে আশা রাখে, জানা ফিরে আসবেই। মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হলে গ্রিডলের প্রতি নবীন অনুরাগে ভরে উঠবে তার অন্তর।

থামবার কোন চিহ্নই দেখা গেল না জোরামের রূপসী মেয়েটির মধ্যে। আগের তুলনায় গতি অবশ্য মন্থর হয়ে এসেছে তার। গ্রিডলে এদিকে ক্লান্তির চরম সীমায় এসে পড়েছে। শরীর তার নড়তে চাইছে না। পাহাড়িয়া পথে দৌড়বার অনভ্যাস এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা, দুটোই তার সাথে শত্রুতা করছে। তবু পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবেই। শেষে হাতপা-এর ওপর কোন কর্তৃত্ব রইল না গ্রিডলের। তারা যেন

যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যেতে থাকল। গ্রিডলের মনে হল, দেহের প্রতিটি তন্তু যেন বিশ্রাম নেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আকুলিবিকুলি করছে।

শেষে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা এবং সাগরপ্রমাণ তৃষ্ণা পাগল করে তুলল তাকে। বুঝতে পারল, অনেকটা পথ সে পার হয়েছে, অনেক সময়ও কেটে গেছে। আর তখনই দেখতে পেল, একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জানা।

জানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, কোন্ পথে গেলে সুবিধে হবে। যেদিকে সে যাচ্ছিল, সেটা প্রকাণ্ড একটা গিরিখাতে রুদ্ধ হয়ে আছে। বাঁ দিকের পথটা নেমে গেছে উপত্যকার দিকে—জোরামের বিপরীতমুখী হয়ে। পিছু ফিরলে আবার গ্রিডলের মুখোমুখি হতে হবে। খাড়াই বেয়ে নামা যাবে কি না এই চিন্তায় জানা যখন বিভোর ছিল, তখন গ্রিডলে অনেকটা দূরত্ব কমিয়ে নিতে পেরেছে।

গ্রিডলেকে দেখতে পেয়েই ক্রুদ্ধভাবে ফিরে দাঁড়াল জানা, 'চলে যাও বলছি, নইলে আমি ঝাঁপ দেব কিন্তু।'

'রাগ করো না, জানা। তোমার সাথে যেতে দাও আমাকে। তোমার মনঃপূত না হলে আমি একেবারে মুখে আঙুল দিয়ে থাকব। তুমি যাতে বিপদে না পড়ো, সেজন্যই তোমার সাথে যাওয়া দরকার।'

বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে উঠল জানা, 'বিপদ! বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করবে তুমি! কোথায় কি বিপদ লুকোনো রয়েছে তুমি নিজেই তা জান না। তোমার অগ্নিবর্ষী হাতিয়ারটা না থাকলেই তোমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। তেমন প্রাণীর পাল্লায় পড়লে ওটা ব্যবহার করবার ফুরসতই পাবে না। আর এটা নিয়ে আমাকে রক্ষা করবার বড়াই করো। যাও, তোমাদের দেশে ফিরে যাও। সেখানে তুলতুলে নরম মেয়েদের সাক্ষাত পাবে—যাদের কথা তুমি বলেছ আমাকে। আমার সাথে থেকে কোনই লাভ হবে না তোমার। আমি এখন এমন জায়গা দিয়ে যাব যেখানে একজনের বেশী দুজন পাশাপাশি যেতে পারবে না।'

বিষণ্ণ হাসি খেলে গেল গ্রিডলের অধরে। বলল, 'এতক্ষণে তোমার বিরূপ মনোভাবের কারণ খানিকটা বোধগম্য হল। আকারে-ইঙ্গিতে আমাকে প্রজাপতির সাথে তুলনা করেছ তুমি। বলতে চেয়েছ, ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে বেড়ানোই বুঝি আমার কাজ। তোমার ভয়, মধু নিঃশেষিত হওয়ামাত্র আমিও বুঝি ফুরুৎ করে উড়ে যাব তোমার কাছ থেকে। বেশ তাই হোক,

আমি না হয় প্রজাপতিই হলাম। তুমিও তো জোরামের লাল ফুল। তোমার যৌবন-সুরভির দুর্বার আকর্ষণের মোহ কাটিয়ে ওঠা দায় আমার পক্ষে। তোমাকে ঘিরে যত কাঁটাই থাক, আমি ভয় করব না কিছুতেই। যতক্ষণ না কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কুক্ষিগত হচ্ছি, যতক্ষণ না হাসি-অশ্রু-ভরা এই পার্থিব জীবনে সমাপ্তির পর্দা নেমে আসছে, ততক্ষণ কিছুই আমাকে এই চাওয়া-পাওয়ার হাত থেকে বিরত করতে পারবে না।'

জানা বলল, 'কি বকবক করলে বুঝলাম না কিছুই। তবে আমার সাথে এলে কোন লাভ হবে না বলে দিচ্ছি। কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে, তার চেয়ে বরং ফিরে যাও তোমার দেশে।'

তারপরের কাণ্ডকারখানা দেখে থ বনে গেল গ্রিডলে। সেই ভয়ানক খাড়াই বেয়ে অতি ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগল জানা। যে কোন মুহূর্তে পিছলে যাবার ভয়। হাত-পা রাখবার সামান্য অবকাশও বুঝি নেই। দেখতে দেখতে আতঙ্কে উদ্বেগে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তার কপালে।

একটা কথাও আর উচ্চারণ করতে পারল না গ্রিডলে। একটি শ্বাসও জোরে ফেলতে পারল না। পাছে জানা চমকে ওঠে, পাছে সেই ভয়াবহ উচ্চতা অতিক্রম করে মুহূর্তে হাজির হয় পাহাড়ের পাদদেশে। মনে মনে অবশ্য বলল, 'কী সাংঘাতিক মনের জোর! কি অদ্ভুত নামার কৌশল!'

জোরামের ফুটফুটে মেয়ে একটি বারের তরেও ওপর পানে তাকায় নি। গ্রিডলেও বুঝল, কেন জানা তখন বলেছিল—'এমন জায়গা দিয়ে যাব যেখানে একজনের বেশী দুজন পাশাপাশি যেতে পারবে না।'

গ্রিডলে উঠে দাঁড়াল। তাকেও কিছু একটা করতে হবে এখন। চামড়ার বন্ধনীতে জড়িয়ে রাইফেলটাকে পিঠের মাঝামাঝি ঝুলিয়ে রাখল। ছ-ঘরা রিভলভার সমেত হোলষ্টার দুটোকে ঠেলে পেছন দিক দিয়ে দিল। জুতো জোড়া খুলে ফেলে দিল পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে। তারপর চেষ্টা করল জানারই মত কৌশলে চড়াই বেয়ে নিচে নেমে যেতে। গিরিখাতের ওপারে পাহাড়ের ওপর একজোড়া পলকহীন চোখ সারাক্ষণ তার গতিবিধির দিকে নজর রাখল। সেই চোখ দুটিতে প্রথমে ক্রোধ, তারপর কৌতুক, তারপর বিস্ময় এবং শেষে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং পথশ্রান্তিতে এমনিতেই তার শরীর দুর্বল ছিল। প্রবল সংকল্পের জোরে কিছুটা নেমে এসে এমন জায়গায় পৌঁছল যেখান থেকে

না পারল ডাইনে সরতে, না বাঁয়ে। ওপরে উঠতে পারল না, নিচেও নেমে যাওয়ার সুযোগ রইল না। গ্রানাইট পাথরের অমসৃণ গায়ে হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত হল। তবু বেপরোয়া হয়ে হাতড়াতে লাগল সম্ভাব্য অনুকূল অবস্থান আবিষ্কারের আশায়। চোখ ঘুরিয়ে কিছু দেখবারও সাধ্যি নেই। সামান্য ঝাঁকুনিতে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ভারী অস্ত্রগুলো ফেলে দিলেই ঠিক হত। বিপদের সময় তারা যথেষ্ট কাজে লাগবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ঐগুলোই তো বিপদের আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে। হাত-পায়ের আঙুলগুলো ক্রমেই অবশ হয়ে আসছে। আর কতক্ষণ এভাবে গ্রানাইট পাথর আঁকড়ে থাকা যাবে বলা যায় না।

গ্রিডলে জানত না যে, প্রায় সমভূমির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল সে। আর মাত্র আঠেরো ইঞ্চি নামতে পারলেই সমভূমিতে পা রাখতে পারত। জানত না বলেই মরিয়া হয়ে পাথর আঁকড়ে ধরে ছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তা সম্ভব হল না। হাত ফসকে হুড়মুড় করে নেমে আসার সময় প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। সমতল জমিতে পৌঁছতেই ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। বিপদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে ভেবে সে যখন নিশ্চিন্ত ছিল, তখন গিরিখাতের ওপরে দুটি ভয়ার্ত চোখ আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

গিরিখাতের নিচের অংশে একটা ঝরণা লাফিয়ে এসে পড়ছিল। সেখান থেকে জলধারা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকারে নেচে নেচে নেমে যাচ্ছিল নিচে। ঝরণার ধারে জুতো জোড়া পাওয়া গেল। এখানকার নির্মল সুস্বাদু জলে তৃষ্ণা মেটাল গ্রিডলে। হাত-পা ধুয়ে সযত্নে ক্ষতস্থানগুলি পরিষ্কার করে নিল। তারপর জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে জানার খোঁজে চলল।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা। পেল্যুসিডারে এই প্রথম মেঘ দেখল সে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। বৃষ্টি যে শীগ্‌গিরই আরম্ভ হবে সেটা বুঝতে বিলম্ব হল না। কিন্তু আসন্ন বিপদ যে কতদূর ভয়াবহ হতে পারে সেটা তার কাছে একদম অজানা ছিল।

জানা গ্রিডলের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেও তার মন এই আগতপ্রায় বিপদের মাঝে এই বেপরোয়া লোকটিকে একা ফেলে যেতে চাইল না। তাই সারাক্ষণ নজর রাখল তার ওপর।

ঝড়বৃষ্টি তখন সবে শুরু হয়েছে। কালবিলম্ব না করে জানা যে পথ দিয়ে উঠে এসেছিল, আবার সে-পথ বেয়ে নেমে যেতে লাগল। পাহাড় বেয়ে

একই পথে বারবার কষ্টসাধ্য ওঠানামা তার মনঃপূত না হলেও অনভিজ্ঞ লোকটিকে বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্যই সেটা করতে হচ্ছে তাকে। লোকটিকে নিয়ে যেতে হবে একটা উঁচু জায়গায়, যেখানে থাকলে বিপদ হাত বাড়িয়েও তার নাগাল পাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই প্রকাণ্ড গিরিখাতটা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে। জলের গভীরতা হবে অন্ততঃ দুশো ফিট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র জলধারা শত-সহস্র পথে এই গিরিখাতে এসে পড়বে। জলের কলকল ছল ছল শব্দে মুখরিত হয়ে উঠবে চারদিক। উন্মত্ত জলধারা পাহাড়ের পাথুরে গায়ে দুর্বার বেগে এসে আছড়ে পড়বে। তারপর ফুলে ফুঁসে ফেনিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রচণ্ড আবর্তের সৃষ্টি করবে। ইতিমধ্যে আরম্ভও হয়ে গেছে সে-কাজ। আগে-পিছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা গৈরিক মাটি আর পাথরের নুড়ি নিয়ে সবেগে ছুটে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্র পড়ছে। বাতাস দানবীয় উল্লাসে মেতেছে। প্রচণ্ড বর্ষণে চারিদিক ঝাপসা দেখাচ্ছে। তবুও জানা নেমে চলল। প্রকৃতি রুদ্রমূর্তি ধরে সহস্র হাতে তাকে আলিঙ্গন করতে চায়। কোনদিকেই তার খেয়াল নেই। লোকটিকে বাঁচাবার ক্ষীণ আশা বুকে নিয়ে নিচের দিকে তাকাল একবার। দুরন্ত বেগে জল উঠে আসতে শুরু করেছে। যতদূর দৃষ্টি পড়ে জ্যাসন গ্রিডলের চিহ্ন মাত্র নেই! বহু পূর্বেই হয়ত তলিয়ে গেছে সে।

স্থানুর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানা। বিচ্ছেদ বেদনা মোচড় দিয়ে উঠল হৃদয়ের গভীরে, হু-হু করে কান্না পেল তার। হয়ত বা কেঁদেও ছিল—প্রবল বর্ষণে অশ্রুধারা সব ধুয়ে গেছে। ইচ্ছে হল, ঝাঁপ দিয়ে মনের জ্বালা সব দূর করে কিন্তু তারই আরেকটি সত্তা সেটি হতে দিল না। প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছে সে। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রতিনিয়ত তাকে নানারূপ প্রতিকূলতার মাঝে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পরাস্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করাটা তার অভ্যাসগত নয়। তাই মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে চলল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

জ্যাসন গ্রিডলে আগেও অনেকবার ঝড়বাদল প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু এমনটি দেখে নি আর কখনও। গিরিখাত এবং গিরিগহ্বর বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যেতে দেখেছে। একবার সে ছোট একটি স্রোতস্বিনীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাইলব্যাপী বিরাট নদীতে পরিণত হতে দেখেছিল। স্বভাবতঃই এখানকার ঝড়বৃষ্টির প্রচণ্ডতা তার মনে ভয়ের উদ্রেক করল। আপ্রাণ চেষ্টা করে

ওপরে উঠে যেতেও লাগল। কিন্তু যতটা তাড়াতাড়ি ওঠা দরকার ছিল, ততটা তার সাধ্যে কুলাল না।

একসময় গিরিখাত জলে টইটুম্বুর হয়ে এল। ক্রমে জল এসে তার পায়ের কাছে পৌঁছল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা জলধারা তাকে উঠতে বাধা দিচ্ছিল। পিঠে ঝোলানো রাইফেল প্রভৃতির ভারী বোঝাটাও তার বিরুদ্ধাচরণ করছিল। জল হাঁটুর কাছে পৌঁছতেই পিঠের বোঝা খুলে ভারমুক্ত হল সে। এবার গতিভঙ্গি তার সহজ হয়ে এল। এমন জায়গায় গিয়ে উঠল যেখানে গিরিখাতের জল কোনরকমেই উঠে আসতে পারবে না।

পাহাড়ের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে যখন বিশ্রাম করছিল গ্রিডলে, তখন ঐ পাহাড়েরই আর একদিকে টার্জন, টারগাস আর থোর মূক প্রতিবাদে প্রকৃতির প্রচণ্ড ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছিল। গ্রিডলে অবশ্য তার কিছুই জানত না। সে শুধু ভাবছিল, এই দুর্যোগের হাত থেকে জানা রেহাই পেয়েছে কি-না। মনের মাঝে জানার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলেও নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিল যে তার মত পাহাড়ে চড়ায় দক্ষ মেয়ে নিশ্চয়ই নিরাপদ স্থানেই আছে।

ভিজে কাকের মত বসে বসে সেই অন্ধকার আর ঠাণ্ডার মাঝেই ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল গ্রিডলে। সে এরপর কোথায় যাবে? কোন পথই তো তার চেনা নেই। এই উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে জোরামে কি যেতে পারবে সে? জোরামই বা কোনদিকে? জানার সাথে আর সাক্ষাৎ হয় কি-না কে জানে? এদিকে নিজের দলের সাথে গিয়ে মেশবার আশাও সুদূর পরাহত। তাহলে?

বৃষ্টি থেমে গেল সদ্যস্নাত প্রকৃতির কপালে সূর্যের টিপ ঝলমল করে উঠল। সূর্যের উষ্ণ আলিঙ্গন দেহে মনে চাঙ্গা করে তুলল গ্রিডলেকে। ছাই-চাপা আগুনের মত আশার নবীন অনল ধিকিধিকি জ্বলে উঠল তার অন্তরে।

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দিক্ ঠিক করবার চেষ্টা করল। জানা আগেই জোরামের পথ দেখিয়েছিল তাকে। কিন্তু এই বিভ্রান্তিকর চড়াই-উৎরাই ভেঙে যেতে হলে সব গুলিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তৃষ্ণায় এখন আর ছাতি ফেটে যাচ্ছে না, ক্ষুধার প্রাবল্যও কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবু এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার আগে কিছু খেতেই হবে। কিন্তু খেতে হবে বললেই কি এখানে খাদ্য পাওয়া যায়। একে দুরধিগম্য পার্বত্য পথ, তার ওপর ঝড়ের দাপটে

জীবজগৎ ঝেঁটিয়ে বিদায় হয়েছে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে—পাড়ের একটা ফোকরের মধ্যে দুটো ডিম পাগলা ঝড়বাদলকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কোন জাতের প্রাণীর ডিম কে জানে। পাখি হতে পারে, আবার সরীসৃপ হওয়াও বিচিত্র নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেটা খাদ্য। আর ক্ষুধার সময় খাদ্যের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না গ্রিডলে।

এবার জামাকাপড় শুকিয়ে নেওয়া দরকার। একে একে পোশাকের সব কটা খুলে ফেলে একটা শুকনো গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল। গাছের নিচে নিরাবরণ দেহটাকে শুইয়ে দিতেই রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হল দুই চোখে। আরামপ্রদ রোদের উষ্ণতাও মন্দ লাগছিল না।

পরিপূর্ণ বিশ্রামের পর শরীরটা সতেজ হয়ে উঠলে প্রথমেই খোঁজ পড়ল জামাকাপড়ের। অলসভাবে হাতখানা গাছের ডালে ঠেকাতেই চমকে উঠল সে। কোথায় তার পোশাক! অস্থিরভাবে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোন ফল হল না। জামাটাই শুধু গাছের তলায় পড়েছিল। পোশাক খোয়া গেছে বলে দুঃখ নেই; চুরি করার মত প্রাণী যে এখানেও আছে, এটাই দুঃখজনক।

রিভলভার এবং কার্তুজের বেল্টটা তার কাছেই ছিল। তাই রেহাই পেয়ে গেছে সেগুলো। জামাটা গাছের তলায় না পড়লে সেটাও হয়ত উধাও হয়ে যেত।

পেল্যুসিডারে ঋতুভেদ নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তন এখানে ক্ষণস্থায়ী। সূর্যের উষ্ণতাও এমন যে পোশাক-আশাক এখানে অপরিহার্য নয়—বোঝামাত্র। তবু সভ্য জগতের মানুষ পোশাকের বোঝা চাপিয়ে দেহটাকে ভারাক্রান্ত করতে অভ্যস্ত। তাই পোশাকের অভাবে নিতান্ত অসহায় বোধ করে সে। সমস্ত মান-সম্ভ্রম, প্রভাব প্রতিপত্তি আর কর্মদক্ষতা যেন এই পোশাকের ওপরই নির্ভরশীল।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে এই দারুণ অসহায় বলে বোধ হল গ্রিডলের। প্রবল আত্মপ্রত্যয় যেন এক লহমায় নিঃশেষ হয়ে গেল। একটা ছেঁড়া সার্ট আর কার্তুজের বেল্ট মাত্র সম্বল করে কি করবে এখানে? এখানে সত্যি বলতে গেলে জুতোটাই তার সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল। অন্যান্য পোশাক এখানে বাহুল্যমাত্র। গ্রিডলের কাছে কিন্তু এর উল্টোটাই মনে হল। অবশ্য হতাশার মূল কারণ ছিল জোরামের সুন্দরী মেয়ে। এভাবে নগ্ন অবস্থায় কি করে তার সামনে হাজির হবে?

জোরামের মেয়ে জানার শালীনতা বোধ অবশ্য পোশাকের সাথে জড়িত ছিল না। অনাবৃত দেহেও তার মানসম্ভ্রম বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। কিন্তু উলঙ্গ দেহে জানার সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা ভাবতেই নিজেকে বড়ই উপহাসাস্পদ বলে মনে হতে লাগল গ্রিডলের।

অগত্যা জামাটাকে সে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর বেল্টটাকে কোমরে বেঁধে ফালিগুলো ঝুলিয়ে দিল লজ্জা ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টায়। তারপর কোমরের দুপাশে দুটো পিস্তল ঝুলিয়ে দিগম্বর সেজে এগিয়ে চলল জানার খোঁজে।

কিছুদূর যেতেই বুঝতে পারল, বন্ধুর পথে পা দুটো তার ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। পোশাক না হলেও চলে যাবে, কিন্তু জুতো ছাড়া আর একদম অগ্রসর হওয়া কষ্টকর। সেই মুহূর্তে একটা ছোট সরীসৃপ গুলি করে মারল সে। মৃত প্রাণীটার ছাল দিয়ে একটা অদ্ভুত জুতোও বানিয়ে ফেলল। জুতো জোড়া প্রথম প্রথম অস্বস্তিকর হলেও পরে গা-সহা হয়ে গেল।

ওপরের পৃথিবী হলে তার শরীর ঝলসে যাবার যোগাড় হত হত। এখানকার সূর্য অতটা নির্মম নয় বলে রক্ষে। তবে অবাধ তাপবর্ষণে তার শরীর উজ্জ্বল তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। বলতে গেলে তার পক্ষে এটা মঙ্গলকরই বটে। কারণ, গায়ের রং পালটে যাওয়ায় নগ্নতা অত বেশী প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছে না। অত্যধিক শুভ্রতার দোষ অনেক। কালোকে সে মোটেই লুকিয়ে রাখতে পারে না। নগ্নতাকে সে সহজেই জাহির করে ফেলে। এই কারণেই গ্রিডলেকে সকল উলঙ্গ প্রাণীর মধ্যে বেশী উলঙ্গ বলে মনে হত। গায়ের রং তামাটে হয়ে যাওয়ায় নগ্নতার কিছুটা সুরাহা হল।

সময় বোধ তার ছিল না। বহুবার তাকে খেতে হল। বহুবার ঘুমোতেও হল। কতবার তার হিসেব নেই। যাত্রাপথে হিংস্র অনেক প্রাণীর দ্বারা আক্রান্তও হল। ক্রমে গ্রিডলে বুঝতে পারল, এদের সাথে শক্তির পাঞ্জা না লড়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করাই ভাল। কার্তুজের পরিমাণ সীমিত—ফুরিয়ে গেলে যথার্থ প্রয়োজনের সময় মাথা কুটলেও আর পাওয়া যাবে না।

পাহাড়ের দেশ শেষ হয়ে এল। শস্যশ্যামল প্রান্তর, বৃক্ষময় অরণ্য আর তৃণভুক প্রাণীদের সাক্ষাৎ মিলতে লাগল ক্রমে ক্রমে। পার্বত্য নদীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল।

টার্জন এবং ওয়াজিরি যোদ্ধাদের কাছে বর্শা এবং ধনুর্বাণ বানাতে শিখেছিল সে। এখন সেটা কাজে লাগল তার। কিন্তু এসব দিয়ে খাদ্যের অভাব

না হয় মিটবে, প্রাগৈতিহাসিক আমলের অতিকায় প্রাণীদের তো আর রুখতে পারা যাবে না। অথচ নিজের দলের সাথে নিজের দেশে ফিরে যাবার সমস্ত সম্ভাবনাই তিরোহিত হয়ে গেছে। এই সব দানবীয় চেহারার প্রাণীদের সাথে লড়াই করেই বাঁচতে হবে তাকে।

এখানে মানুষের সাহচর্য পাবার কোন আশা নেই। অথচ আজীবন সে মানব সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভেতর দিয়েই বাঁচবার শিক্ষা পেয়েছে। মানুষের সাক্ষাৎ অবশ্য এখানেও মিলবে। কিন্তু সহযোগিতা তো পাবেই না, তাকে মেরে ফেলতেই উদ্যত হবে তারা। তবু সে মানুষের দেখা পেতে চায়। এজন্য তাকে অপেক্ষাও করতে হল না বিশেষ। উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন যখন বিশ্রাম করছিল সে, তখন আচমকা ধোঁয়ার গন্ধে দেহের অণুতে অণুতে শিহরণ জাগল তার। কারণ, ধোঁয়ার অর্থই আগুনের অস্তিত্ব, আর যেখানে আগুনের অস্তিত্ব সেখানে নিশ্চয়ই মানুষের উপস্থিতি।

একটা গিরিখাত থেকেই ধোঁয়া উঠে আসছিল। চুপি চুপি সেদিকে অগ্রসর হল গ্রিডলে। দেখাল, ছোট একটা নির্ঝরিণীর কিনারে বসে তামাটে রঙের একজন আদিম মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে আগুনে মাংস ঝলসাচ্ছে। লোকটার যোদ্ধার বেশ, গঠন সুন্দর। গ্রিডলের এখন দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ, সহজ কোন পথ ধরে লোকটার কাছে যেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, পৌঁছবার আগেই বুঝিয়ে দিতে হবে—শত্রু হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে তার আগমন। পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপায়িত করতে উদ্যত হতেই সামনের পাহাড়টার চূড়ায় নজর পড়ে গেল তার।

সেই পাহাড়টার দিকে কেন তাকিয়েছিল সেটা আজও গ্রিডলের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। সম্ভাব্য অনেক কারণের কথাই সে ভেবেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা উত্তরই খাড়া করেছে যুক্তিতর্ক দিয়ে—সহজাত প্রবৃত্তি বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরই কাজ এটা। যাই হোক, সেই পাহাড়টার চূড়ায় তাকিয়ে এমন একটি প্রাণী দেখল যাকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যাবার কথা। সেটা ছিল একটা বিরাট ডায়নোসর। ষাট্-সত্তর ফিট লম্বা প্রকাণ্ড একটা সরীসৃপও বলা যায়। মাটিতে দাঁড়ালে উচ্চতা হবে কম করে পঁচিশ ফিট। দেহের তুলনায় মাথাটা দারুণ ছোট—অনেকটা টিকটিকির মত দেখতে। শিরদাঁড়ার দুপাশে শিং-এর মত খাড়া পাতলা চাকৃতি একের পর এক সাজান।

চাকতিগুলো তিন ফিটের মত উঁচু, লম্বায়ও প্রায় ততটা, কিন্তু এক ইঞ্চির বেশী পুরু হবে না। মজবুত লেজটা ইঁদুরের মত সূচ্যগ্র এবং লম্বা। ওপরের অংশে লেজটার আরো দুটো শাখা—প্রতিটি তিন ফিটের মত লম্বা। টিকটিকির মত দেখতে চারপেয়ে জীবটার মাথাটা মাটিতে ঠেকে ঠেকে অবস্থা।

মনে হয়, আদিম লোকটিকে লক্ষ্য করছিল ওই কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীটা। তারপর হঠাৎ পেছনের পা দুটো বুকের তলায় নিয়ে এসে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। এভাবে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার কি দরকার ছিল ভেবে পেল না গ্রিডলে। আসলে প্রাণীটা হাওয়ার ওপর ভর করে নেমে আসছিল। চামড়ার বিরাট পাতগুলি দুপাশে খুলে গিয়ে প্যারাস্যুটের কাজ করছিল।

হঠাৎ বিচিত্র এক গুন্‌গুন্‌ শব্দে চমকে উঠল আদিম লোকটি। বর্শাটা টেনে নিয়ে তাকাল প্রাণীটার দিকে। গ্রিডলেও ততক্ষণে হোলষ্টার থেকে রিভলভার দুটো বের করে ফেলেছে। প্রাণীটা যতই নেমে আসছে, গ্রিডলেও ততই ছুটে চলেছে লোকটিকে বাঁচাতে।

[১১]

টার্জন ভেবেছিল, দড়িটাই বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে। আসলে দড়িটা অক্ষতই ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে দড়িটা এমন এক জায়গায় ছুঁড়ে দিয়েছিল যেখান থেকে হড়কে এসে দড়ির ফাঁসটা গ্রানাইট পাথরের প্রান্তদেশে লেগে রইল। টার্জনের ভার সইতে না পেরে সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ভেঙে গেল, আর সাথে সাথে টার্জন গিয়ে পড়ল ভাল্লুকটির বিরাট পৃষ্ঠদেশে!

এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে বোঝাই গেল না কে বেশী অবাক হল—টার্জন না ভাল্লুক। অবশ্য সংগ্রামই আদিম প্রাণীদের জীবন। সেখানে বিস্মিত হওয়ায় অবকাশ বিশেষ নেই। ঘটনাটা এভাবে ঘটে গেল যেন ইচ্ছে করেই টার্জন এমনটি করছে।

অনেক কষ্টে সুযোগ পাওয়া গেছে এবং পাওয়া গেছে একেবারে অভাবনীয়ভাবে। এই সুযোগ হেলায় হারাতে রাজী নয় টার্জন। ভাল্লুকটি যতই গা ঝাড়া দিক্, সে প্রাণপণে লেগে থাকবে তার পিঠে। অবশ্য বিপদও আছে এতে। পথের একপাশে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। অপর পাশে

অতলস্পর্শী খাড়াই। ফেলে দেবার প্রবল চেষ্টায় ভাল্লুকটা যদি খাতে গিয়ে পড়ে, তবে দুজনের কারোই পাত্তা পাওয়া যাবে না।

এক হাতে গলা জড়িয়ে ধরে অপর হাতে ভাল্লুকটাকে ঘন ঘন ছুরি দিয়ে আঘাত করতে লাগল টার্জন। ক্রুদ্ধ চিৎকার, আর্তনাদ আর দাপাদাপিতে জায়গাটা মাত করে রেখেছিল ভাল্লুকটা। টার্জন কিন্তু নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। খুঁজে খুঁজে সুষুম্না-কাণ্ডের অবস্থান বের করে সজোরে চাকু বসিয়ে দিল টার্জন। আর কিছু করতে হল না। টার্জন লাফিয়ে নেমে পড়ল। ভাল্লুকটা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুর আঁধারে হাওয়া গিরিখাতটায়। তার দেহে রয়ে গেল চারটে তীর, একটা বর্শা, আর অনেকগুলি ছুরির ক্ষতচিহ্ন।

দড়িটাকে গুটিয়ে নিল টার্জন। ধনুকটা আগেই ফেলে দিয়েছিল। সেটা খুঁজতেই এগিয়ে চলল আবার। ছেলেটার কি হাল হল সেটাও অবশ্য দেখা দরকার।

কয়েক পা যেতে না যেতেই ছেলেটার মুখোমুখি হয়ে গেল সে ধনুক ধনুক ছেলেটার হাতেই ছিল। টার্জনকে দেখেই ধনুকটা ছুঁড়ে দিল তার পায়ের কাছে। অজানা লোকটা যাতে আচমকা আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য তুলে ধরল বর্শাটা। অপর হাতে কোমরে গোঁজা পাথরের ছুরিটা ধরে রইল।

টার্জন হেসে বলল, 'ভয় কি—আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তোমাকে মারতে চাই না—বন্ধু হতে চাই।'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'আমার নাম ওভান। তোমার সাথে তো আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। মানলাম, তুমি কাউকে মারতে আসনি। তাহলে নিশ্চয়ই মেয়ে চুরি করতে এসেছ। তাই, তুমি আমাকে রেহাই দিলেও আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না তুমি।'

'টার্জনের কোন মেয়ে-সাথী দরকার হয় না, বুঝলে।'

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এখানে আসবার আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'আমি দলছাড়া হয়ে গেছি—হারিয়ে গেছি। আমার লোকজন এখন কোথায় জানি না। আমি চাই, তোমার দেশের প্রতিটি লোক আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করুক।'

'সেটা তো আর আমার হাত নয়। দলের লোকেরা যা করবে তাই হবে। আচ্ছা, ভাল্লুকটাকে আক্রমণ করলে কেন তুমি?'

'কেন, আক্রমণ করাটা কি অন্যায় হয়েছে ?'

'তা কেন, তবে অন্য গোষ্ঠীর লোক কখনো এমনটি করে না।'

'আমরা করি। আমি ভাল্লুকটাকে আক্রমণ না করলে তুমি মারা পড়তে, তাই নয় কি ?'

'তা পড়তাম। তবে, আমার জন্য তুমি কেন একাজ করলে বুঝতে পারছি না। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। আমার দেশের লোকেরা কেউ একথা বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করলেও তোমাকে তারা এমনি ছেড়ে দেবে না—প্রাণে মারবেই। নিজের দলের লোক ছাড়া সবাইকে আমরা শত্রু বলে মনে করি। আর শত্রুকে বিশ্বাস করা আমাদের ধর্মে সয় না।'

'বুঝলাম। এখন বলতো, তোমার আস্তানা কোথায় ?'

'এই কাছেই।'

'চল, তোমার সাথে যাওয়া যাক। তোমাদের মোড়লের সাথে আলাপ জমানো যাক।'

'তাই চল। কিন্তু বড্ড ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। আমার বাবাই অবশ্য এখানকার মোড়ল। তবু আমি হলফ করে বলতে পারি, তোমার প্রাণদণ্ড হবেই। আর তাই যদি হয়, আমি অবশ্য তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ যে।'

'তা বেশ। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বলে ফেল তো ঐ গুহাটাতে কেন মরতে গিয়েছিলে তুমি। বাইরে থেকে দেখে বোঝা উচিৎ ছিল যে বন্য প্রাণীর আস্তানা ওটা।'

'তুমিও তো ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলে। আমি না হয় ভাল্লুকটার সামনে ছিলাম, আর তুমি ছিলে পেছনে। আমাকে না পেলে তোমাকেই তো প্রথমে আক্রমণ করে বসত ভাল্লুকটা।'

'আমি তো আর সাধ করে যাই নি—পথ ভুল করে গিয়েছিলাম।'

'আমিও তো তাই। আগে যখন শিকারে গেছি তখন বরাবরই আমার দলবল থাকত। একাকী শিকার করা আমার জীবনে এই প্রথম। তুমি না এলে হয়ত বা এই শেষ হত। আমি যে একা শিকার করতে পারি, দলের লোকেদের তাই দেখাতে চেয়েছিলাম। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার দেশের লোকেরা সবাই খুব বীর। তোমার দেশেও কি মোড়ল সর্বময় কর্তা ?'

টার্জন নিজের দেশ সম্বন্ধে বলল। সেখানকার যান্ত্রিক সভ্যতার কথা বলল।

সেখানকার রীতিনীতি, বেশভূষা, নারীপুরুষের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়েও অনেক কথাই বলল। কিন্তু ছেলেটির ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এতসব হৃদয়ঙ্গম করাটা সহজসাধ্য হল না। শুধু বুঝে রাখল, সব দিক দিয়েই টার্জনের দেশ তার দেশের চেয়েও উন্নত। সেখানকার মেয়েরা অনেক বেশী সুন্দরী।

নিজের দেশ সম্বন্ধেও বলতে ছাড়ল না সে। তার বাবা এখানকার রাজা। তার দেশের প্রতিটি লোক সুদক্ষ যোদ্ধা। তাদের দলে পুরুষের সংখ্যাধিক্য থাকায় অপর গোষ্ঠী থেকে তারা মেয়ে সংগ্রহ করে থাকে। জোরামের মেয়েরা সুন্দরী হওয়ায় সেখানকার মেয়েদেরই সাধারণতঃ নিয়ে আসে তারা। জোরামের সাথে তাদের যুদ্ধ লেগেই থাকে। পার্বত্য জাতি হিসেবে কৌলিন্য এবং বংশ-মর্যাদায় জোরামের সমকক্ষ তারা। এই কিছুদিন আগেও বিশজন যোদ্ধা জোরামে গেছে মেয়ে সংগ্রহ করতে। সে যখন বড় হবে তখন নিজের জীবনসাথী যোগাড় করতে সেও জোরামে যাবে।

টার্জন জিজ্ঞেস করল, 'এ-জায়গাটার নাম কি?'

'ক্লোভি।'

'জোরাম এখান থেকে কত দূরে?'

'কেউ বলে বেশী দূরে নয়, আবার কেউ বলে অনেক দূরে। শুনেছি, যাবার সময় ছ-বার খেতে হয়, আর ফেরবার সময় বার দুই।'

'ব্যাপারটা কেমন হল—ফেরবার সময় দূরত্বটা কমে যায় কি করে?'

'ফেরবার সময় জোরামের লোকদের তাড়া খেতে হয় যে।'

মনে মনে বেশ খানিকটা হাসল টার্জন। সময় মাপবার মাপকাঠি এখানে খাওয়া আর ঘুম। ক-বার খেল আর ঘুমালো তাই দিয়েই বোঝা যায়, কতটা সময় কেটে গেল।

ছেলেটির সাথে পথ চলতে চলতে হৃদ্যতা আরও ঘনীভূত হল টার্জনের। শেষে তাদের বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছল যে টার্জন যেন তার কাছে পর নয়, নিতান্ত আপন জন। কোনকালে ছেলেটির যে সন্দেহবাতিক ছিল, তাকে দেখে আর সেটা বোঝবার উপায় নেই। তার ওপর সে যখন থিপ্‌ডারের সাথে টার্জনের লড়াই-এর কাহিনী শুনল, তখন পঞ্চমুখে টার্জনের প্রশংসা না করে পারল না। তার মতে, আর কেউ হলে নিশ্চয়ই থিপ্‌ডারের হাত থেকে জীবন্ত ফিরতে পারত না।

টার্জনের পিঠে পাখির নখরের আঘাতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঝরণার জলে ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে দিয়ে ছেলেটি একপ্রকার বন্য গুল্মের রস প্রয়োগ করল সেখানে। ব্যথার অনুভূতি এতক্ষণ ভুলে ছিল টার্জন। রস প্রয়োগ করামাত্র চতুর্গুণ হয়ে ফিরে এল সেই বেদনাবোধ। অথচ মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বের হল না টার্জনের। তার আচরণে সামান্যতম বেদনার অভিব্যক্তিও প্রকাশ পেল না। ফলে নয়া বন্ধুটির ওপর ছেলেটির শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

প্রদাহ বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হল। কিন্তু তারপরই দ্রুত কমে এল। শেষে একেবারে তিরোহিত হল।

টার্জন পথিমধ্যে অনেকগুলো তীর তৈরী করে নিল। বর্শাও তৈরী করল একটা। ইস্পাতের ধারাল ছুরিটা ছেলেটির আগ্রহ জাগিয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু অন্যান্য হাতিয়ার মোটেই আমল দিল না সে। ভাবল, এসব ছেলে-ভুলানো খেলনা কি কাজে লাগবে? মনের ভ্রম দূর হতে অবশ্য বিলম্ব হল না। একটামাত্র তীরের আঘাতে একটি মেষ ঘায়েল হওয়ার পর থেকে মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটল তার। একে বয়সে কাঁচা, তার ওপর টার্জনের অমায়িক ব্যবহার—ছেলেটি একেবারে টার্জনের পরম অনুগত চেলায় পরিণত হল।

পাহাড়ের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বলে উঠল ছেলেটি, 'আমার আস্তানা এসে গেছে! আমার কেমন ভয় ভয় করছে···তুমি বরং ফিরে যাও। ওরা তোমাকে কোন রকম দয়া দেখাবে বলে মনে হয় না।'

'ভয় নেই, ওরা আমাকে মারবে না। আমি তো বন্ধুভাবে এসেছি ওদের কাছে।'

মুখে একথা বললেও মনে মনে টার্জনের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল, তার কথাই সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে কি-না। কিন্তু এতটা এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা ছাড়া আর কি!

ছেলেটি বলল, 'যা তোমার অভিরুচি···চলে এস।'

যে-পথ ধরে তারা চলেছিল তারই শেষ সীমায় একটা প্রকাণ্ড গুহা। এটাই এদের আস্তানা। আদিম প্রস্তর যুগের মানুষ হলেও পরিচ্ছন্নতার দিকে যথেষ্ট নজর আছে এদের। গুহাগাত্র এবং তার পথটা ঝকঝকে তকতকে। প্রকৃতির হাতে গড়া গুহাটার ওপর এরা আর কোন কারিকুরি করে নি। কোন চিহ্ন, কোন ছবি বা এ-জাতীয় কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই কোথাও।

গুহার কাছে এগুবার আগে মৃদু শিস্ দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানাল ছেলেটি। ভেতর থেকেও অনুরূপ শিসের শব্দ শোনা গেল। পুরুষ, মেয়ে

আর বাচ্চাকাচ্চায় মিলিয়ে একশো জনের মত গুহার বাইরে এসে জমায়েত হল। প্রশস্ত চত্বরটি ক্ষেত্রফলের দিক দিয়ে তিন-চার একরের মত হবে।

প্রত্যেকের পোশাকই অতি সামান্য, তাতে লজ্জা ঢাকে কি ঢাকে না। টার্জনকে সামনে দেখেই একটা তুমুল সোরগোলের সৃষ্টি হল। মেয়েরা ছুটে গেল গুহার দিকে। কোলেকাঁখে করে কচিকাঁচা নিয়ে গেল তারা। কেউ কেউ উদাত্ত আহ্বানে ডাকতে লাগল তার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের। পুরুষেরা বর্শা উঁচিয়ে ধরে একযোগে তাক করল টার্জনকে।

'করো কি! এ-হচ্ছে আমার বন্ধু! একে ভয় করবার কিছু নেই।'

'আমরা একে হত্যা করব।' সমস্বরে ঘোষণা।

'দাঁড়াও। রাজা কই? তার সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

'এই যে আমি···কি ব্যাপার?' খ্যানখ্যানে গলার আওয়াজ।

গুহার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে টার্জন দেখল, বাদামী রঙের দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ প্রায়-নগ্ন এক মূর্তি এগিয়ে আসছে ধীর পদক্ষেপে। সে-ই এদের রাজা।

রাজা বলল, 'এ কেমনতর কাজ তোমার, ওভান! তুমি একজনকে বন্দী করে এনেছ, অথচ তাকে বেঁধেও আননি বা নিরস্ত্রও করোনি।'

'এ তো আমাদের কয়েদী নয়। এ আমাদের বন্ধুত্ব চায়।'

'বন্ধুত্ব চায়! অপরিচিত লোক বন্ধুত্ব চায় আমাদের! নিরীহ গোবেচারা সেজে আস্তানায় ঢুকে আমাদের সর্বনাশ করে পালাবে, এজন্যই বন্ধুত্ব চায়? আমাদের ঘাঁটির সন্ধান জেনে নিজের দলবল নিয়ে হানা দেবে এখানে, এজন্যই বন্ধুত্ব চায়? না-না, তা হতে পারে না। একে মেরে ফেলা উচিৎ ছিল তোমার।'

'এর কোন দলবল নেই। কি করে নিজের দেশে ফিরতে হবে তা-ও জানা নেই এর। তাই একে সন্দেহ করার কোন অর্থ হয় না।'

'বেশ বলেছ। নিজের দেশ চেনে না—না? মিথ্যুক—মিথ্যেবাদী—ডাহা মিছে কথা বলছে ও। এমন লোক আছে, যে নিজের দেশ চেনে না? সরে এস, ওভান। তুমি না পার—দাঁড়িয়ে দেখ—আমি একাই একে কতল করব।'

টার্জনের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটি। চেঁচিয়ে বলল, 'টার্জনকে হত্যা করার আগে আমাকে হত্যা করতে হবে তোমাদের।'

লম্বাটে চেহারার একজন যোদ্ধা বলল, 'ওভান কি বলে শোনাই যাক না। শান্ত সুবোধ বালক হিসেবে ওর যথেষ্ট সুনাম আছে। কখনো আলতু-ফালতু

কথা বলার অভ্যাস নেই ওর। ও যখন বলছে, অজানা লোকটা ওর বন্ধু, আর ওকে হত্যা করাও উচিৎ নয়, তখন নিশ্চয়ই কথাটার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ওকে ওর বক্তব্য বলতে দেওয়া হোক।'

'বেশ, তাই হোক। বল বাবা বল—তোমার কি বলবার আছে বল।' ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রাজা বলে উঠল।

'তাহলে শোন, এই লোকটাই আমাকে ভাল্লুকের কবল থেকে উদ্ধার করেছে! এই সেই লোক যে সময়মত হাজির না হলে আমি ভাল্লুকের হাতে অক্কা পেতাম। আমার কোন অনিষ্ট তো করেই নি, বরং নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর পাঞ্জা থেকে ফিরিয়ে এনেছে। শত্রুর জন্য কখনো কেউ নিজের জীবন বিপন্ন করেছে বলে শুনেছ তোমরা? শুধু সাহসী বললে এর সম্বন্ধে কম বলা হল, একাধারে সুনিপুণ যোদ্ধা এবং শিকারী আমার এই বন্ধু। এ আমাদের সাথে থাকলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে।'

রাজা বলল, 'কার্ব ফিরে না আসা পর্যন্ত চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। সে এখন জোরামে মেয়ে সংগ্রহ করতে গেছে। ফিরে আসুক, তারপর একটা সভা ডাকা হবে। সেই সভায় ফয়সালা হয়ে যাবে, লোকটাকে নিয়ে কি করা দরকার। এখন একে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।'

টার্জন প্রতিবাদ জানাল, 'আমি বন্ধুভাবে এসেছি—বন্ধুভাবেই থাকব এখানে। নয়তো থাকবোই না মোটে।'

কে একজন বলে উঠল, 'একে আটকে রাখবার দরকার নেই। দেখাই যাক না, আমাদের কোন ক্ষতি করে কি-না।'

'যদি মেয়ে চুরি করে নিয়ে পালায়!' রাজা বলল।

'আমিই ওর হয়ে জামিন থাকছি।' ওভান উত্তর দিল।

'বেশ তাই হোক।'

টার্জনের পক্ষ সমর্থন করল তিনজন—ওভান, তার মা এবং বোন। অবশ্য বিচারসভার মর্জির ওপরই তার ভাগ্য নির্ভর করছিল। সেই সভায় যা স্থির হবে, তার ওপর কারো কোন জারিজুরিই খাটবে না।

টার্জন সহজভাবেই সবার সাথে মেলামেশা করতে লাগল। যারা তাকে পরোয়া করত না, সেও তাদের থোরাই কেয়ার করত। ধীরে ধীরে এদের রীতিনীতি রপ্ত করে ফেলল সে। দেখল, ব্যক্তিবিশেষের জন্য সঙ্গিনী নির্দিষ্ট

করা থাকলেও যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বাছবিচার ছিল না এদের মধ্যে। তাই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবও গড়ে ওঠেনি এখনো।

ওভানের মার নাম মরাল। স্বভাব সরল ভঙ্গীতে অনেক কথাই বলল টার্জনকে। একসময় জোরামই তার দেশ ছিল। আর এখন সেই জোরামের কথা বিলকুল ভুলে গেছে সে। এই ক্লোভিই তার দেশ এখন। তার মন-প্রাণ ক্লোভির বাইরে যেতে চায় না আর। তার ধ্যান-ধারণা, আশা-ভরসা সবই এখন এই প্রকাণ্ড গুহাটাতেই সীমাবদ্ধ। এখানকার মাতব্বর যৌবনে তাকে এখানে না নিয়ে এলে বরাবরই হয়ত এখানকার লোকদের ঘৃণা করে যেত সে।

আরো একজন টার্জনের অনুরক্ত হয়ে উঠল। নাম তার উলান। কোনরকম হামবড়া ভাব নেই। শান্তশিষ্ট নিরীহ এই লোকটি অদ্ভুত সব চিন্তা করত —অদ্ভুত সব কথা বলত। দলের লোকেরা তাকে যথেষ্ট মর্যাদাও দিত। মগজটাকে শুধুমাত্র প্রাত্যহিক প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে ব্যবহার না করে আরো অনেক গঠনমূলক কাজে নাকি ব্যবহার করা যায়। রোজ রোজ শিকার না করে কয়েক জাতের প্রাণীকে পোষ মানালে তাদের দিয়েই নাকি মাংসের অভাব মিটতে পারে। যে-সব গাছের ফল খাওয়া যায় সেগুলিকে কাছাকাছি কোথাও চাষ করা যেতে পারে। কতকগুলি দাগ কেটে অনেক কথাই নাকি বোঝানো যায়। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে টার্জনকে সে নিয়ে গেল গুহার একটা নির্দিষ্ট স্থানে। মশালের কম্পিত আলোতে পাথরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল টার্জন। এ-ও কি সম্ভব! পাথরের গায়ে হরেক রকম আঁকাবাঁকা দাগ কেটেছে উলান। প্রাগৈতিহাসিক আমলের প্রাণীরা তার হাতের যাদুতে পাথরের দেয়ালে চিত্রায়িত হয়েছে। সে-সব অপটু হাতের আঁচড় দেখে আধুনিক দর্শকেরা অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করবেন। কিন্তু ঐ যুগের আবিষ্কার হিসেবে তার মূল্য যে কত, সেটা ধারণা করা যায় না। ম্যামথ, দাঁতাল বাঘ, পাহাড়িয়া ভাল্লুক, লাল হরিণ, হায়না, কুকুর, শেয়াল, থিপ্‌ডার এবং আরো এমন সব প্রাণীর ছবি ছিল, যাদের চোখে দেখা তো দূরের কথা, তাদের সম্বন্ধে কখনো কানেও শোনেনি টার্জন।

একটা ছবির দিকে তাকিয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করতেই উলান বলল, 'ওটাকে আমরা বলি গায়র। আমাদের পাহাড়ের অদূরে একটা সমভূমি আছে, সেখানেই ওদের বাস।'

টার্জনের অনুরাগীর সংখ্যাও যেমন বাড়তে লাগল, বিরাগীর সংখ্যাও নিতান্ত কম রইল না। উলান তো টার্জন বলতে অজ্ঞান। সামান্য হেরফের করে ছবিগুলোকে আরো সুন্দরভাবে এঁকে দিল টার্জন। পশুর চর্বি নষ্ট না করে আগুন জ্বালাবার কাজে ব্যবহার করতে শেখাল। নিজের ইস্পাতের ছুরি দিয়ে সুন্দর সুন্দর চামড়ার পোশাক তৈরী করে দিল। বাচ্চাদের জন্য ছোট ছোট কাঠের খেলনা তৈরী করল। তাকে ঘিরে মেয়েদের অবিরাম জটলা ভাল ঠেকল না অনেকের চোখে। রবাহূত এই লোকটিকে তাড়াবার জন্য সড় করতে লাগল তারা। দলের হোমরা-চোমরা লোকদের মজলিস যতদিন না বসছে ততদিন কিছু করারও সাধ্য নেই তাদের। টার্জনের জীবনের মেয়াদ নির্ভর করছে সেই মজলিসের রায়ের ওপর।

কার্ব ফিরে না আসা পর্যন্ত মজলিস বসবে না। সে যতদিন জোরামে থাকে টার্জনের পক্ষে ততই মঙ্গল। দলের লোকদের হাত করে ফেলতে হবে তার। প্রয়োজনের সময় যেন কাজে লাগাতে পারে এদের। টার্জনের একার পক্ষে নিজের ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এদের সাহায্য চাই-ই তার। জ্যাসন গ্রিডলে পাহাড়ের কোথাও না কোথাও আছে। অন্ততঃ তাকে খুঁজে বের করতে পারলে মুশকিল অনেকটা আসান হবে।

এক দিন, এক সপ্তাহ, না এক মাস কেটে গেল সেটা বোঝবার সাধ্য নেই টার্জনের। অনেকবার সে খেল, ঘুমলো, আর এদের সাথে শিকারে গেল। ওভানের মা মরালের সাথে প্রায়ই সে গল্পগুজব করত। সেদিনও করছিল। অন্যান্য মেয়ে আর পুরুষেরা এখানে-সেখানে শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একটা শিসের শব্দ শোনা যেতেই পড়ি-মরি করে ছুটল সবাই গুহার মুখে।

মরাল টার্জনকে বলল, 'হয়ত কার্ব আসছে।'

গুহার সামনে প্রশস্ত চত্বরে একটি ছেলে ছুটে এসে দুহাত তুলে শান্ত হতে বলল সবাইকে। জনতা শান্ত হলে সে ঘোষণা করল, 'কার্ব আসছে! ক্লোভির মহান যোদ্ধা, সম্মানিত বীর, জোরাম থেকে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে আসছে। ক্লোভি জিন্দাবাদ! কার্ব জিন্দাবাদ!'

বিশজন যোদ্ধার বিরাট একটি দল গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের সাথে একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। হাতে তার শক্ত লতার বাঁধন। স্পর্ধিত আচরণ দেখে দলপতিকে চিনতে বিলম্ব হল না টার্জনের। চেহারায় একটি

ছোটখাট দানব যেন। দলের মধ্যে লোকটার প্রভাব খুব বেশী। এর উপস্থিতির অপেক্ষায় স্বয়ং রাজা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখে।

বন্দী মেয়েটির দিকে তাকাল টার্জন। এর রূপে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে সবাই। এদের মতে এই মেয়েটিই জোরামের মধ্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। জোরামের কেন, তাদের জগতের নূরজাহান বললেও এর সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা হয় না। অবশ্য বাইরের জগতে এর চেয়েও সুন্দরী আছে।

রাজা তার যোদ্ধাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। কার্ব অভিযানের খুঁটিনাটি বিবরণ বলে গেল। জনতা উল্লসিত হল সে সব শুনে।

রাজা বলল, 'এখুনি আমাদের একটা সভা ডাকা হবে। সেই সভায় মেয়েটির অভিভাবক স্থির করা হবে। আরো একটা জরুরী ব্যাপারের মীমাংসাও করা দরকার।

কার্ব জানতে চাইল, 'কিসের জরুরী ব্যাপার?'

টার্জনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল রাজা, 'এই অচেনা লোকটা আমাদের অতিথি হয়ে থাকতে চায়। কার কি মত জানতে হবে আমাদের।'

সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে উঠল কার্বের দৃষ্টিতে। বলল, 'কেন একে মেরে ফেলা হয়নি? এক্ষুনি মেরে ফেলা হোক একে।'

রাজা বলল, 'তুমি একা তো কোন সিদ্ধান্ত নিতে পার না এ-ব্যাপারে। সবাই যা বলবে তাই হবে।'

'কে কি বলে না বলে আমার জানার দরকার নেই। আমাদের মাঝে শত্রুর চিহ্ন থাকতে দেব না আমি।'

উলান বলল, 'মজলিস বসানো হোক—সেখানে যা স্থির হবে তাই করা হবে।'

কার্ব উত্তর দিল, 'এখন থাক। এখন আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত। সভার অধিবেশন স্থগিত থাক কিছুকাল। দেহে হৃতশক্তি ফিরে আসুক, আমরা খাইদাই, আরাম করি, তারপর দেখা যাবে।'

সবাই কার্বের অভিমত সমর্থন করল।

মেয়েটি একেবারে নির্বাক। আসার পর থেকে একটা কথাও বলল না সে। তার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। গুহার ভেতর নিয়ে যাওয়া হল তাকে। মরালের ওপর পড়ল তার দেখাশুনার ভার। মরাল মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করল তাকে। প্রতিটি মেয়েই তার সাথে অমায়িক ব্যবহার করল।

এমনটি মোটেই দেখবার আশা করেনি টার্জন। আফ্রিকান উপজাতিরা বন্দী মেয়ের সাথে উল্টো ব্যবহারই করে থাকে। বিশেষ করে সেখানকার মেয়েরা এ-ব্যাপারে বড়ই হিংসুটে। অপর কোন মেয়ের আগমনকে বিষনজরে দেখে তারা। নতুন পরিবেশে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মেয়েটি, কখনো বা মারাই পড়ে। অথচ পেল্যুসিডারে বন্দী মেয়ের দারুণ সমাদর।

টার্জন মরালকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে বসল। নিঃসঙ্কোচে মরাল সব কথাই খুলে বসল টার্জনকে—'আমরা ওর ওপর হামলা করতে যাব কেন? আমিও যেমন মেয়ে, সেও তেমনি মেয়ে। আজ না হয় আমাদের হাতে ধরা পড়েছে ও, ভবিষ্যতে আমরাও তো অন্য কোন জাতের হাতে ধরা পড়তে পারি। তারা যদি জানতে পারে, ক্লোভির মেয়েরা অন্য গোষ্ঠীর মেয়েদের যাতনা দেয়, তারাও তো আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না। বিজাতীয় পুরুষকে মেরে ফেলার প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু মেয়েদের বেলা সেটি খাটে না। তাছাড়া, বাকী জীবন ওকে তো আমাদের মাঝেই কাটাতে হবে। এখন থেকে ও আমাদেরই একজন। ওকে আমরা যাতনা দিতে যাব কেন?'

তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'বোসো। ওখানে মাংস আছে, পাত্রে জল আছে। খেয়েদেয়ে ঘুম দাও—শরীরের ক্লান্তি দূর হবে। না, না, ভয় করবার কিছু নেই। তুমিও যেমনি জোরামের মেয়ে, আমিও তেমনি জোরামেরই মেয়ে।'

এবার চোখ তুলে চাইল মেয়েটি। বলল, 'তুমিও জোরামেরই মেয়ে! নিশ্চয় তাহলে আমার দুঃখ বুঝবে তুমি। আমার মনের মধ্যে যে তুফান বয়ে চলেছে, একদিন তোমার ভেতরেও নিশ্চয় তেমনটি হয়েছে। আমি এখানে থাকব না—জোরামে ফিরে যাব। এখানে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া শ্রেয় মনে করি আমি।'

মরাল উত্তর দিল, 'প্রথম প্রথম সবারই অমন হয়। আমারও হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যায়। আমার যেমন হয়েছে। আমাকে যখন ধরে আনা হল, তখন এখানকার কাউকেই আমি দুচোখে দেখতে পারতাম না। কিভাবে পালাব সেই চিন্তায় ঘুম আসত না আমার। পরে যখন দেখলাম, জোরামের সাথে ক্লোভির কোন পার্থক্যই নেই, তখন ধীরে ধীরে আমার উগ্র মেজাজ প্রশান্তিতে ভরে এল। তোমারও ঠিক তাই হবে।

তোমার জন্য যখন সঙ্গী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে তখন দেখবে, জীবনটা কত মধুর কত মনোরম।'

'বেহদ্দ বেহায়া কোথাকার! তোমার মত মেয়ের জন্যই জোরামের কুলমান সব গেল। আমাকে নিজের মত বলে ভেবে নিয়েছ! আমার নাম হচ্ছে জানা—আমার মরদ আমি নিজেই যোগাড় করব। তোমরা আমার ইচ্ছায় বাদ সাধবার কে?'

'এমন স্পর্ধিত উত্তর একদিন আমিও দিয়েছিলাম। আজ আমি একেবারে বদলে গেছি—তুমিও যাবে।'

'হুঃ।' ক্ষুব্ধ আক্রোশে চোখ ফিরিয়ে নিল জানা।

টার্জন অবাক হয়ে বলল, 'তুমিই তাহলে জোরামের লাল ফুল? তোমার ভাই-এর নাম তো থোর, তাই না?'

জানা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত কথা কি করে জানলে তুমি? ...তুমিও বুঝি আমারই মত কয়েদী?'

'হ্যাঁ, আমাকেই এরা মেরে ফেলবার কথা ভাবছে।'

'আমার ভাই-এর কথা কি বললে? কোথায় সে?'

'একসঙ্গেই জোরামে যাচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ ঝড়জল শুরু হল। তারপর আমাদের দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তোমার সাথে জ্যাসন গ্রিডলে নামে একজন লোক ছিল না? তার কি হল?'

'জ্যাসন গ্রিডলে! জ্যাসন গ্রিডলের কথাও জান তুমি? কে হয় তোমার?'

'আমার বন্ধু।'

'কিন্তু তোমার বন্ধু তো আর জীবিত নেই—জলে ডুবে মারা গেছে।'

টার্জন চিন্তিত হল।

জানা বলে চলল, 'তোমার বন্ধু যে আমার সাথে ছিল, তুমি সেটা জানলে কি করে?'

'পায়ের ছাপ দেখে।'

'তাই বল। বড় ভাল লোক ছিল বেচারা। কিন্তু আমার কি যে হল—।"

'আচ্ছা, জোর করে বলতে পার যে সে মারা গেছে?'

'আমার চোখের সামনেই যে জলে তলিয়ে গেল।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হল না। পরে টার্জনের কানে ফিসফিস করে বলল জানা, 'এখানকার লোকগুলিকে একদম চেনো না তুমি। তোমাকে

তারা মেরে ফেলবেই। বিশেষ করে কার্ব-এর মত হিংস্র স্বভাবের লোক আর দুটি হয় না। চল, আমরা পালিয়ে যাই। তোমাকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমি আর আমার ভাই যতক্ষণ আছি, জোরামের কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।'

পেছনে খ্যানখ্যানে গলার আওয়াজ শোনা, 'কি মতলব আঁটছো?'

পিছু তাকিয়ে রাজাকে দেখে চুপ মেরে গেল উভয়ে। রাজা মরালকে লক্ষ্য করে বলল, 'মেয়েটাকে পাশের গুহায় নিয়ে যাও। সভার অধিবেশন না বসা পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হবে তাকে। গুহার দরজায় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করছি আমি।'

যেতে যেতে চোখের ইশারায় সাহায্যের আবেদন জানিয়ে গেল জোরামের রূপসী মেয়ে। টার্জনও ইশারায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। গুহার ভেতর শ-খানেক লোক শুয়ে-বসে অবকাশ যাপন করছিল। বাইরে জনা বারো সশস্ত্র যোদ্ধা ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছিল। একা হ'লে পালাবার চেষ্টা করে দেখত টার্জন। কিন্তু জানার জন্যই তাকে অন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে।

জানা পাশের গুহায় চলে গেলে রাজা টার্জনের দিকে তাকাল, 'আর তুমি—সভার সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত তুমিও আমাদের বন্দী। যাও, তুমিও পাশের গুহাতেই থাকবে।'

টার্জনের হাত নিশপিশ করতে লাগল, পা উসখুস করতে লাগল। এদের সকলেই এখন অপ্রস্তুত। পালাবার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ এখন। এরপর পাহারা জোরদার করা হবে। আইনসভার রায় যে টার্জনের বিপক্ষেই যাবে, অতি সহজেই সেটা আন্দাজ করা যায়। কারণ, দলের মধ্যে কার্ব-এর প্রভাবই বেশী, আর টার্জনকে সে মোটেই সুনজরে দেখে না।

কিন্তু পালাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করল না টার্জন। জানা তাকে অনুরোধ জানিয়ে গেছে। আর সেই অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারে না সে। অগত্যা ভারিক্কি চালে গুহার মুখে এগিয়ে চলল রাজারই আদেশ শিরোধার্য করে।

[১২]

অতিকায় প্রাণীটা হাওয়ার ভর করে যতই নেমে আসছিল, গ্রিডলের স্মৃতিপটে ততই ভেসে উঠতে লাগল প্রাণীটার প্রকৃত স্বরূপ। বাইরের পৃথিবীতে ওর পরিচয় জুরাস্তিক আমলের স্টেগোসরাস নামে। কিন্তু ওর

পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। ঝরণার কিনারে দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ যোদ্ধাটির দিকে যেভাবে ধেয়ে যাচ্ছে তাতে মুহূর্তকাল পরেই লোকটির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। তাই চটপট কিছু একটা করা দরকার।

দূরত্ব বেশী থাকায় প্রাণীটার গায়ে রিভলভারের গুলি লাগার সম্ভাবনা খুব কম। তবু গুলি তাকে করতেই হবে। লাগুক আর না লাগুক, প্রাণীটার দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট করা দরকার। সহসা একটা আর্ত চিৎকার করে প্রাণীটা ঘুরে যেতেই গ্রিডলে বুঝল, একটা গুলি অন্ততঃ গায়ে লেগেছে ওর। পরের মুহূর্তেই প্রাণীটা লেজটাকে হালের মত ব্যবহার করে এবং শিরদাঁড়ার সাথে জোড়া চামড়ার পাতগুলি সামান্য হেলিয়ে উড়ে এল গ্রিডলের দিকে।

গুলির শব্দে চারদিকের নিথর নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গিয়েছিল। আদিবাসী লোকটির মনের ভেতরে পুঞ্জীভূত আদিম প্রবৃত্তিও ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাদের সমাজ তাদের শিক্ষা দিয়েছে—বাঁচতে হলে নিজের জন্য বাঁচ, সংগ্রাম করতে হলে নিজের গোষ্ঠীর জন্য কর। কিন্তু এই অদ্ভুত লোকটা যেচে বিপদ ঘাড়ে নিতে গেল কেন? অন্য সময় হলে লোকটার দুর্দশা সে চোখ তুলেও দেখত না। এখন কি যে হল, নিজের অজ্ঞাতেই উপকারী লোকটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে চলল।

এত তাড়াতাড়ি প্রাণীটা যে কাছে এসে পড়বে গ্রিডলে কল্পনাও করতে পারেনি সেটা। প্রকাণ্ড চোয়াল দুটো মেলে ধরে প্রাণীটা যেন গিলতে আসছে গ্রিডলেকে। চিৎকার শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়! একযোগে দুহাতে দুটো রিভলভারই চালাতে লাগল গ্রিডলে। মুখের ভেতর দিয়ে মগজে গিয়ে বিঁধল একের পর এক গুলি। সেই মারাত্মক গুলির আঘাত সহ্য করতে না পেরে ধপাস্ শব্দে মাটিতে নামল প্রাণীটা। তবু থামল না। পায়ে ভর করেই ছুটল গ্রিডলের দিকে। গ্রিডলের মনে হল, ওর প্রচণ্ড চিৎকারেই বুঝি বধির হয়ে যাবে সে।

আদিম লোকটি ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। চেঁচিয়ে বলল সে, 'সরে যাও, ওপাশে সরে যাও। তোমার কি ভয়ডর কিছু নেই? এসব ফুটফাট আওয়াজে ওটা মরবে নাকি! দাঁড়িয়ে দেখ, বর্শা দিয়ে কিভাবে খতম করি।'

লোকটির কথায় মনে মনে হাসলেও সরে দাঁড়াল গ্রিডলে। রিভলভারের সাথে পরিচিত নয় বলেই একথা বলতে পারছে। মনে করছে, শব্দ করে প্রাণীটাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

লোকটিরও বর্শা ছোঁড়া হল না, গ্রিডলেকেও আর গুলি চালাতে হল না। সেই অতিকায় প্রাণীটা হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আর্তনাদের মত কয়েকটি কথা অস্ফুটে বেরিয়ে এল লোকটির মুখ দিয়ে, 'মরে গেছে! কিন্তু বর্শা তো আমার হাতেই রয়ে গেছে—মরল কি করে?'

রিভলভার দুটো হোলস্টারে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল গ্রিডলে, 'এমনি কি আর মরেছে—এদের দৌলতেই প্রাণ হারাতে হয়েছে।'

'তা কি করে হয়? আওয়াজ শুনে আবার কেউ মারা যায় নাকি!'

'যায় কি-না তাতো চোখের সামনেই দেখলে। তবে শুধুমাত্র আওয়াজ নয়, এর সাথে আরো কিছু আছে। ওর মুখটা একবার পরীক্ষা করে দেখ, তবেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে।'

গ্রিডলের নির্দেশমত প্রাণীটার মাথা এবং মুখ পরীক্ষা করে অনেক কিছুই দেখতে পেল লোকটি। দেখল, ছোট ছোট কতকগুলি ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। ফলে গ্রিডলের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হল।

গ্রিডলেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? জোরামেই বা তোমার কি কাজ?'

চমকে উঠল গ্রিডলে, 'কি বললে? জোরামে এসে গেছি!'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি জোরামেরই লোক?'

'হ্যাঁ'

'বলতে পার, জানার কি খবর? কেমন আছে সে?'

'জানা! জানার সাথে তোমার পরিচয় হল কি করে? কে তুমি?'

'আমার নাম জ্যাসন গ্রিডলে।'

'জ্যা-স-ন গ্রি-ড-লে! ও হোহো, জ্যাসন গ্রিডলে। হ্যাঁ, জানা তো তোমার সাথেই ছিল। তুমিই তো তার কথা বলবে। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'একসাথে ছিলাম ঠিকই। কিন্তু ঝড়ের পর থেকেই সে নিপাত্তা।'

'তোমাকে আমারও দরকার ছিল। তাই অনেকদূর অনুসরণ করেছি।'

'আমাকে আবার কেন দরকার হল?'

'তোমার কাছ থেকে জানার খবর শুনতে চেয়েছিলাম আমি। তখন দেখা হলে রাগের মাথায় মেরেই ফেলতাম তোমাকে। সে বলল, তুমি নাকি লোক ভাল—জানার কোন ক্ষতিই করবে না। তাই—।'

'জানার ক্ষতি করব কেন? সে তো স্বেচ্ছায়ই আসছিল আমার সাথে। তারপর হঠাৎ কি যে হল—।'

'তোমার কথা একেবারে অবিশ্বাস করি না।'

'তা যেন হল। কিন্তু "সে" বলতে কাকে বোঝালে তুমি? জানা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এখানে নেই যে আমাকে চেনে।'

'কেন টার্জন তোমাকে চেনে না?'

'টার্জন! টার্জনকে দেখেছ তুমি? বেঁচে আছে সে?'

'টার্জনকে দেখেছি কি বলছ, তার সাথেই তো ছিলাম। কিন্তু এখন আর সে নেই—মারা গেছে।'

বাজ পড়লেও বোধ হয় এতটা চমকে উঠত না গ্রিডলে। হতাশায় সে যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল। কথাটা চিন্তা করতেও তার প্রাণে আঘাত লাগে। সেই পেশীবহুল সুন্দর সুঠাম চেহারা আরণ্য পরিবেশে আর দেখা যাবে না। সেই অমিত শক্তিধর পুরুষ নিজের বীরত্ব দিয়ে আর কাউকে মুগ্ধ করবে না। সেই মহান পুরুষের অকুতোভয় হৃদয় অবিরাম ছন্দে আর স্পন্দিত হবে না বুকের অভ্যন্তরে। তবু যেন গ্রিডলের মন প্রবোধ মানে না, হয়ত টার্জন মরে নি।

তাই জিজ্ঞেস করে বসল, 'ব্যাপারটা ঘটল কিভাবে?'

'পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা থিপ্‌ডার এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তাকে।...তুমি বুঝি তাকে খুব ভালবাসতে?'

'খুব।'

'আমিও তাই। কিন্তু আমরা দেখতেই রয়ে গেলাম। টারগাসও কিছু করতে পারল না, আমার দ্বারাও তাকে বাঁচানো সম্ভব হল না।'

'টারগাস আবার কে?'

'লোমওলা মানুষ—গভীর বনে বাস করে।'

'আর তুমি?'

'থোর—জোরামের লোক। জানার খোঁজ করে ফিরছি।'

'জানাকে তো আমিও খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'বেশ, চলো একসাথে যাওয়া যাক। কিন্তু মনে রেখ, জানার বিন্দুমাত্র ক্ষতিও যদি করে থাক তো আমার হাতে নিস্তার পাবে না।'

মৃদু হাসির রেশ ফুটে উঠল গ্রিডলের অধরে—লোকটা তাকে মৃত্যুর ভয়

দেখাচ্ছে। কিন্তু সে জানে না, জানার ভালবাসা ইতিপূর্বেই তাকে মেরে রেখেছে। কিন্তু লোকটা কে? এও কি জানার পাণিপ্রার্থী? মনের মধ্যে চিন্তায় চিন্তায় সংঘাত লাগলেও বাইরে তার প্রকাশ ঘটল না।

গ্রিডলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি যেন নাম বললে তোমার?'

'থোর।'

থোর—থোর—থোর, মনের মধ্যে অবিরাম আবর্তিত হতে লাগল কথাটা। জানা হয়ত কথাচ্ছলে থোরের নাম করেছিল। সে যে তার ভাই একথাও নিশ্চয়ই বলেছিল। কিন্তু গ্রিডলে সে-সব কথা বিলকুল ভুলে গেছে। অথচ মুখ খুলে জিজ্ঞেস করতেও পারছে না—জানার সাথে কি তার সম্পর্ক? সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে শেষে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছল গ্রিডলে—নিশ্চয়ই জানার শয্যাসঙ্গী এই লোকটা। তাই যদি না হবে, জানার জন্য তাহলে এত আকুলতা কেন? কেন তবে জানার অনিষ্টকারী ভেবে গ্রিডলেকে করতে খতম চায় সে? জানার এতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী কে হতে পারে? উত্তর পাবার চেষ্টা করলেই মনের মধ্যে কয়েকটা কথাই শুধু গুঞ্জরিত হতে থাকে—প্রণয়ী···জীবন সাথী···শয্যাসঙ্গী। আর তারপরই তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে জানার প্রতি বিতৃষ্ণায়। কি বর্বর মেয়ে বাবা! একজন যৌনসঙ্গী বর্তমান থাকতে আর একজনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। গ্রিডলের তরফ থেকে যথাযোগ্য সাড়া না পাওয়ায় রেগেও গিয়েছিল। তাই, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবার ব্যর্থতায় মারতেও উদ্যত হয়েছিল তাকে। কি সাংঘাতক! কি সাংঘাতিক! মুখে হাসি টেনে আনলেও গ্রিডলের মনের মধ্যে একটা কাঁটা রয়েই গেল।

থোর জিজ্ঞেস করল, 'জানাকে শেষ কোথায় দেখেছ বলতো?'

'আমার পক্ষে সেটা কি বলা সম্ভব? এখানকার পথঘাট, বনবাদাড় চিনিও না ছাই।'

'তাহলে এক কাজ করা যাক। ঝড় আসার আগে তোমাদের পায়ের চিহ্ন যেখানে দেখা গেছে, সেখান থেকেই খোঁজা শুরু হোক।'

'তার বোধ হয় দরকার হবে না। উপত্যকার সেখানে জানার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে-জায়গাটা নিশ্চয়ই দেখেছ। চারজন লোক জানাকে ধরবার জন্য চেষ্টা করেছিল সেখানে। তাদের দুজনকে আমি মেরে ফেলেছি। বাকী দুজন পালিয়ে গেছে। তারপর আমরা জোরামের দিকেই আসছিলাম। বিরাট একটা গিরিখাতেই আমাদের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়। সেখান থেকে খুঁজলেই চলবে।'

'বুঝেছি কোন জায়গার কথা বলছ। মনে হয়, ফেলির ঐ লোক দুজনই জানাকে ধরে নিয়ে গেছে। নিচু জমির দেশের লোক ওরা। চল, ওদের দেশেই যাওয়া যাক।'

আর সেই উচ্চাবচ শৈলশ্রেণী। আবার সেই পথচলা। আবার সেই আহার, নিদ্রা আর শিকার। থোরের কাছে সময়ের কোন দাম নেই। গ্রিডলের কাছেও এখন সেটা অতীতের বস্তু।

ইতিমধ্যে গ্রিডলে পশুর শুকনো একটা ছাল কোমরের চারপাশে জড়িয়ে গিয়েছে। দিগম্বর বেশে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে এবং পরে ভেবে অবাক হয়েছে, কি করে ততক্ষণ স্বচ্ছন্দে আদমের চেলা সেজে ঘুরে বেড়িয়েছে!

থোরের আচরণ সহজ স্বাভাবিক। বন্য প্রবৃত্তির প্রাবল্য যে তার মধ্যে না ছিল তা নয়। সময় সময় গ্রিডলে থোরের সৎ এবং অসৎ প্রবৃত্তিগুলি পরিমাপ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু কোন সীমা পেত না। সময় সময় জানার প্রেমের ব্যাপারে নিজেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হত। কিন্তু সভ্য জগতের মানুষ হিসেবে নিজেকে মনে পড়তেই ওর সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠত অন্তরে।

ওরা হাসত কম, কথা বলত কম। যা-ও দু-চারটে কথা হত, তা-ও জানার ব্যাপারে। থোরের প্রতিটি আচার-আচরণ খুঁটিয়ে দেখত গ্রিডলে জানার প্রতি তার ভালবাসার গভীরতা যাচাই করত। বিশ্রাম করবার সময় জানার কমনীয় মুখখানা ভেসে উঠত স্মৃতির পর্দায়। মনে পড়ত জানার কটু উক্তি। প্রেম নিবেদন করে জীবনে সে বিফল হয়নি কখনো। আর এই ক্ষুদে বর্বর মেয়েটা কিনা উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল তাকে! পূর্বের সমস্ত ভালবাসার স্মৃতি নিঃশেষে মুছে গেছে তার মন থেকে। শুধু জানার স্মৃতিই অগ্নি-আখরে জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে।

অশিক্ষিত বর্বর মেয়েটির কাছে ব্যক্তিত্বের পরাভব তার অহম্ ভাবকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। টার্জনের বিষাদময় স্মৃতি দিয়ে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখে জানার কথা ভুলবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু এমন সব স্মৃতি আছে যা ভোলা যায় না, এমন সব ঘটনা ঘটে যা মানতে মন সায় দেয় না। স্মৃতি এবং টার্জনের মৃত্যুর ব্যাপারটাও সে-রকম।

একে একে আরো অনেক কথা মনে পড়ল তার। ভন হোর্ষ্ট, মুভিরো এবং ওয়াজিরি যোদ্ধাদের কথা মনে পড়ল, 0-220 বিমানের কথা। নিজের

দেশ ক্যালিফোর্নিয়ার কথা ভেবে কিছু সময় কাটাল। শেষে জোরামের লাল ফুল জানার বালিকাসুলভ সুঠাম অবয়বখানা ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

থোরের মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি ছিল না। গ্রিডলের সাথে ঘনিষ্ঠ আপন জনের মত বনিবনা করে নিয়েছিল সে। ক্লেশসাধ্য চলার পথে সুখ-দুঃখ দায়-দায়িত্বের সমান অংশীদার ছিল তারা।

সেই বিরাট গিরিখাতের কোথাও যখন জানার সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন নিচু জমির দেশে যাওয়াই স্থির করল তারা।

থোর বলল, 'চল, ফেলিতেই যাই। সেখানে যদি সন্ধান না মেলে তাহলে বুঝতে হবে, ওরা মেরে ফেলেছে জানাকে। তাই যদি হয়, আমরা জানার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।'

প্রস্তর যুগে সভ্যতার উন্মেষের সময় আইন-কানুন এভাবেই চালু হয়েছিল। অন্যায়ের প্রতিকার করতে হত নিজেদেরকেই। নিজেরাই বিচারক আর নিজেরাই সাজা দেওয়ার মালিক। অন্যান্য ইতর প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য সূচিত হয়েছিল এভাবেই।

জোরামের থোর আর ক্যালিফোর্নিয়ার জ্যাসন গ্রিডলে—শত-সহস্র বৎসরের ব্যবধান তাদের মধ্যে। অথচ এই মুহূর্তে উভয়ের উদ্দেশ্যই সমান। শত্রুর প্রতি ঘৃণা এবং প্রতিহিংসায় উভয়ের অন্তরই ক্ষুব্ধ। শত্রুর সাথে লড়াই করতে হবে। অথচ, তার জন্য কোন প্রস্তুতির দরকার নেই, কোন সৈন্য-সমাবেশের প্রয়োজন নেই।

পাহাড় শেষ হল। নিচু জমিতে এসে পড়ল তারা। নানান রকম প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলল এখানে। নিরীহ হিংস্র, ছোট বড়, শিকার শিকারী, তৃণভোজী মাংসভোজী—হরেক রকম প্রাণী। কোথাও অল্প-স্বল্প দেখল, কোথাও দেখল কাতারে কাতারে। কতকগুলি প্রাণীর আকার দেখে মনে হল, বয়সের যেন গাছ-পাথর নেই তাদের। ম্যামাল আর সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন আকারে বেড়ে চলে। আকার দেখে সহজেই তাদের বয়স নির্ণয় সম্ভব হয়।

ফেলি দেশটা ছিল জলাভূমিতে। প্রকাণ্ড সব গাছ সর্বত্র সমুন্নত মহিমায় দাঁড়িয়ে। কোথাও কোথাও গাছগুলিতে লতায়-পাতায় জড়াজড়ি করে মাথার ওপর এমন নিবিড় তন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে যে সূর্যের আলোও ভেতরে ঢুকতে ভয় পায়। আর সেই প্রায়ান্ধকার পারবেশে অতিকায় সব সাপ এবং

ডায়নোসরের রাজত্ব। বাইরের পৃথিবীতে অজগর সাপ একটা হরিণকেই বড় জোর গিলে ফেলতে পারে। এখানকার সাপ আস্ত একটা হাতিকেই চালান দিতে পারে পেটের ভেতর। এমনই একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারেনি গ্রিডলে। তৃণভুক একটা প্রকাণ্ড ডায়নোসর একটা রাক্ষুসে সাপের কবলে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিল। ওপর এবং নিচের চোয়ালের চারশো-চারশো আটশো দাঁত দিয়ে ডায়নোসরটাকে এমন মরণ কামড় বসিয়ে দিয়েছিল সাপটা যে, বাঁচার চেষ্টায় অযথাই দাপাদাপি করছিল সে।

এই ভয়াবহ জলাভূমিতে পেল্যুসিডারের বাঘ এবং হিংস্র সিংহরাও ঢুকতে সাহস করে না। মানুষ যে কিভাবে বাস করে সেটা সত্যি বুদ্ধির অগম্য।

গ্রিডলে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে মানুষ থাকে কি করে? ফেলি নিশ্চয়ই এখানে নয়—অন্যত্র।'

থোর উত্তর দিল, 'না হে না, ফেলি এখানেই কোথাও হবে। আমার দেশের লোকেরা বেশ কয়েকবার এখানে এসেছে। এসেছে মেয়ে চুরির প্রতিশোধ নিতে। ফিরে গিয়ে এখানকার অনেক গল্পই করেছে তারা। তাদের কথামত সবই তো হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক। তবু চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এখানেও আবার লোকের বাস থাকতে পারে।'

'বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হবে না। ফেলি নামে গ্রামটাও দেখবে, আর সেখানে লোক থাকলেও দেখতে পাবে।'

'অতটা নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'কি করে, জানতে চাও? নিচে তাকিয়ে দেখ, তাহলেই মনের সন্দেহ দূর হবে।'

কলকলনাদিনী ছোট একটা নদী ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না গ্রিডলে। নদীর কিনারে গভীর বন। বলল, 'একটা ছোট নদী ছাড়া আমার চোখে তো আর কিছুই ধরা পড়ছে না।'

'এটাই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই নদীটার তীর ঘেঁষেই ওদের আস্তানা। ছোট ছোট টিলার ওপর গাছের বড় বড় গুঁড়ি দিয়ে বেশ শক্ত এবং মজবুত ঘর তৈরী করে ওরা। আমাদের মত পার্বত্য গুহায় বাস করে না।'

'কিন্তু বাস করবার জন্য এমন কুৎসিত জায়গা বেছে নিল কেন? আরো তো কত ভাল জায়গা আছে।'

'তা আছে। কিন্তু পরিশ্রমবিমুখ জাত ওরা। কাছেই নদীর জল আছে, অপর্যাপ্ত পশুর মাংস আছে। আর কি চাই! অন্য গোষ্ঠীর মানুষ ভুল করেও পা ফেলবে না এখানে। অন্যত্র থাকতে হলে মানুষের সাথে লড়তে হবে, নিজেদের শক্তি এবং বুদ্ধি দুই-ই খরচ করতে হবে। এখানে থাকলে সেই ঝামেলা নেই। শান্তিতে নিরুপদ্রবে দিন গুজরান করতে পারবে। অতিকায় এই প্রাণীদের ভয় অবশ্য আছে। তা তাদের এড়িয়ে চললেই হল। আস্তানাগুলিও তাই তাই মজবুত করেই তৈরী করেছে ওরা।'

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চল দুজনে। যে-কোন মুহূর্তে এখন ফেলির লোকজনের কবলে পড়তে হতে পারে। বেশীদূর এগোতেও হল না। গ্রিডলের হাত ধরে একটা হেঁচকা টান মেরেই থোর পাছের গুঁড়ির আড়ালে আত্মগোপন করল। উঁকি মেরে দেখা গেল, অদূরেই একটা উঁচু টিলার ওপর প্রকাণ্ড একটা ঘর—অবশ্য ঘর বলে সেটাকে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়।

অদ্ভুত কৌশলে তৈরী করা হয়েছে ঘরটা। চারদিকের দেয়াল গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী! প্রতিটি গাছ এত মোটা যে একজনের পক্ষে জড়িয়ে ধরা অসম্ভব। একটার ওপর আরেকটা গাছের গুঁড়ি রেখে ঘরের এক-এক দিকের দেয়াল তৈরী করা হয়েছে। ঘরটা অনেকটা সমচতুষ্কোণ। ছোট ছোট গাছ আড়াআড়িভাবে ফেলে ছাদ তৈরী হয়েছে ফাঁকগুলো বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে কাদামাটি লেপে। ঘরে ঢোকবার একটাই মাত্র দরজা, তা-ও অতি সঙ্কীর্ণ। ঘরের চারদিকে দেয়াল ঘেঁষে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি গভীরভাবে পুঁতে দেওয়া হয়ে মাটির সাথে ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে। প্রতিটির অগ্রভাগ ছুঁচলো। যত বুদ্ধিহীন প্রাণীই থাক না কেন, কেউ-ই ওগুলোর গায়ে আঘাত হেনে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাইবে না।

টিলাটা ধোপদুরস্ত কাপড়ের মতই পরিষ্কার। মানুষের সযত্ন প্রয়াসেই হয়ত ওটার এই হাল। গাছগাছালি নির্মূল করা হয়েছে নির্মমভাবে। দেখতে অনেকটা মাকুন্দ-মাকুন্দ লাগে। টিলাটার নিচেই আবার গভীর বন।

আরো অগ্রসর হয়ে আরো অনেকগুলো অনুরূপ দেখা গেল। কিন্তু বাইরে জনপ্রাণীর কোন চিহ্নই নেই। থোরের মনে হল, দেয়ালের অজস্র ফাটলপথে অনেকগুলি চোখ যেন তাদের প্রতিটি গতিভঙ্গি করে যাচ্ছে। আর গ্রিডলে

ভাবল, লোকগুলি হয়ত অবাধ আলস্যে ঘরের মেঝেতে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। নাহলে সারাটা গ্রাম এরকম খাঁ-খাঁ করবে কেন ?

গ্রিডলে বলল, 'আচ্ছা, আমরা তো এসে পড়েছি—এবার কি করবে তুমি ?'

রিভলভার দুটিকে দেখিয়ে বলল থোর, 'এগুলির একটা বের কর। জানাকে যদি না পাই ওদের শায়েস্তা তো করতে হবে—তখন দরকার হবে। তুমি তো আবার অযথা এদের ব্যবহার করতে চাও না। তাতে নাকি এদের শক্তি খরচ হয়।'

'জানার জন্য প্রয়োজন হলে এদের সব শক্তি খরচ করে ফেলব। চলে এস।'

সাবধানী ত্রস্ত পদক্ষেপে দুজনেই এগিয়ে চলল ফেলির গ্রামের দিকে। যদি জানতে পারত, একটা গভীর ষড়যন্ত্র ক্রমেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে ওদের দুজনকে, ওখানকার সমস্ত নিস্তব্ধতাই মেকী আর জনমানবশূন্যতাও একটা প্রকাণ্ড কারসাজি, তাহলে এতটা বেপরোয়াভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটত না ওরা। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কতকগুলি চোখ তখন নিষ্ঠুর উল্লাসে নেচে উঠেছিল।

[১৩]

ক্লোভি হচ্ছে গিরিকন্দর, আর সেখানকার রাজার নাম আভান। তারই আদেশে গুহার দরজায় কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়েছিল। রাজারই আদেশে টার্জন পাশের গুহায় প্রবেশ করতে গেলে সশস্ত্র সান্ত্রীরা বাধা দিল তাকে। একজন বলল, 'এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

'কেন ?'

'রাজার আদেশ।'

'কিন্তু আমি যে ঘুমোতে চাই এখানে। আর রাজার আদেশেই তো আমি গুহাটায় ঢুকতে যাচ্ছি।'

সান্ত্রী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। রাজা টার্জনের পেছন থেকে বলে উঠল, 'ঢুকতে দাও—আমিই হুকুম দিয়েছি, কিন্তু বেরতে দিও না।'

ভেতরে ঢুকে তাল তাল অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না টার্জন। অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে এলে সযত্নে চারদিকে তাকাল। দুপাশের পাথুরে

দেওয়াল অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পেছনের দেয়াল গাঢ় অন্ধকারের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে। মনে হয়, অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে গুহাটা। শুকনো ঘাসের বিছানায় স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সবাই ঘুমে অচেতন। অবশ্য দু-চারজনের ঘুম সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। গুহার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, হাজার পাওয়ারের হ্যাজাক লাইট যেন জ্বালানো আছে সেখানে। তা থাক। টার্জনের এখন সেদিকে মন নেই। প্রতিটি মেয়ের কাছে গিয়ে সে জানাকেই খুঁজে ফিরতে লাগল। জানা কিন্তু অনেক আগেই টার্জনকে লক্ষ্য করেছিল। হাল্কা একটা শিস দিয়ে টার্জনকে কাছে ডেকে নিল।

বলল, 'পালাবার কি ফন্দি আঁটলে?'

জানা শুয়ে ছিল। তার পাশে চামড়ার আসনে বসে উত্তর দিল টার্জন, 'এখনো কিছু ঠিক করিনি। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য সুযোগ পেলেই পালাব।'

'তোমার পক্ষে তো পালানো সহজ। তোমার অবাধ গতি সর্বত্র। হাতিয়ারগুলোও সাথেই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে—।'

'না, আমিও এখন বন্দী। বিচারসভা না বসা পর্যন্ত আটক থাকতে হবে আমাকে। অস্ত্রগুলো অবশ্য সাথেই থাকবে।'

'তাহলে তো দেখছি তোমার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল নয়!'

ফিসফিস করে অনেকক্ষণ কথা বলল তারা। টার্জনকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করে তুলল জানা। টার্জনও একের পর এক বলে গেল ওপরের পৃথিবীর কাহিনী। সভ্যতার উন্মেষ, সভ্যতার অগ্রগতি, সভ্যতার ভরা যৌবনের কথা; মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যপ্রীতি, রীতিনীতি এবং কায়দা-কানুনের কথা; সেখানকার আয়েশ, আরাম আর প্রাচুর্যের কথা। এত উন্নতি সত্ত্বেও জীবনের গতি সেখানে সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রবাহিত হয় না। যার আছে সে আরও চায়, যার নেই সে সামান্য নিয়েই ভুলে থাকে। দিন বসে থাকে না—কেটে যায় ঠিকই। কিন্তু কারো কাটে দৌড়তে দৌড়তে, কারো কাটে হেঁটে হেঁটে, আর কারও গড়াতে গড়াতে। জোরামের মেয়ে এসব কথার কিছু বুঝতে পারে, কিছু বুঝতে পারে না। তবু অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে শুনে যায়।

এক সময় একটা লোক উঠে বসল আড়মোড়া ভেঙে। একে একে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিল সে। বিচারসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাল সবাইকে।

জানা লোকটাকে দেখেই চিনল—কার্ব! টার্জনকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল সে, 'এখানে কি করছ তুমি?'

টার্জন উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

ক্রোধভরে আবার চেঁচিয়ে উঠল কার্ব, 'উত্তর দাও—চুপ করে রইলে কেন?'

'তুমি কর্তাগিরি করবার কে? যাও, নিজের কাজ কর।'

টার্জনের উত্তর শুনে মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল লোকটার। দ্বিতীয়বার মুখ খোলবার আগেই এক ধমক দিয়ে বসল টার্জন, 'যাও—ঐ যে সদর দরজা।'

বাক্যব্যয় না করে দুমদাম পা ফেলে বেরিয়ে গেল লোকটা।

জানা বলল, 'কাজটা বিশেষ ভাল হল না। তোমায় কি করে মারা যায় সেই চেষ্টায়ই থাকবে এখন।'

'আরে না, কথাটা না-বললেও যা হত, বলেও তাই হবে। ওর হাবভাব প্রথম থেকেই খারাপ।'

বিশেষ ভরসা পেল না জানা। গুহার সামনে প্রশস্ত চত্বরে এবার জটলা পাকাবে লোকগুলি। বৃত্তাকারে বসে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি করবে। কেউ রাজার কান ভারী করবার চেষ্টাও করবে। তারপর আইন মোতাবেক একটা সিদ্ধান্তও গ্রহণ করবে তারা। আইনসভায় কার্ব-এর প্রভাবই হয়ত বেশী। ফলে ভরাডুবি রোখা যাবে না—টার্জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়ে যাবেই। স্মরণাতীত কাল হতে এই নিয়মেই বিচার হয়ে আসছে মানব সমাজে। আজও হচ্ছে। পার্থক্য এই যে, তখন আইনের এত জটিলতা ছিল না, কথার এত মারপ্যাঁচ ছিল না।

জনশূন্য গুহায় শুধু টার্জন আর জানা বসে বসে প্রহর গুণছিল। তখন মশাল হাতে একটি বালক দ্রুত ছুটে এল টার্জনের কাছে। দেখেই চিনল—ওভান।

ওভান বলল, 'রায় বেরিয়ে গেছে—জানা হবে কার্ব-এর শয্যাসঙ্গী, আর টার্জনের হবে প্রাণদণ্ড।'

জানার হাত ধরে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল টার্জন। বলল, 'আর কালক্ষেপ করা যায় না—সময় বয়ে যাচ্ছে। সবাই এখনো অপ্রস্তুত। চাতালটা কোন রকমে পেরোতে পারলেই হয়, কেউ আমাদের ধরতে পারবে না।...আর ওভান, বন্ধুত্বের দোহাই দিচ্ছি তোমাকে, আমাদের কোন বাধা দিও না।'

'বন্ধু বলেই তো বাঁচাতে এসেছি তোমাকে। কিন্তু খবরদার, চাতালটা

পেরোবার চেষ্টা করো না—জানে খতম হয়ে যাবে। তারা সংখ্যায় অনেক, আর তুমি একা। তারা এ-ও জানে, পালাবার চেষ্টা তুমি করবেই। তাছাড়া, তোমার সাথে হাতিয়ার আছে। তাই সব লোকই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে বাইরে।'

'তাহলে উপায়! এ ছাড়া আর কোন পথও তো নেই!'

'আছে। তোমাদের সেই পথেই নিয়ে যেতে এসেছি।'

উভয়েই বিস্মিত হল।

ওভান বলল, 'আমার সাথে এস।'

গুহাটা অনেকদূর পর্যন্ত পাহাড়ের ভেতরে ঢুকে গেছে। মশালের চঞ্চল আলো গুহাগাত্রে প্রতিফলিত হয়ে ভয়াবহতা আরো যেন বাড়িয়ে তুলেছে। শঙ্কিত চঞ্চল পদক্ষেপে ছুটে চলল ওভান, পেছনে পেছনে জানা আর টার্জন।

গুহার পরিসর ক্রমেই কমে আসতে লাগল। মেঝেটা ক্রমেই এবড়ো-খেবড়ো হয়ে উঠল। শেষে সুড়ঙ্গের আকারে ধীরে ধীরে উঠে গেল ওপর দিকে। হঠাৎ থেমে গিয়ে মশাল উঁচিয়ে ধরল ওভান। সামনেই দেখা গেল অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ফাটল।

ওভান বলল, 'সুড়ঙ্গটা পর্বতের চূড়ায় উঠে গেছে। রাজা এবং রাজার প্রথম সন্তান হিসেবে আমিই শুধু এটার কথা জানি। বাবা যদি জানতে পারে আমিই তোমাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছি, তবে সাথে সাথে আমাকে দু-টুকরো করে ফেলবে। তাই, আর বেশীদূর যাওয়াটা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। ওরা গুহায় ঢোকবার আগেই আমাকে গিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে। ওরা জানবে, আমি গভীর ঘুমে অচেতন—কিছুই জানি না এ-ব্যাপারে। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তারই প্রতিদান দিলাম। বিদায়, বন্ধু বিদায়! যদি বেঁচে থাকি, আবার সাক্ষাৎ হবে।'

মশালটাকে মাটিতে ঘষে নিভিয়ে ফেলল ওভান। কিছুক্ষণ ধরে টার্জন তার ক্রমক্ষীয়মান পদশব্দ শুনতে পেল। হাজত ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দে স্বস্তির শ্বাস নিল। তারপর জানার হাত ধরে হাঁটকাতে হাঁটকাতে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে চলল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। নিজের শরীরও নিজে দেখতে পায় না। মনে হল, এই চলার যেন বিরাম নেই। অনন্তকাল ধরে চলেও যেন এই পথ শেষ হবে না। তবু পথ শেষ হয়ে এল। অন্ধকার পাতলা হল। সুড়ঙ্গের মুখ দেখা গেল। তারপর উঠে এল পর্বতের চূড়ায়।

টার্জন জিজ্ঞেস করল, 'এবার বল তো জোরাম কোন দিকে?'

জানা আঙুল দেখাল, 'কিন্তু ও-পথে তো যাবার উপায় নেই। কার্ব সহজে ছাড়বার পাত্র নয়—নিশ্চয়ই পথ আগলে বসে থাকবে আমাদের ধরবার জন্য। এখানেও হয়ত উঠে আসতে পারে।'

টার্জন বলল, 'এটা হচ্ছে তোমাদের জগৎ। এখানকার পথঘাট সব তোমাদের নখদর্পণে। আমি কিছু চিনি-জানি না যা ভাল বোঝ, যেভাবে ভাল বোঝ নিয়ে চল।'

'এস, আমরা এখন নিচু জমিতে নেমে যাই। তারপর সুবিধেমত একটা পথ ধরে জোরামে ফিরব। অবশ্য তাতে ঘুরতে হবে অনেক।'

অনেক ঘুরে যে-জায়গায় নেমে এল তারা, সে-জায়গাটা বৃক্ষহীন প্রকাণ্ড একটা তৃণভূমি। জানার কাছ থেকে শোনা গেল, গায়র নামে এক জাতের প্রাণীর প্রাধান্যই নাকি বেশী এখানে। গায়ে-গতরে বিরাট এই প্রাণীগুলি লম্বায় চারজন ঢ্যাঙা মানুষের চেয়েও বড়। বাঁকানো চঞ্চু, মাথায় তিনটি বিরাট শিং—চোখের কাছাকাছি দুটো, আর একটা নাকের ওপর। মাথা ঘিরে কাঁটাওলা লোমশ মোট মোটা চামড়ার একটা গলবন্ধ। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর তোয়াক্কাও রাখে না। নিজ গোষ্ঠী বহির্ভূত অপর কোন প্রাণী দেখলেই এদের তিরিক্ষি মেজাজ মুহূর্তে অশান্ত হয়ে ওঠে। এই তল্লাটের সর্বত্রই এদের অবাধ রাজত্ব।

চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টার্জন বলল, 'আর এ-তল্লাটটাও তো আয়তনে নেহাৎ কম নয়। যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ ঘাস। এদের মেজাজের কথা যা বললে তাতে করে অন্য প্রাণীরাও এদের সাথে বিবাদ বাঁধাতে সাহস করে বলে মনে হয় না।'

'তোমার অনুমান ঠিক হল না। সব প্রাণীরই কোন না কোন শত্রু আছে—এদেরও আছে। এদের শত্রু হরিব্। তারাই এদের মাংস খায়।'

'তাহলে এদেরও শত্রু আছে! তারা দেখতে কেমন?'

'দেখতে যাচ্ছে তাই—সাপের মত। গায়র-দের চেয়েও তারা হিংস্র। তাদের রক্তও যেমন বরফের মত ঠাণ্ডা, হৃদয়ও তেমনি অনুভূতিহীন। দয়া, মায়া, ভালবাসা, মমতা, বন্ধুত্ব সহানুভূতি কোন গুণেরই স্থান নেই সেখানে। তাই তাদের আমরা বলি হরিব্ অর্থাৎ সাপ-মানুষ।'

সমভূমিটাতে গাছপালার বড় একটা সমারোহ নেই, শুধু সবুজ লম্বা ঘাসে ছাওয়া। তৃণভোজী প্রাণীদের কাছে স্বর্গ বলে মনে হবে। মাথার ওপর স্থির অচঞ্চল সূর্য। জমি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে মিলিয়ে গেছে বহুদূরে। এমন সুন্দর জায়গায় প্রাণীর এত অপ্রতুলতা আর কখনো লক্ষ্য করেনি টার্জন। কিন্তু প্রাণী একেবারে যে না ছিল তা নয়। অস্বস্তিকর একটা গন্ধে চমকে উঠে তাকাল চারদিকে। কিছুই দেখা গেল না। গন্ধটাও এত অপরিচিত যে কি জাতের প্রাণী সেটাও বোঝা সম্ভব হল না।

মাইলখানেক দূরে একটা নদী পেরিয়ে অপর পাড়ে পৌঁছতেই জানা কি যেন দেখতে পেল। টার্জনের কানে কানে বলল, 'ঐ দেখ গায়র! ঘাসের ভেতর লুকোতেই হবে, নইলে নিস্তার নেই।'

'এখনো আমাদের দেখতে পায়নি প্রাণীটা চল, আর একটু এগিয়ে যাই!'

কোন রকম বর্ণনা দিয়েই প্রাণীটার দৈহিক গঠন ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবু জানা কিছুটা বর্ণনা দিতে পেরেছে। ভয়াবহ মুখাবয়ব, বিচিত্র আকার, চোখ ঘিরে নীলাভ কাল দাগ, খড়্গের মত বিরাট চকচকে শিং, সবকিছুই জুরাস্থিক আমলের ট্রাইসেরাটপের কথাই মনে করিয়ে দিল। এই ট্রাইসেরাটপ আর ডায়নোসরেরাই দর্পভরে এককালে মেদিনী কাঁপিয়ে তুলেছিল।

বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল ঘাসের ওপর দিয়ে। তার ভেতর লুকিয়ে থাকলে কোন প্রাণীই দেখতে পাবে না এই দুটি মানুষকে। জানা ঘাসের ভেতর সম্পূর্ণ ডুব দিলেও, টার্জন কিন্তু মুখ তুলে প্রাণীটার হাবভাব না দেখে থাকতে পারলে না। তার মনে হল, প্রাণীটা যেন ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছে, মাথা তুলে তাকাচ্ছে চারদিকে। অতবড় দেহটা নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে চক্রাকারে। কিসের যেন গন্ধ পেয়েছে সে, কিন্তু লুকিয়ে থাকা মানুষ দুটির গন্ধ নিশ্চয়ই নয়। কারণ, বাতাস সেদিকে বইছিল না। বাঁদিক থেকে কোন কিছু যেন তীরবেগে এগিয়ে আসছিল। শব্দ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। একটা নয়, দুটো নয়, অসংখ্য পায়ের শব্দ। অনুসন্ধান করবার জন্য প্রাণীটা একটু এগিয়ে গেল। শব্দগুলোও ক্রমে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট, স্পষ্ট থেকে গম্ভীর এবং তারপর গুরুগম্ভীর হয়ে মুখর করে তুলল চারদিক।

টার্জন বলল, 'যা-ই আসুক না কেন, আমাদের পাশ দিয়েই যাবে। সাবধান, যেন আমাদের দেখতে না পায়!'

জানা ঘাসের ভেতর হামাগুড়ি দিয়েই রইল। শত্রুর নজরে পড়ে অযথা

দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে রাজী নয় সে। তাই বলল, 'ওসব দেখে আর কাজ নেই—বসে পড়ো।'

চাপা গলায় উত্তর দিল টার্জন, 'এসে গেছে·· ঐ যে অনেক দূরে···মানুষ বলেই তো মনে হচ্ছে ওদের। কিন্তু কিসের পিঠে সওয়ার হয়েছে ওরা? হায় ভগবান, এমন দৃশ্য তো দেখিনি কখনো!'

এক লহমা দেখেই টার্জনকে হাত ধরে টেনে মাটিতে বসিয়ে দিল জানা। বলল, 'আরে না, ওরা মানুষ নয়—সাপ-মানুষ! একটু আগেই তো ওদের সম্বন্ধে বললাম। যার পিঠে সওয়ার হয়েছে তার নাম গোরোবর। এদের মত দ্রুতগামী প্রাণী সারা পেল্যুসিডার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। বাঁচার ইচ্ছে যদি থাকে, চুপচাপ বসে থাক। এখনো দেখেনি আমাদের।'

সাপ-মানুষের স্পর্ধা দেখে ট্রাইসেরাটপটা প্রচণ্ড এক গর্জন করে উঠল। তারপর মাথাটা নিচু করে দর্পভরে এগিয়ে চলল অনধিকার প্রবেশকারীদের যোগ্য সমাদর জানতে। সাপ-মানুষেরা সংখ্যায় পঞ্চাশ-ষাট জন, প্রত্যেকেরই একটি করে বিকট-দর্শন বাহন। আরোহীদের হাতে একটি করে বল্লম—নিঃসন্দেহে অতিকায় প্রাণীটার সাথে লড়বার পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু সাপ-মানুষেরা সামনা-সামনি লড়বার জন্য আসেনি, এসেছে কলে-কৌশলে প্রাণীটাকে কাবু করতে। চমকের পর চমক অপেক্ষা করছিল টার্জনের জন্য। দলপতির নির্দেশমত সাপ-মানুষেরা এক সারিতে এগুতে লাগল। তারপর, মুহূর্তে এক অকল্পনীয় গতিবেগ সৃষ্টি করে ঘুরতে লাগল প্রাণীটার চারদিকে। টার্জন বুঝতে পারল, এরপর যেসব কসরৎ শুরু হবে তার কাছে ট্রাইসেরাটপটার কোন জারিজুরিই খাটবে না।

পশ্চিমে আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা যে-কৌশলে শিকার করে থাকে, সেই আদিম কৌশলই খাটাতে যাচ্ছে সাপ-মানুষেরা। বৃত্তাকারে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটাকে চক্কর খেতে লাগল তারা। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রাণীটা এক-একজনকে আঘাত হানবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেগে সরে এসে কোন আঘাতই লাগতে দিল না সাপ-মানুষেরা। প্রাণীটার দম ফুরিয়ে আসতে লাগল, আগের মত সেই তেজ আর রইল না। ক্রমে চলমান বৃত্তের পরিধি ছোট হয়ে এল। এমন কোণঠাসা অবস্থা থেকে প্রাণীটার পালিয়ে যাবারও উপায় রইল না। অগত্যা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে, একবার সামনে একবার পেছনে অনবরত শিং দুলিয়ে শত্রুর সাথে লড়তে লাগল। কিন্তু শত্রুদের ক্ষতি হল না কিছুই।

হঠাৎ বেগ বেড়ে গেল। সাপ-মানুষদের চেহারা ঝাপসা হতে হতে শেষে আর দেখা গেল না। মনে হল, একটা সজীব বক্ররেখা চক্রাকারে প্রাণীটাকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছে। সজীব বৃত্তটির মাঝে যেন কোন ফাঁক নেই।

বৃত্তটির একাংশে ভাঙন ধরতেই দেখা গেল, কয়েকজন সাপ-মানুষ ছুটে গিয়ে কতকগুলি বল্লম ছুঁড়ে দিল প্রাণীটার গায়ে। প্রাণীটা কিছুটা ঝিমিয়ে এসেছিল, আঘাত পেয়ে আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। কিন্তু চেষ্টা করেও একজন শত্রুকেও ধরাশায়ী করতে পারল না সে। আবার বল্লমের আঘাত—আবার কর্ণভেদী আর্তনাদ। এবার চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল প্রাণীটা। কিন্তু বৃথাই। তাকে কেন্দ্র করে চলমান বৃত্তটাও এগিয়ে চলল। টার্জন দেখল, প্রাণীটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ফলে বৃত্তের পরিধিটাও ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে তার। এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটলেই হয় প্রাণীটার না হয় সাপ-মানুষদের বাহনের পায়ের তলায় পিষ্ট হবে তারা।

প্রাণীটার গায়ে তখন বল্লমের বৃষ্টি হয়ে চলেছিল। কয়েকজন সাপ-মানুষ ছুটে গিয়ে এমনভাবে বল্লম ছুঁড়ল যে হৃদপিণ্ড ভেদ করে শরীরে ঢুকে গেল। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না তার পক্ষে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আর একটা ফাঁড়া কেটে গেল ভেবে আনন্দে লাফিয়ে উঠল টার্জন। ভয়ও হল সাপ-মানুষেরা দেখে ফেলেনি তো! তা কি করে হয়? শিকারের নেশায় এতই মাতোয়ালা ছিল যে শিকার ছাড়া অন্য কিছু দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

টার্জন ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ধন্যবাদ দিল সাপ-মানুষদেরও। সাপ-মানুষেরা ততক্ষণে সদ্য-নিহত প্রাণীটা ফেলে সার বেঁধে ফিরে যাচ্ছে। আরে, ফিরে যাচ্ছে না তো! টার্জন আর জানাকে ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে!

টার্জন ফিসফিস করে জানাকে বলল, 'ওরা আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে দেখছি। আর তো লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়—এবার লড়াই করতেই হবে।'

জানা সমর্থন জানাল, 'হ্যাঁ, লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু আমাদেরও শেষে ঐ একই হাল হবে। ওরা সংখ্যায় অতগুলি, আর আমরা মাত্র দুজন।'

টার্জন উঠে দাঁড়াল, ধনুকে তীর সংযোগ করল এবং অপেক্ষা করতে লাগল ঝোপ বুঝে কোপ মারার আশায়। প্রথমে ধীরে ধীরে ওদের চার-

পাশে চক্কর খেতে লাগল শত্রুরা। ওদের স্বরূপ জানল। শেষে থেমে গেল সবাই।

এতক্ষণ দূর থেকেই সাপ-মানুষদের দর্শন-লাভ ঘটেছে। এবার কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল টার্জন। আরোহী এবং বাহন দুয়েরই সমান রূপ—দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। সাপ-মানুষদের ধড় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন অংশ মানুষেরই অনুরূপ। কিন্তু হাত পা দেখতে অনেকটা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মত। হাতে পাঁচটা আঙুল, পায়ে তিনটে। মাথা এবং মুখ হুবহু সাপের মত। সরু সরু কান এবং ছোট ছোট শিং মুখমণ্ডলকে আরো কদাকার করে তুলেছে। দেহের সাথে হাতগুলো কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও পাগুলো একেবারেই বেঢপ। গোটা দেহটাই আঁশে ঢাকা। বুক এবং পেটের রং ফ্যাকাসে সাদা। কিন্তু বাইরের মানুষের চোখে সেটা ধরা পড়ার কোন উপায় নেই। কারণ, মোটা চামড়ার বর্মে বুক এবং পেট ঢেকে রাখে এরা। শত্রুর আঘাত এড়াবার জন্যই এদের এই সতর্কতা। পেটের চামড়া এত নরম যে, সহজেই বিদ্ধ হবার ভয় থাকে। কোমরে থাকে চামড়ার বেল্ট। হাড়ের ছুরি ঝুলানো থাকে তাতে। হাতের কব্জি এবং পায়ের হাঁটুতে থাকে চামড়ার কঙ্কন। আর থাকে একটি করে বল্লম—প্রত্যেকের সাথে। তাদের বাহনের নাম গোরোবর। এই কুশ্রী প্রাণীগুলোর ঘাড়ে চেপে পা দিয়ে ঘাড়টাকে জড়িয়ে রাখে এরা। বাহনগুলো লম্বায় প্রায় দশ ফিট। মোটাসোটা শক্তিশালী দুটো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় এরা। প্রাণী-বিজ্ঞানীদের মতে এরাই ট্রিয়াস্থিক আমলের অ্যানোমোডোণ্ট।

সাপ-মানুষেরা হয়ত প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালেরই নিদর্শন। বিবর্তনবাদের নিয়মে ওপরের পৃথিবীতেও হয়ত এককালে এ-জাতের প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সাপের ক্রম-বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এদের।

এদের দেখে এমনই নানাকথা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল টার্জনের মনে। ভাবলেশহীন মুখগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে পলকহীন চোখ মেলে টার্জন আর জানাকেই নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল। টার্জন অবাক হল সে-সব চোখে কোন পাতা নেই দেখে। আরও অবাক হল যখন তাদের মুখে বোল ফুটল, এবং সেটাও পেল্যু-সিডারের বহুপরিচিত ভাষায়।

একজন বলে উঠল, 'আমাদের প্রতাপ তো নিজের চোখেই দেখলে। জ্ঞানগম্যি যদি কিছু থেকে থাকে, তবে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো না, আর পালাবার চেষ্টাও করো না।'

টার্জন থ বনে গেল কথাটা শুনে।

[১৪]

টিলা বেয়ে ফেলির গ্রামের দিকে শশব্যস্তে ছুটে যাচ্ছিল জ্যাসন গ্রিডলে। হাতে উন্মুক্ত রিভলভার। থোরের হাতে বর্শা আর ছুরি। কিন্তু যার খোঁজে আসা সেই জানারই কোন সাড়াশব্দ নেই। সারাটা গ্রাম যেন নিথর হয়ে পড়ে আছে—লোকজন আছে কি নেই, বোঝা যায় না। কিন্তু লোকজন ছিল। তবে গ্রামে নয়, নদীর পাড়ে মাইলের পর মাইল যে-ঝোপটা চলে গেছে, তাতে। প্রত্যেকেরই শ্যামবর্ণ চেহারা, মুখে কুচকুচে কাল দাড়ি।

জ্যাসন গ্রিডলের কেমন সন্দেহ হল। প্রতি মুহূর্তে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা করেছিল সে। অথচ ঘরগুলোর একেবারে কাছাকাছি আসা সত্ত্বেও কেউ বাধা দিতে এল না তাদের। সন্দেহ প্রকাশ করল থোর, 'আমরা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছি না তো? মনে হচ্ছে, ক্রমেই যেন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ছি আমরা।'

অতি সাবধানে পা ফেলে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী ঝুপড়ি-ঘরটার দোর-গোড়ায় দাঁড়াল তারা। তবু কোন বাধা পেল না। বাইরের মত ভেতরেও মশানের মত স্তব্ধতা। উঁকি মারল—একটা কাক-পক্ষীও নেই!

ভেতরে ঢুকে গ্রিডলে বলল, 'ব্যাপার কি বল তো—এরা সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!'

থোর বলল, 'চল, পাশের ঘরটাতে যাই। সেখানে থাকলে থাকতে পারে।'

কিন্তু দেখা গেল, পাশেরটাও খালি। পরেরটাও তাই। তার পরেরটাও তাই। সবগুলির অবস্থাই সমান। গ্রিডলে বলল, 'শিকারে-টিকারে গেছে হয়ত—এক্ষুণি এসে পড়বে।'

'আমারও তাই মনে হয়। চল, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। ওরা ফিরে আসুক, তারপর আবার দেখা যাবে।'

টিলা থেকে নেমে এসে নদীর ধারে ঝোপে গিয়ে ঢুকল তারা। গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পায়ে-চলা একটা পথ দেখতে পেল। পথটা চলে গিয়েছিল সাপের মত এঁকেবেঁকে। ধুলোয় ছিল অসংখ্য পায়ের ছাপ—বেশীর ভাগই ফেলির লোকদের। ছেঁড়া চটির দাগ দেখেই সেটা বোঝা যায়।

একটা বড় গাছের তলায় আসতেই জনাবারো লোক আচমকা লাফিয়ে পড়ে তাদের নিয়ে ধরাশায়ী হল। চোখের নিমেষে তাদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নেওয়া হল, হাত বাঁধা হল পিছমোড়া করে, আর মাটি থেকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আক্রমণকারীদের সাথে জান-পহচান হতেই বিস্ময়-বিস্ফারিত হল গ্রিডলের চোখ। পেল্যুসিডারে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু প্রাণীর সাক্ষাতই মিলেছে। রিনোসেরোস, ম্যামথ, ট্রাকোডন, টেরোড্যাকটাইল, ডায়নোসর, আরও কতই না অদ্ভুত প্রাণী। কিন্তু এই লোকগুলিকে দেখে যতটা অবাক হয়েছে সে আর কিছুতেই ততটা হয়নি।

নিজের মাতৃভাষায় কতকগুলি প্রশ্ন করল গ্রিডলে। তার একবর্ণও বুঝতে না পেরে পেল্যুসিডারের চলতি ভাষায় পাল্টা প্রশ্ন করে বসল আততায়ীরা, 'কে তুমি? এ আবার কোন ভাষায় কথা বলছ?'

লোকগুলিকে দেখে গ্রিডলে ওপরের পৃথিবীর লোক বলে ভুল করেছিল। ওদের ভাষা শুনে বুঝল, ওরা পেল্যুসিডারেরই লোক। তাই বলে ফেলির লোক নয় ওরা। থোরকে জিজ্ঞেস করেই সেটা জানতে পারল। থোর এ-কথাও বলল যে, এ-জাতের লোক আর কখনো দেখেনি সে।

আততায়ীদের প্রশ্নের জবাব দিল গ্রিডলে, 'আমি আমেরিকার লোক—আমার মাতৃভাষা ইংরেজী।'

উত্তর হল, 'আমাদের ঠকাবার চেষ্টা করো না, তোমাকে আমরা ভালভাবেই চিনি। কোন্ দেশের লোক তুমি, সেটাও আমাদের অজানা নয়।'

'বেশ, জেনেই যদি থাক, বলে ফেল তো ভায়া আমি কোন্ দেশে থাকি।'

'সারি হচ্ছে তোমার দেশের নাম। তোমাদের সাথে আমাদের দেশ কোর্সার-এর অনবরত যুদ্ধ লেগেই থাকে।'

তারপর নিজের দলবলের দিকে ফিরে বলে চলল লোকটা, 'তোমাদের কেউ চেন একে? আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, এই লোকটাই আমাদের কয়েদখানা থেকে পালিয়েছিল। তাই যদি হয়, একে ধরবার খুশীতে সিড্ মালামাল করে দেবে আমাদের।'

গ্রিডলে বলল, 'যা ব্বাবা, দুম্ করে কয়েদী ঠাওরালেই হল।'

গ্রিডলেকে কেউ পলাতক কয়েদী হিসেবে সনাক্ত করতে পারল বলে মনে হল না।

একজন বলল, 'চল, জাহাজে ফেরা যাক। অযথা আর অপেক্ষা করে লাভ

কি? এখানকার আদিবাসীদের যা রূপের ছিরি, হাজারে একটা সুন্দরী মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় কি-না সন্দেহ।'

আর একজন উত্তর দিল, 'এরা নাকি মাঝে মাঝে জোরাম থেকে মেয়ে ধরে নিয়ে আসে—আর একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক না।'

প্রথম জন বলল, 'অপেক্ষা করে লাভ নেই। যতক্ষণ আমরা আছি, আদিবাসীরা ফিরবে বলে মনে হয় না—আমাদের উপস্থিতি হয়ত টের পেয়েছে। এদিকে, আমাদের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে ক্যাপ্টেন হয়ত গালমন্দ করতে শুরু করেছে আমাদের।'

অদূরে একটা লম্বাটে ধরণের নৌকো ভেড়ানো ছিল। সেটার পাহারায় জনা তিনেক লোক ঘুরঘুর করছিল। হাতিয়ার বলতে বাঁকানো লোহার ভোজালি, লম্বা পিস্তল এবং সেকেলে গাদাবন্দুক ছিল একটা করে।

কয়েদী দুজনকে নিয়ে কোর্সার-এর লোকেরা নৌকোয় চড়তেই খরস্রোতা নদীর জলে তরতর করে ভেসে চলল নৌকো।

অল্প-পরিসর নদী ক্রমেই চওড়ায় বাড়তে লাগল। লোকগুলিকে দেখে গ্রিডলের বিস্ময়ও মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। চেহারায়, চোখে, মুখে, বলতে গেলে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৌরাত্ম্যের ছাপ। কানে সোনার রিং, মাথায় বাঁধা সুদৃশ্য রুমাল, কোমরে রেশমী ফিতা এবং পরণে রঙীন বস্ত্র। জমকাল পোশাক-আশাকে রং-এর এত বাহার সত্ত্বেও এদের কুটিল স্বভাব চাপা পড়েনি, বরং আরো যেন প্রকট হয়ে উঠেছে।

জ্যান্সন গ্রিডলে এবং থোর নৌকোর মাঝখানে বসেছিল। তাদের হাত দুটো তখনও পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। নৌকোর অন্যান্য আরোহীরা হৈ-হল্লা করছিল ওদের ঘিরে। কখনো কখনো কুৎসিত গালাগালি দিয়ে মজা পাচ্ছিল তারা। একটা লোক অন্ততঃ তাদের সাথে পৈশাচিক আনন্দে যোগ দেয় নি। দলের লোকেরা বেশ সমীহ করেই চলত তাকে। তার প্রতিটি কথার যথেষ্ট ওজন ছিল এবং কথাও কম বলত সে। তবে যা বলত, অনেকেই সেটা মেনে নিত বিনা প্রতিবাদে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই বোঝা গেল, লোকটার নাম লাজো। কুৎসিত আমোদ-প্রমোদের চেয়েও নৌকোর নিরাপত্তা বিধানই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। কোন জলচর প্রাণী আচমকা না আক্রমণ করে বসে সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। ইশারা করে গ্রিডলে তাকেই কাছে ডাকবার চেষ্টা করল।

লাজো জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই তোমার ?'

তোমাদের দলপতির সাথে কথা বলতে চাই।' উত্তর দিল গ্রিডলে।

'এখানে দলপতি বলতে কেউ নেই এখন। যে ছিল পথে মারা গেছে। কেন কি দরকার ?'

'আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দাও। দেখতেই পাচ্ছ, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের অস্ত্রগুলোও সব কেড়ে নিয়েছ তোমরা। তাছাড়া, আমাদের তুলনায় দলেও তোমরা অনেক ভারী। চেষ্টা করলেও তোমাদের সাথে আমরা এঁটে উঠব না। নদীতে এই যে সব প্রাণী দেখছি, নৌকো উল্টে দেবার পক্ষে এদের একটাই যথেষ্ট। তাই যদি হয়, আমরা দুজন নির্ঘাত জলে ডুবে মারা যাব। হাত বাঁধা থাকলে প্রাণ বাঁচাবার সামান্য চেষ্টাও করতে পারব না।'

লাজো মন দিয়ে শুনল সব কথা। তারপর কোমর থেকে ছুরিটা খুলে ফেলল।

'একি করতে যাচ্ছ ?' দলের একজন লোক বাধা দিল লাজোকে।

'হাতের বাঁধন কেটে দেব এদের—অযথা বেঁধে রাখার কোন অর্থ হয় না।'

বাঁধন খুলে দেবার তুমি কে ?'

'যেই হই না কেন, তোমার সেটা প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই।'

'অধিকার আছে কি নেই, এক্ষুণি সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।' সাঁৎ করে করে নিজের ছুরি খুলে নিয়ে লাজোর দিকে এগুতে এগুতে বলল লোকটা।

তারপর নৌকের ওপরেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীতে মল্লযুদ্ধ চলল খানিকক্ষণ। বাকী সবাই বাধা তো দিলই না, বরং প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল এই দ্বৈতযুদ্ধ। গ্রিডলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়েই কাটাল। কারণ, লাজো না জিতলে তার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল নয়। শেষ পর্যন্ত লাজোই জিতে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী লোকটার বুক থেকে ছোরাটা টেনে বের করতেই রক্তের গঙ্গা বয়ে গেল নৌকোর ওপর। রক্তমাখা ছোরাটা নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে গ্রিডলে এবং থোরের হাতের বাঁধন কেটে দিল সে।

'ফেলে দাও এটাকে নদীর জলে।' মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠল লাজোর কণ্ঠ। জ্যাসন এবং থোরকে লক্ষ্য করেই এই আদেশ।

একজন বাধা দিল, 'দাঁড়াও, ওর জুতো জোড়া আমার চাই।'

আর একজন বলল, 'আমি ওর ছুরিটা নেব।'

এভাবে এক-একজন লোক এক-একটা জিনিস দাবী করে বসল। লাজো বাধা দিল না। ক্ষুধার্ত কুকুরের পালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা মৃতদেহের ওপর। শেষে লজ্জা নিবারণের জন্যও কিছু রইল না। নগ্ন দেহটাকে ফেলে দিয়ে নৌকো আবার ছুটে চলল পূর্ণবেগে। গ্রিডলে ভাবল, মাংসাশী জলচর প্রাণীর কবলে পড়লে মৃতদেহটাও বেশীক্ষণ আস্ত থাকবে না।

কত পথ যে পার হতে হল তার ঠিক নেই। ক-বার যে খেতে হল তারও হিসেব নেই। কিন্তু ঘুমোবার সুযোগ হয়নি একটি বারের তরেও। সারা পথ দাঁড় বেয়ে বেয়ে জ্যাসন গ্রিডলে আর থোরের হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। অবসাদে শরীর ভেঙে এল। অবশ্য শুধু তাদের দুজনেরই নয়—সবারই একই হাল। লাজো দয়াপরবশ হয়ে হয়ে বিশ্রাম নিতে বলল ওদের দুজনকে। আদেশ পেয়েই ক্লান্ত দেহটাকে সটান গলুই-তে এলিয়ে দিল তারা।

আর তখনই একজন নাবিক চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান, সামনেই সাপ-মানুষেরা জলকেলি করছে!'

লাজো আদেশ দিল, 'যে যার দাঁড় টানার আসনে যাও। তীরবেগে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে না পারলে রক্ষে নেই।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জ্যাসন গ্রিডলে এবং থোরকে নিজের নিজের আসনে যেতে হল। গ্রিডলের ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেয়। কিন্তু সেটি হবার জো নেই। তারপরই নজর পড়ল সাপ-মানুষদের দিকে। সাপ-মানুষেরা নিজেদের বাহনে চেপে নদী-বিহার করছিল। গ্রিডলের মনে হল, বিধাতার রাজ্যে এমন কদাকার সৃষ্টি বুঝি আর দুটি হয় না।

এতগুলি লোকের প্রাণপণ চেষ্টায় ঝপাঝপ দাঁড় পড়তে লাগল জলে। নদীর স্রোত এবং হাওয়াও অনুকূল ছিল। ফলে তীরের বেগে ছুটে চলল বিরাট নৌকোটা। সাপ-মানুষদের সাথে দূরত্ব কমে আসতে লাগল অতি দ্রুত। লাজো কয়েকজন সাথী নিয়ে কামান এবং গাদাবন্দুকগুলো তৈরী করে রাখল। সাপ-মানুষদের ভেতর দিয়ে সাঁ করে নৌকোটা বেরিয়ে যেতেই তারাও পিছু পিছু ধেয়ে চলল। সাথে সাথে গর্জন করে উঠল তার কামান আর গাদাবন্দুক। নদীবক্ষ হঠাৎ যেন আলোড়িত হয়ে উঠল বহুবিচিত্র শব্দে। সাপ-মানুষদের হৈ হৈ রৈরৈ আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। কত যে আহত হল, কত যে মারা গেল, কত যে তলিয়ে গেল জলে, তার ইয়ত্তা নেই। তবু তারা তাদের কিম্ভূতকিমাকার বাহনে চেপে জল তোলপাড় করে এগিয়েই

চলল। একজন মারা গেলে সে-জায়গায় দশজন এসে হাজির হতে লাগল মুহূর্তে।

এরপর শুরু হল সাপ-মানুষদের পাল্টা আক্রমণ। গ্রিডলে ওদের বর্বর জীব বলেই ভেবেছিল। কিন্তু তার সেই ভুল ধারণা দূর হতে বিলম্ব হল না বিশেষ। সাপ-মানুষদের প্রতিটি বল্লমের আঘাতে একজন করে দাঁড়বাহী লোক নিহত হতে লাগল। প্রসাদ গণল লাজো। নৌকোর গতি মন্থর হয়ে এল। নদীবক্ষ মুখরিত করে দুর্বার বেগে এগিয়ে এল সাপ-মানুষেরা—তাদের প্রচণ্ড অসুন্দর জল-ঐরাবতে চেপে।

কোন হাতিয়ার সাথে না থাকায় গ্রিডলে এবং থোর নিজের নিজের আসন ছেড়ে নৌকোর পাটাতনে নেমে গিয়েছিল। বল্লমের আঘাতে কচুকাটা হয়ে এক-একজন লোক ছিটকে এসে পড়ছিল পাটাতনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃতদেহে বোঝাই হয়ে গেল পাটাতনটা। মৃত লোকগুলির রক্ত মাখামাখি হয়ে গেল গ্রিডলে আর থোরের শরীর। চারদিকে তখন সাপ-মানুষদের সেকি নারকীয় উল্লাস!

নৌকোটাকে ওরা টেনে নিয়ে গেল নদীর পাড়ে। চামড়ার দড়ি দিয়ে গাছের গুঁড়ির সাথে নোঙর করা হল। লাজো এবং তার দুজন সঙ্গী ছাড়া বাকী সবাই হয় মারা পড়ল, নয় আহত হল। বন্দী লোক তিনজনকে বেঁধে নামিয়ে নিল সাপ-মানুষেরা। তারপর খালাস করা হতে লাগল নৌকোটাকে। মৃতদেহগুলিকে বাছাই করা হল প্রথমে। যারা কম জখম হয়েছে তাদের তুলে নিয়ে বাকী সবাইকে ছুরি চালিয়ে জবাই করে ফেলা হল। গ্রিডলে আর থোর সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। তাই তারাও বন্দী হল।

বন্দীদের এক জায়গায় জড়ো করে গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হল। তারপর শুরু হল ভোজনপর্ব। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে কার না শরীর কণ্টকিত হয়। মৃত মানুষগুলিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে নদীর জলে ধুয়ে নিল প্রথমে। তারপর এক-একটা মৃতদেহ এক-এক দিক দিয়ে খাওয়া শুরু হল। কেউ হাত-পা চিবাতে লাগল কচকচ শব্দে, কেউ হাড় গুঁড়ো করে ফেলল দাঁত দিয়ে চিবিয়ে, কেউ চোখ খুবলে খুবলে খেতে লাগল, কেউ রক্ত চুষে খেতে পরম তৃপ্তিভরে জিভ দিয়ে টকাস্ টকাস্ শব্দ করতে লাগল। সেদিকে বেশীক্ষণ তাকাতে না পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল জ্যাসন গ্রিডলে। সমস্ত শরীর তার রি-রি করে উঠল ঘৃণায়।

'আমাদের বাঁচাল কেন বলতে পার?' জিজ্ঞেস করল গ্রিডলে।

'ভগবান জানে।' উত্তর দিল লাজো।

থোর বলল, 'শুনেছি, ওদের বাচ্চাকাচ্চা আর স্ত্রীরা নাকি নাদুসনুদুস চেহারার মানুষ খেতে খুব ভালবাসে। তাই মানুষ ধরা পড়লেই খোঁয়াড়ে নিয়ে আটকে রাখে ওরা। ভালমন্দ খেতেও দেয় প্রচুর। ওদের পাল্লায় পড়লে ডিগডিগে চেহারার লোকেরাও ছাখ ছাখ করে তেল চুকচুকে গোলগাল ভুঁড়ি বাগিয়ে বসে। লোকটা খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে কি-না সেটা বোঝবার জন্য ওরা নাকি ভুঁড়িতে সুড়সুড়ি দেয়। হাসির রকমভেদ দেখেই বুঝে ফেলে, কে খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে, আর কে হয়নি।'

সাধারণতঃ সাপ-মানুষদের গায়ের রং হাল্কা নীলাভ। কিন্তু ভোজের সময় সেই রং ঘনঘন পাল্টাতে থাকে। প্রথমে সারা গায়ে একটা লালচে আভা ফুটে ওঠে। সেই আভা ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে হতে বেগুনী রং-এর হয়ে যায়।

সাপ-মানুষদের সব কিছুই বিস্ময়াবহ। তবু জ্যাসন গ্রিডলে সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হল তাদের কথা বলতে শুনে। আর একটা মজার ব্যাপার, এদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন উচ্চতা নেই। চার থেকে ন-ফিট পর্যন্ত হরেক রকম উচ্চতা এদের। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এরা বুঝি ঢ্যাঙাও হয় আবার বেঁটেও হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত খাটো সাপ-মানুষদের বেলাও যেমন, সবচেয়ে লম্বা যে তার বেলায়ও তেমনি। আসলে নির্দিষ্ট কোন বয়সের পরে এদের বৃদ্ধি থেমে থাকে না—সারা জীবন ধরেই দৈহিক বৃদ্ধি চলতে থাকে। সরীসৃপজাতীয় কতকগুলি প্রাণী এই নিয়মেই বেড়ে চলে। এদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আকার দেখেই এদের বয়স বোঝা যায়, আর বোঝা যায় এদের মোটা চামড়া এবং তার ওপরকার পুরু আঁশ দেখে।

ভূরিভোজন শেষ হলে সাপ-মানুষেরা লম্বালম্বি শুয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই, তারা কি জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে। কারণ, চোখে কোন পাতা নেই, পালকও নেই। ধীরে ধীরে তাদের গায়ের রং বদলে লালচে বেগুনি থেকে হাল্কা বাদামী হয়ে গেল। যেন মাটির সাথে তাদের দেহের রং-এর কোন তারতম্য নেই।

দেহেমনে দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল গ্রিডলে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল খেয়াল ছিল না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল সে। ভয়াবহ স্বপ্ন! স্বপ্নে জানাকে দেখতে পেল। একটা সাপ-মানুষ যেন নির্মম নির্দয় মুখটা মেলে গ্রাস

করতে উদ্যত হয়েছে জানাকে। পাশেই সে হাত-বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখছে। শত চেষ্টায়ও হাতের বাঁধন খুলছে না।

ঘাড়ে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথাবোধ হতেই জেগে উঠল ধড়ফড় করে। দেখল, একটা সাপ-মানুষ বল্লমের খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিয়েছে তাকে। বলছে, 'শব্দ করো না—আস্তে।'

গ্রিডলে বুঝল, ঘুমের ঘোরে অনেক বকবক করেছে সে।

সাপ-মানুষেরা একে একে উঠে বসেছে। শিস্ দিয়ে ডাকতেই তাদের বাহন-গুলি উঠে এসেছে নদীর জল থেকে।

একজন এসে বাঁধন খুলে দিল। বলল, 'পালাবার চেষ্টা কিন্তু করো না। পালাতে তো পারবেই না, বরং প্রাণে মারা পড়বে।'

সাপ-মানুষদের বাহনের নাম গোরোবর। গ্রিডলের চোখে সবাই একরকম দেখতে হলেও, প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল। পারতপক্ষে নিজের জন্য নির্দিষ্ট বাহন ছাড়া অন্য কোনটাতে চাপতো না সাপ-মানুষেরা। এমনই একটাতে গ্রিডলেও সওয়ার হল। তার পাশেই বসে রইল একজন সাপ-মানুষ।

একটু পরেই পুরো দলটা এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলল পেল্যুসিডারের নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা রক্তের স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে যেন মাথায় উঠে গেল গ্রিডলের। প্রাণীটার শরীর কী ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেতে!

গ্রিডলে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের দিয়ে কি করবে তোমরা?'

পাশে উপবিষ্ট সাপ-মানুষের নিঃসঙ্কোচ উত্তর, 'খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করা হবে তোমাদের। আমাদের মেয়েরা মোটা মানুষ খেতে বড় ভালবাসে। গায়ের-এর মাংস এখন আর মুখে রুচে না তাদের। অবশ্য সবসময় মানুষ যোগাড় করা সম্ভব হয় না আমাদের পক্ষে।'

গ্রিডলে চুপ মেরে গেল। ওর সাথে কথা বলে স্বস্তি পাচ্ছে না সে। মনে ভয় ধরে গেছে তার। মরণের ভয় নয়—মোটা হয়ে যাবার ভয়। কি খাইয়ে মোটা করা হয়, জানতেও বড় কৌতূহল জাগল তার। কিন্তু ওর প্রতি অসীম ঘৃণায় আর জিজ্ঞেস করা হল না।

থোর এবং অন্যান্য কয়েদীরা আগে আগে যাচ্ছিল। তাদের দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু দূরত্ব বেশী থাকায় কথা বলার কোন উপায় ছিল না। শেষে তারা এসে পৌঁছল বিস্তীর্ণ এক হ্রদের পাড়ে। এক দঙ্গল সাপ-মানুষ কিলবিল

করছিল জলে। কেউ সাঁতার কাটছিল, কেউ পাঁকের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে তুরীয় আনন্দে বিভোর হয়ে ছিল। দলবল এসে পৌছলেও তাদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না। বাচ্চাকাচ্চা এবং মেয়েদের কয়েকজন অবশ্য কিছুটা কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এল।

এমনিতে ওদের মধ্যে পুরুষ এবং মেয়েদের চেহারায় বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, শুধু শিং ছাড়া। পুরুষেরা চামড়া দিয়ে তলপেট ঢেকে রাখে, কিন্তু মেয়েরা তার প্রয়োজন বোধ করে না।

ওরা এতদূর সভ্য যে, হাড় দিয়ে বল্লম বানাতে শিখেছে, অন্য প্রাণীকে নিজেদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য করে রেখেছে। তবু হ্রদের পাড়ে কোন শহর বা গ্রামের হদিস পাওয়া গেল না। তবে অনেকগুলো মেয়েকে ডিম পাড়তে দেখা গেল সেখানকার জলের কিনারে। নরম কাদায় ডিমগুলোকে সযত্নে ডুবিয়ে রাখতেও দেখা গেল। ডিমগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করবার জন্য লম্বা লম্বা কাঠি পুঁতে দেওয়া হয়েছে গোল করে। এরকম অসংখ্য কাঠি তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোথাও কাদার মধ্যে টিকিটিকির মত ছোট ছোট শিশুরা অবাধ উল্লাসে খেলা করছে।

পুরো দলটা ততক্ষণে জড়ো হয়েছে হ্রদের পাড়ে। বন্দী লোকদের মাটিতে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারির পুরোভাগে থোর এবং শেষপ্রান্তে গ্রিডলে। একজন সাপ-মানুষ থোরকে সাপটে ধরল প্রথমে। দুটো আঙুল দিয়ে থোরের নাকটা চেপে ধরল, হাত দিয়ে চেপে ধরল মুখটা। আর কোন ভূমিকা না করে সাপ-মানুষটা থোরকে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল জলে। ছলাৎ করে একটা শব্দ হল। তারপর উভয়েই অদৃশ্য হল জলের নিচে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে গ্রিডলে জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঢেউগুলি উৎপত্তিস্থল থেকে ক্রমেই বেড়ে যেতে যেতে চলে গেল বহুদূর পর্যন্ত। কিন্তু কেউ আর উঠে এল না। লাজো এবং তার সঙ্গী দুজনেরও সেই একই অবস্থা হল। এক-একজন সাপ-মানুষ তাদের নিয়েও ডুব দিল।

এবার গ্রিডলের পালা। দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সাপ-মানুষটার কবল থেকে মুক্ত হতে চাইল সে। কিন্তু সবই বৃথা। ঠাণ্ডা শিরশিরে পিচ্ছিল চটচটে একটা হাত চেপে বসল তার মুখের ওপর। দুটো আঙুল তার নাকটাকে সজোরে চেপে ধরল। তারপর হ্রদের উষ্ণ কর্দমাক্ত জলের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল তার দেহটাকে। সে অনুভব

করল, বাতাসের অভাবে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত-পা ছুঁড়ে নাকটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তার চোখে ঘনিয়ে এল জমাট-বাঁধা অন্ধকার। ধীরে ধীরে অনুভূতি লোপ পেতে লাগল। তারপর হঠাৎ নাক-মুখের ওপর থেকে হাতটা সরে যেতেই শ্বাস নেবার আকুল চেষ্টায় হাঁফাতে লাগল সে। না, জল বা কাদা কিছুই ঢুকল না নাকে। ফুরফুরে জলো হাওয়ায় খানিকক্ষণ শ্বাস নিতেই সুস্থ হয়ে উঠল সে। বুঝল, ডুবে মরেনি —বরং জলের তলায় কাদার বিছানায় শুয়ে আছে।

মিশমিশে কালো আঁধার ঘিরে ছিল তাকে। কাদা-মাখানো কতকগুলো প্রাণী তারই পাশে পড়েছিল। একটা নয়, দুটো নয়—বেশ কয়েকটা। তারাও অন্ধের মত হাতড়াচ্ছিল। আশেপাশে জলের মধ্যে ছপ্ ছপ্ ছলাৎ ছলাৎ কতকগুলো শব্দ। সে-শব্দ থেমে যেতেই নিচে এই কাদার সুড়ঙ্গে সমাধি-ক্ষেত্রের নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

[১৫]

ধনুর্বাণ হাতে টার্জন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশেই ছিল জানা। ঘাসের ওপর ঢেউ খেলিয়ে শনশন শব্দে বয়ে যাচ্ছিল উদাসী হাওয়া। কদাকার গোরোবরগুলির ঘাড়ে চেপে সাপ-মানুষেরা তাদের দুজনকে ঘিরে অপেক্ষা করছিল। আত্মসমর্পণ করা ঠিক হবে কি না তাই ভাবছিল সে।

আবার তাড়া এল, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও বলছি।'

'যদি না দিই?'

'মারা পড়বে আমাদের হাতে। পালাবার চেষ্টা করেও কোন ফল হবে না।'

টার্জন ইতস্ততঃ করতে লাগল। জানা পরামর্শ দিল, 'ওদের কথাই মেনে নেওয়া যাক। অতগুলোর সাথে এঁটে ওঠা যাবে না। সুযোগ বুঝে পরে না হয় পালাবার চেষ্টা করা যাবে।'

জানার কথাই যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিল টার্জন। আবার সেই পথচলা। আবার সেই গহন বন আর কলকলনাদিনী নদীর কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়া। টার্জন এবং জানা পৃথক পৃথক বাহনে চেপেছে। উভয়ের পাশেই একজন করে সাপ-মানুষ। বিচিত্র এখানকার বন্য বিপদের প্রকৃতি হাজার মাইল পেরিয়েও

হয়ত কোন দুর্ঘটনাই ঘটল না, আবার মাইলখানেক যেতে না যেতেই হিংস্র প্রাণীর কবলে পড়তে হল।

সাপ-মানুষদের আস্তানা এখান থেকে অনেক দূরে—অন্ততঃ কয়েকশো মাইল দূরে তো হবেই। সেই হ্রদটাই এদের আস্তানা, যেখানে জ্যাসন গ্রিডলে তাল তাল অন্ধকারের মাঝে এক টুকরো আলো দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে ছিল। বসে বসে নানা কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে হতাশায় ভরে গেল অন্তর। অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ফেলল, 'হায় ভগবান, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে আমাকে!'

'কে? কে কথা বলল?' অন্ধকার ভেদ করে কার যেন গলা। জ্যাসন বুঝতে পারল, সেটা হচ্ছে থোরের গলা।

'আমি গো আমি—জ্যাসন গ্রিডলে।'

'তুমি কোথায়? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো?' লাজোর কণ্ঠস্বর।

'আমরা তাহলে বহাল-তবিয়তেই আছি, মারা পড়িনি একজনও!' চতুর্থ ব্যক্তি বলে উঠল।

'চিন্তা নেই, পৃথিবীর আলো আর দেখতে দেবে না ওরা।' পঞ্চম জনের গলা।

জ্যাসন গ্রিডলে বলল, 'আরে বাঃ, আমরা পাঁচজনই তো একই জায়গায় হয়েছি। ভালই হল—পালাবার সুবিধে হবে।'

'কিন্তু এ আমাদের কোথায় নিয়ে আসা হল, কিছুই তো বুঝতে পার ছিনা।' লাজো বলল।

গ্রিডলে উত্তর দিল, 'আমি বুঝতে পেরেছি মনে হয়। তাহলে শোন, আমাদের পৃথিবীতে কুমীর নামে একজাতের প্রাণী আছে। তারা এ-ধরনের সুড়ঙ্গ তৈরী করে থাকে। সুড়ঙ্গটা তৈরী হয় নদীর তীর বরাবর—জলরেখার ওপরে কাদায়। তাতে ঢোকবার কিন্তু একটাই পথ আছে এবং সেটা থাকে জলের নিচে। আমরাও হয়ত তেমনই একটা সুড়ঙ্গে রয়েছি এখন।'

'তবে তো আমরা সাঁতার কেটেই বেরিয়ে যেতে পারব।' থোর বলল।

'তা হয়তো পারব। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? জলের ওপরে ওরা যে চোখে সর্ষে তেল ঢেলে বসে রয়েছে। নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতে হবে।' গ্রিডলে উত্তর দিল।

'তাহলে কি কখনো আমরা পালাতে পারব না—এখানে বসেই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকব?' লাজো জানতে চাইল।

গ্রিডলে বলল, 'তা কেন, আমাদের এমন একটা পরিকল্পনা ফাঁদতে হবে যাতে করে ধরা পড়ার ভয়ও না থাকে, আবার পালিয়েও যেতে পারি।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হল না। গ্রিডলেই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠল, 'এখানে কি আমরা পাঁচজনই আছি, না আরো কেউ আছে? কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারলে নিশ্চয়?'

লাজো জবাব দিল, 'আমি অন্ততঃ অন্য কারো সাড়াশব্দ পাইনি। সাপ-মানুষেরা কেউই নেই এখানে। যা বলবার নির্ভয়ে বলতে পার।'

'ঠিক আছে, সবাই কাছে এস।'

পাঁচজনে মাথা ঠেকিয়ে গোল হয়ে বসে শুরু হল জল্পনা-কল্পনা। গ্রিডলে নিজের পরিকল্পনার কথা বলে গেল। তার মতে সুড়ঙ্গটা থেকে বনভূমির দূরত্ব খুব বেশী নয়। হ্রদের পাড়েই বন। সুড়ঙ্গটাও নিশ্চয়ই হ্রদের কিনারে জলরেখার ওপর। ফলে বনজঙ্গল কোনদিকে সেটা কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় না। যেদিকে সুড়ঙ্গের মুখ তার বিপরীত দিকেই হওয়া স্বাভাবিক। তাই কোনরকমে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গটা বাড়িয়ে নিতে পারলে জঙ্গলের মাটি ভেদ করে ওপরে ওঠা যাবেই।

'তাহলে আর দেরী কিসের, এখনই কাজ আরম্ভ করা যাক।' লাজো বলল।

দাঁড়াও, আগে দেখে নিই, সুড়ঙ্গের প্রবেশপথটা কোথায়।' গ্রিডলের উত্তর দিল।

আলোহীন সেই অন্ধকার পরিবেশে হাতে-পায়ে ভর দিয়ে গ্রিডলে খুঁজতে লাগল সুড়ঙ্গের মুখ। পেয়েও গেল। সবাই বুঝে নিল কোন্ দিক দিয়ে খোঁড়া শুরু করতে হবে।

তারপর সেকী উৎসাহ! খোঁড়াখুঁড়ির কাজ যেখানে শুরু করতে হবে, লাজোকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল সেই জায়গায়। সুড়ঙ্গের পরিসর মাপবার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে একবার এপাশ থেকে ওপাশ যাওয়া-আসা করা হল। কাদামাটির মধ্যে ক-বার পায়ের গোড়ালি ফেলতে হল সেটা হিসেব করেই বোঝা গেল সুড়ঙ্গের আকার-আয়তন কেমন। লম্বায় পঞ্চাশ ফিট, চওড়ায় বিশ ফিট, কিন্তু উচ্চতা এত কম যে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায় না। এখন সমস্যা হল, যেসব মাটি খুঁড়ে ফেলা হবে তার কি গতি হবে? এক জায়গায় জড়ো করে রাখা ঠিক নয়। আচমকা সাপ-মানুষদের আবির্ভাব

ঘটলে সন্দেহ করে বসবে। স্থির হল, মাটির চাবড়াগুলো প্রথমে মেঝেতে সমানভাবে বিছিয়ে দেওয়া হবে। মেঝেটা একটু ভরাট হয়ে গেলে, চাবড়াগুলোকে দেয়ালে লেপ্টে দেওয়া হতে থাকবে।

হাতে হাত মিলিয়ে কাজ চলতে লাগল বটে, কিন্তু খালি হাতে মাটি খোঁড়া যে কত আয়াসসাধ্য ব্যাপার, কাজের ফল দেখেই সেটা বোঝা গেল। সবাই সমান তৎপর, সবাই সমান সতর্ক। কারণ, যেকোন মুহূর্তে সাপ-মানুষদের আসার সম্ভাবনা ছিল। সম্ভাবনাটা যে অমূলক নয়, অচিরেই সেটা প্রমাণও গেল। জলের মধ্যে ছলাৎ করে একটা শব্দ হতেই সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়াল সবাই। উদ্দেশ্য, সুড়ঙ্গের ভেতরটা আড়াল করে রাখা। একজন সাপ-মানুষ ওদের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে হাজির হল। অন্ধকারের মধ্যেও সব কিছু দেখতে পায় সাপ-মানুষেরা। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে কোন কিছু সন্দেহ করার মত বুদ্ধিবৃত্তি এখনো গড়ে ওঠেনি ওদের মধ্যে। তাই খাবার পৌঁছে দিয়েই চলে গেল সে।

আবার পুরোদমে চলল কাজ। তিন ফিট ব্যাসার্ধযুক্ত দশ ফিট লম্বা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলল তারা। কতটা সময় লাগল তা অবশ্য বলা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড একটা ঝিনুক আবিষ্কার করে ফেলল তারা। কাজ সহজসাধ্য হয়ে এল এবার। তবু মনে হল, এ-কাজের যেন আদি-অন্ত নেই। কখন তাদের নিয়ে যাওয়া হবে, তারই বা ঠিক কি!

মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গটাকে যখন বনের ভেতরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা, তখন 0-220 বিমানখানা তাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। পাইলটের আসনে বসে বহুদূর বিস্তৃত শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন জুপনার বলে উঠল, 'নাঃ, ওঁরা এখানে আসেনি নিশ্চয়। মানুষের সাধ্য কি এই পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে যায়!'

হাইন্‌স উত্তর দিল, 'আমিও আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। চলুন, অন্য কোথাও খোঁজ করি।'

'আর কোথায় খোঁজ করব বলুন তো? বাকী তো আর রাখিনি কোন জায়গাই।' ক্যাপ্টেন বলল।

হাইন্‌স সমর্থন করল কথাটা, 'তা বটে।'

পেল্যুসিডারে দিক্ বলতে কোন কিছু বোঝার উপায় নেই। তাই নিজেরই খেয়ালমত বিমাখানা চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ক্যাপ্টেন। সে তো

আর জানত না, সামান্য বাঁ দিকে মোড় নিলেই টার্জনের মাথার ওপর দিয়ে যেতে পারত বিমানখানা।

টার্জন আর জানা তখন গোরোবরের কাঁধে চেপে এগিয়ে যাচ্ছিল নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। এগিয়ে যাচ্ছিল গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে। নিচু নিচু ডালগুলি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে তাকে আলিঙ্গন করতে চাইল। অনায়াসেই সে তাদের একটাতে লাফিয়ে উঠে পড়তে পারত। সাপ-মানুষেরা কোন কিছু বোঝবার আগেই সে তাদের নাগালের বাইরে চলে যেত। কিন্তু যত চিন্তা জানাকে নিয়ে। গলা ছেড়ে জানাকে কোন নির্দেশ দেবার উপায় নেই—সাপ-মানুষেরা সতর্ক হয়ে যাবে। কানে কানেও কিছু বলবার জো নেই, কারণ জানাকে কাছে পাওয়া মুশকিল। বললেও বিশেষ কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। পাহাড়ে চড়ায় জানার যতই দক্ষতা থাক, গাছে চড়ায় নিশ্চয়ই অতটা পটু নয়। কোনরকমে জানাকে কাছে পেলে তাকে বগলদাবা করে নিয়েই টার্জন গাছে উঠে যেত। আর, একবার গাছে চড়লে তাকে ধরে কার সাধ্য।

অথচ বন শেষ হয়ে এল। দূরে সরোবরের টলটলে জল দেখা গেল। সাপ-মানুষদের কথা শুনেও বোঝা গেল, তাদের গন্তব্যস্থল এসে গেছে। আর বিলম্ব নয়। যা করার এখনই করতে হবে। নইলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল পাশে-বসা সাপ-মানুষটা খেয়ালই করতে পারল না। টার্জন তখন গাছের ডালে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করছে জানার জন্য। শোভাযাত্রার শেষ ভাগে রয়েছে জানা। এক ঝটকায় তাকে তুলে নিতে পারলেই টার্জনের কাজ শেষ। তারপর সাপ-মানুষেরা যতই মাথা কুটুক, তাদের আর পাত্তা পাওয়া যাবে না।

এমন সময় টার্জনের নাকে ভেসে এল কতকগুলি বিশিষ্ট গন্ধ। সে-গন্ধ সাপ-মানুষদের নয়। চকিতে নতুন একটা পরিকল্পনা উদিত হল তার মগজে। জানাকে সে উদ্ধার করবেই। কিন্তু তার আগে আত্মরক্ষা করা দরকার। ইতিমধ্যে তার পলায়নকে কেন্দ্র করে সোরগোল আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু ততক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে সে।

পেছন থেকে সবকিছুই দেখতে পেল জানা। এই কদাকার প্রাণীদের হাতে পড়েও সে বিশেষ অধীর হয়নি। কারণ, টার্জনই তাকে উদ্ধার করবে, এই

ভরসা ছিল তার। কিন্তু সে-ই যখন পালিয়ে গেল, তখন আর কোন আশার আলো দেখতে পেল না জানা। অবশ্য টার্জনকে দোষও দেওয়া যায় না। সুযোগ বুঝে নিজের জীবন বাঁচিয়েছে সে। এই নিদারুণ সংকটে বিশেষ করে গ্রিডলের কথা মনে পড়ে গেল তার। সে নিশ্চয়ই জানাকে এভাবে বিপদের মাঝে একা ফেলে পালাতে পারত না।

প্রথমে টার্জন অনেক উঁচুতে উঠে গেল। এটা যেন আর এক জগৎ। নিঝুম নিস্তব্ধতা সর্বত্র। গাছে গাছে জড়িয়ে আছে বিচিত্র-দর্শন সব সাপ। ডালে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে নানা আকারের সব পাখি। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে নবীন কিশলয়। কিন্তু এখন এসব দেখার সময় নয়। তাছাড়া তাকে এগিয়েও যেতে হবে তাড়াতাড়ি। অগত্যা খানিকটা নেমে এসে লতাপাতার ঝুলন্ত দড়ি অবলম্বন করে গন্ধের উৎস সন্ধানে দ্রুত এগিয়ে চলল।

টার্জন জানত যে, সাপ-মানুষেরা তাকে খোঁজাখুঁজি করবে। বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হবে তাতে। সেই অবসরে সে তার কাজ হাসিল করে ফেলবে। হলোও তাই। গাছপালা সব তছনছ করে ফেলল সাপ-মানুষেরা। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল টার্জনকে। অবশেষে রাগে অন্ধ হয়ে ফিরে এল যে-যার বাহনে। মানুষের মত বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি তাদের মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে না। শরীরের মধ্যে ঘনঘন রং বদলাতে দেখলেই বোঝা যায়, হয় ওরা দারুণ রেগে গেছে, না হয় খুশী হয়েছে কোন ব্যাপারে।

বনের মাঝে খানিকটা খোলামেলা জায়গা ছিল। সেখান থেকেই গন্ধটা ভেসে আসছিল। দশজন নিগ্রো যোদ্ধা বসে বসে গল্পগুজব করছিল সেখানে। টার্জনকে হঠাৎ আবির্ভূত হতে দেখে নিজেদের চোখগুলিকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না তারা। হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতেই খুশীর উল্লাসে মেতে উঠল।

সমস্বরে বলে উঠল তারা, 'টার্জন! আপনি বেঁচে আছেন!'

টার্জন বলল, 'কথা বলার একদম সময় নেই আমার। তোমাদের পেয়ে গেলাম—ভালই হল। যথেষ্ট গোলাবারুদও সাথে আছে দেখছি। সাপ-মানুষদের সাথে লড়তে হবে—প্রস্তুত হও। শীগ্‌গিরই তারা এসে পড়বে এখানে। তাদের সাথে একজন মেয়ে আছে, তাকেই উদ্ধার করব আমরা।'

'আমরা তৈরী।'

'বেশ, তোমাদের শক্তির পরীক্ষা হবে আজ। আচ্ছা, দলের আর সব কোথায়? মূল ঘাঁটি এখান থেকে কত দূরে?

'বলতে পারি না।'

'বলতে পার না কেন?

'কারণ, আমরা যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। জ্যাসন গ্রিডলের সাথে আমরা আপনার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম। একটা মাঠের ভেতর একদল হিংস্র জন্তু আমাদের আক্রমণ করে বসে। সেখানে থেকেই গ্রিডলের সাথে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। ভন হোষ্টও আমাদের সাথেই ছিলেন। এখন তাঁকেও দেখতে পাচ্ছি না। তারপর থেকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই বনজঙ্গলের মধ্যে।'

হঠাৎ টার্জন সবাইকে চুপ করতে বলল। সম্মিলিত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে দূরে। টার্জন জিজ্ঞেস করল, 'সাপ-মানুষদের দেখেছ কখনো?'

'না, তাদের দেখার দুর্ভাগ্য হয় নি।'

'দেখনি—এবার দেখবে। ভয়ঙ্কর চেহারা—ভয় পেয়ো না যেন।'

'আমরা ভয় কাকে বলে জানি না।'

টার্জন হেসে বলল, 'আমাকে একটা রাইফেল দাও। আর শোন, ওদের দেখলেই গুলি করবে। একটা গুলিও যেন ব্যর্থ না হয়। মেয়েটাকে আবার গুলি করে বসো না যেন—লক্ষ্য রাখবে।'

চোরাগোপ্তা আক্রমণ নয়, সামনা-সামনি লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল তারা। সাপ-মানুষেরা দূর থেকে টার্জন আর তার দলবল দেখেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। টার্জনকে লক্ষ্য করে কি একটা কথাও বলতে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। গুলি বিদ্ধ হয়ে একসঙ্গে জনা দশেক লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। খুশীর ভাব দূর হতেই রাগে নীল হয়ে গেল তাদের শরীর। শত্রুদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য বল্লম উঁচিয়ে ভীমবেগে ছুটে চলল। শত হলেও গোরোবরদের চেয়ে বন্দুকের গুলির গতিবেগ অনেক বেশী। তার ওপর উপযুক্ত হাতে বন্দুক থাকলে তো আর কথাই নেই। পরাজয় কাকে বলে সাপ-মানুষদের জানা না থাকলেও এযাত্রা তাদের সেই পরাজয়ই স্বীকার করে নিতে হল।

কত যে মারা পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। ছিন্নমূল বৃক্ষের মত এক-একটা মৃতদেহ মাটিতে পড়তেই দেহের রং পাল্টে মাটির রং-এর সাথে একাকার হয়ে গেল। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হতে বিলম্ব হল না। অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে সাপ-মানুষেরা পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করল।

সবার পেছনে থাকায় জানাকে এতক্ষণ দেখা যায় নি। জানাকে কাঁধে নিয়ে গোরোবরটা ভীষণ বেগে এগিয়ে আসছিল। গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করছিল একজন সাপ-মানুষ। জানারই পেছনে বসে ছিল সে। টার্জন দেখল, গোরোবরটাকে মারতে না পারলে জানাকে উদ্ধার করা অসম্ভব। গুলি করবার জন্য তাক করতেই চোখের নিমেষে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। চালকবিহীন একটা গোরোবর ধাক্কা দিয়ে বসল তাকে। বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েছিল সে। উঠে দাঁড়াতেই দেখে, জানাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে সাপ-মানুষটা।

চালকের অভাবে গোরোবরগুলি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে দৌড়াদৌড়ি করছিল। এদেরই একটা এসে ধাক্কা মেরেছিল টার্জনকে। একটা গোরোবর পালিয়ে-যাওয়া প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেই বাকীগুলিও ধেয়ে চলল পিছু পিছু।

নিগ্রো যোদ্ধারা তখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। এই অতিকায় প্রাণীদের উন্মত্ত তাণ্ডবের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে হাড়গোড় ভাঙবার ইচ্ছে ছিল না তাদের। টার্জনকে হঠাৎ এদেরই একটার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠতে দেখে অবাক হয়ে গেল তারা। টার্জন ততক্ষণে অদ্ভুত কৌশলে প্রাণীটার ঘাড়ে কায়েমী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে নিজের।

ঝোপঝাড় ভেদ করে ডালপালা ভেঙে দুর্দমনীয় গতিবেগে ছুটে চলল টার্জনের বাহন। অদূরে জানাকেও দেখা গেল। আর বিলম্ব নয়। টার্জনের বন্দুক গর্জন করে উঠল এবার। গোরোবরটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই জানাও ছিটকে বেরিয়ে গেল, সাথে সাথে সাপ-মানুষটাও।

বাহনটাকে চালাতে শিখেছিল, কিন্তু তাকে থামাতে শেখেনি টার্জন। ভয় পেল, তাকে নিয়ে বাহনটা সাপ-মানুষদের ডেরায় গিয়েই না হাজির হয়। বেগ একটু কমাতে না পারলে লাফিয়ে পড়াও বিপজ্জনক। যখন দেখল জানাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে, তখন মরি-বাঁচি করে এক লাফ দিল। গিয়ে পড়ল মৃত গোরোবরটার পিঠে।

না, আঘাত বিশেষ লাগেনি। সাপ-মানুষটা তখন জানাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে বাঁচাবার জন্য ছুটতে উদ্যত হতেই পায়ের তলার মাটি হঠাৎ ধ্বসে গেল, আর বুক-সমান একটা গর্তে পড়ে গেল টার্জন। বেরিয়ে আসবার আগেই বরফ-ঠাণ্ডা কতকগুলো হাত তার পা দুটো চেপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ভূগর্ভস্থ অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে।

[১৬]

Q-220 বিমানখানা বিরাট শরীরটা নিয়ে তখনও পেল্যুসিডারের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি মেলেও বিমানের আরোহীরা বিরাট বিরাট ডায়নোসর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। বিমানের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে অতিকায় প্রাণীদের কেউ কেউ মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাচ্ছিল, কেউ বা গোদা গোদা পা ফেলে থপথপ করে চক্রাকারে ঘুরছিল, কেউ শত্রু ভেবে বিমানের ছায়াটাকেই আক্রমণ করে বসেছিল।

হাইন্‌স এসব দেখেশুনে হেসে উঠত। বলত, 'চেহারা বিরাট হলে কি হবে—ঘটে এদের বুদ্ধি নেই এক ফোঁটা।'

কেউ জানতে চাইত, 'এদের নাম কি?'

হাইন্‌স উত্তর দিত, 'ট্রাইসেরাটপ্‌স।'

কেউ বলত, 'ফিরে যাবার সময় বরং অন্য কোন প্রাণীর বাচ্চা ধরে নিয়ে যাব, তবু এদের বাচ্চা নেব না—স্বেচ্ছায় ধরা দিলেও না।'

হাইন্‌স উত্তর দিত, 'আগে ফিরে যাবার সুযোগ আসুক, তারপর বলবে ও-কথা। দলের একটা বড় অংশই এখনো নিপাত্তা। তাদের না নিয়ে কি ফেরা যাবে মনে করো?'

দূর পর্বতমালা থেকে একটা নদী বয়ে চলেছিল নিচের দিকে। নদীর পাড়েই মনুষ্য বসতির সম্ভাবনা বেশী। যদি কাউকে পাওয়া যায়, নদীর ধারেই পাওয়া যাবে। একথা চিন্তা করেই বিমানখানা এগিয়ে চলল নদী বরাবর।

চওড়ায় বেড়ে চলল নদী। ওপরের কেবিন থেকে ডোর্ফ ফোন করল ক্যাপ্টেনকে। নিচের কেবিনেই বসে ছিল ক্যাপ্টেন। ডোর্ফ বলল, 'দূরে নদীর আকার যে-রকম বেড়ে গেছে, তাতে মনে হয়, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র দেখতে পাব। বিশাল জলরাশি দেখে অন্ততঃ সমুদ্রের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।'

কথাটা যে অমূলক নয়, প্রত্যেকেই সেটা উপলব্ধি করল। বিমানে মাংসের সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। আর কতদূর পাড়ি দিতে হবে তারও কোন ঠিক নেই। তাই নেমে এল বিমানখানা। সবাই একবাক্যে স্বীকার

করল, জায়গাটা খুব সুন্দর। ঘাসে ঢাকা সবুজ মাঠ। অদূরেই বন। এপাশে নদী। দূরে দিগন্তবিস্তৃত উত্তাল সমুদ্র। আর কি চাই।

একজন নিগ্রো পাচক রান্নাবান্নার ঝামেলা সেরে এক ফাঁকে নোটবইতে লিখে রাখল: আজ কত তারিখ জানি না। জুন মাসের এক খরখরে দুপুরে প্যেলু-সিডারে এসে নেমেছিলাম আমরা। আজও সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল না। এখানকার দিন যদি এত বড় হয়, রাত না জানি আরও কত বড়। জ্যাসন গ্রিডলের কোন খোঁজখবর নেই। তিনি এখন কোথায় কি করছেন কে জানে।...

নিগ্রো পাচক জানতে না পারলেও জ্যাসন গ্রিডলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল, সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজটা কম কষ্টসাধ্য নয়! তবু বিরাট একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলেছে তারা। এত বিরাট যে, সাপ-মানুষেরা হাজিরা দিতে এলে যথাসময়ে আর সুড়ঙ্গের মুখে পৌছনো যাবে না। পৌছতে না পারলেই তাদের কীর্তিকলাপ ধরা পড়ে যাবে। পরিণামে মৃত্যু অনিবার্য। তাই দ্রুত হাত চালাতে লাগল পাঁচজনে।

এমন সময় বন্দুকের শব্দ শুনে চমকে উঠল গ্রিডলে। প্রথমে মনের ভুল ভেবে শব্দটাকে বিশেষ আমল দেয় নি। কিন্তু পরপর অনেকগুলো শব্দ শোনা যেতেই শব্দের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা চলল মনের মধ্যে। সবচেয়ে আগে নিজের দলবলের কথা মনে হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তাদের উপস্থিতির সম্ভাবনা এক কথায় নাকচ করে দিল সে। গ্রিডলে ভাবল, এরা লাজোর দলবল না হয়ে যায় না। লাজোর মুখেই শুনেছিল সে, সমুদ্রের ধারে নোঙর করা আছে তাদের বিরাট জাহাজখানা লাজো এবং তার সাথীদের ফিরতে এত বিলম্ব হওয়ায় জাহাজের ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই তাদের খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। জাতে জলদস্যু এরা। হিংস্রতায় সাপ-মানুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়! তাদের হাতে পড়া মানেই উত্তপ্ত কড়াই থেকে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। তাই বিশেষ উৎসাহ বোধ করল না গ্রিডলে।

তবু সে সমান উৎসাহে মাটি খুঁড়ে চলল। বন্দুকের শব্দ কয়েক মিনিটের বেশী স্থায়ী হল না। কিন্তু শব্দ একেবারে থেমেও গেল না। কতকগুলি দ্রুতধাবমান গুরুগম্ভীর পদশব্দ ক্রমেই বেড়ে চলল। মনে হল, সুড়ঙ্গের ওপরকার মাটি কাঁপিয়ে গায়ে-গতরে বিরাট কতকগুলো প্রাণী যেন চলে যাচ্ছে ঠিক মাথার ওপর দিয়ে। হঠাৎ আরো একটা গুলির শব্দ। তারপর কোন অতিকায়

প্রাণীর সশব্দে পতন। সুড়ঙ্গটা যেন কেঁপে উঠল সেই পতনের দমকে। শেষে সুড়ঙ্গের ওপরকার মাটি ধ্বসে যেতেই কি যেন একটা এসে পড়ল গ্রিডলের ঘাড়ে।

সাপ-মানুষদের ভয়ে গ্রিডলের মন সারাক্ষণই ভারাক্রান্ত ছিল। যে-কেউ সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করবে তাকেই বেমালুম গুমখুন করে ফেলতে হবে। না হলে নিজেদের ফন্দি-ফিকির জাহির হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই আত্মরক্ষার তাগিদেই প্রাণীটাকে সে টেনে নিয়ে চলেছিল সুড়ঙ্গের ভেতরে। অথচ দুজনের কেউ-ই জানত না যে একে অপরের বন্ধু।

কিছুদূর হিড়হিড় করে টেনে নেবার পর টার্জনের হাতের বন্দুক সুড়ঙ্গের দুদিকের দেয়ালে আটকে গেল। শত চেষ্টা করেও গ্রিডলে আর এক চুলও টেনে নিতে পারল না টার্জনকে। গ্রিডলের সাথে আর চারজন লোকও যোগ দিল। কিন্তু সবই বৃথা।

ধরবার মত জুতসই একটা অবলম্বন পেয়েই টার্জন তার শক্তির পরিচয় দিল। ওদের টেনে নামাবার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করে ধীরে ধীরে টার্জন এগিয়ে চলল সুড়ঙ্গের ওপরদিকে।

গ্রিডলে ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে, যাকে ধরা হয়েছে সে সাপ-মানুষ নয়। কারণ, তার গা এবং হাত-পায়ের চামড়া মানুষেরই মত মসৃণ। সে যেই হোক, তাকে যেতে দেওয়া হবে না।

সাপ-মানুষটা এদিকে আশঙ্কা করেছিল, জানাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য টার্জন তার দিকেই আসবে। টার্জনকে হঠাৎ মাটির তলায় অদৃশ্য হতে দেখে দারুন হকচকিয়ে গেল সে। কিন্তু অনুসন্ধান করবার মনোবৃত্তি তখন তার নেই। তাই জানাকে টেনে নিয়ে নিজের আস্তানার দিকেই চলল।

সুড়ঙ্গের বাইরে মাথা তুলেই টার্জন এক নজর শুধু দেখতে পেল জানাকে। তারপরই জানা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনও টার্জন বেরোতে পারেনি সুড়ঙ্গ থেকে। লোকগুলো তখনো তাকে জাপটিয়ে ধরে আছে। অথচ, আর সামান্য দেরী হলেই জানা হয়ত চিরকালের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

একটা পা কোনক্রমে ছাড়িয়ে নিয়ে মোক্ষম এক লাথি মেরে বসল টার্জন। লোকগুলো এক লাথিতেই ছিটকে গিয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতরে। আর কোন বাধা রইল না জানাকে অনুসরণ করবার।

নিজের সাথীদের উঠে আসতে বলে গ্রিডলে আগেই লাফিয়ে উঠল গর্তের বাইরে। প্রায়ান্ধকার বন্য পরিবেশে টার্জনের সুপরিচিত দেহটা মিলিয়ে যেতে দেখেই আনন্দে ডগমগ হল গ্রিডলের অন্তর। কিন্তু এটাই বা কি করে সম্ভব! থোর তো টার্জনকে থিপডারের কবলে পড়তে দেখেছে। এ লোকটা কি তাহলে টার্জন নয়—অন্য কেউ? যেই হোক না কেন, এত তাড়া কিসের লোকটার? লোকটা কি পালিয়ে যাচ্ছে, না কাউকে অনুসরণ করছে? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন জট পাকিয়ে গেল গ্রিডলের মগজে। কোন প্রশ্নেরই সমাধান করতে না পেরে ভাবল, এর সবচেয়ে বড় পরিচয়—এ হচ্ছে মানুষ। আর মানুষ যখন, নিশ্চয়ই সাপ-মানুদের শত্রু সে। তাই এরই পক্ষ নিতে হবে তাকে। যেই না একথা ভাবা, অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে।

টার্জনের সবচেয়ে বড় সম্বল উন্নত নাসিকা। এর সাহায্যে বুঝতে পারে না হেন গন্ধ নেই। প্রকৃতিদত্ত এই ক্ষমতা বলেই ধরে ফেলল, জোরামের মেয়েকে কোনদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাছের ঝুরি অবলম্বন করে অকুস্থলে পৌঁছতেও বিশেষ বেগ পেতে হল না।

তারপর শুরু হল গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। জানার ভয় ছিল, ন-ফিট লম্বা সাপ-মানুষটার সাথে টার্জন এঁটে উঠতে পারবে কি-না। তার ভয় ক্রমে বিস্ময়ে পরিণত হল যখন দেখল, সাপ-মানুষটাকে কুপোকাৎ করতে টার্জনের মোটেই বেগ পেতে হল না। শুধু তাই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর পা দুটো ধরে টার্জন তাকে শূন্যে ঘোরাতে লাগল চরকিবাজির মত। শেষে প্রচণ্ড এক আছাড় মারল মাটিতে।

সাপ-মানুষটা যে মরে গেছে সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে মৃতের বল্লম আর পাথরের ছুরি কুড়িয়ে নিল টার্জন। বিস্ময়-বিমূঢ় জানা কাছেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বলল, 'চলো, গাছের ওপরে উঠে যাই। সাপ-মানুষেরা দঙ্গল বেঁধে এখানে হাজির হবে মনে হচ্ছে। এখন কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকতে হবে।'

টার্জনের নির্দেশমত জানা তার পিঠে চেপে হাতে পায়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। জানাকে পিঠে নিয়ে টার্জন উঠে গেল গাছের সর্বোচ্চ ডালে।

জানা বলল, 'আমি মনে করতাম, আমার দেশের লোকদের মত সুদক্ষ যোদ্ধা বুঝি আর হয় না। তোমাকে আর গ্রিডলেকে দেখে আমার সেই ভুল ভেঙে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে চলল, 'গ্রিডলে যদি বেঁচে থাকত কতই না ভাল হত। জোরামের লোকেরা মেয়েদের ওপর খারাপ ব্যবহার করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। তবু বলব, গ্রিডলের মত লোক আর হয় না। কিসে আমি খুশী হব সবসময়ই তার সেই চেষ্টা ছিল। আমি যাতে বিপদে না পড়ি, আমি যাতে নির্বিঘ্নে দেশে ফিরতে পারি, তার জন্য কতই না সতর্কতা।'

টার্জন হাসল, 'তুমি তাঁকে ভালবেসে ফেলেছ দেখছি।'

জানা কোন উত্তর দিল না। দুচোখ জলে ভরে গেল তার।

পথ পরিষ্কার। সাপ-মানুষদের কোন চিহ্নই নেই। টার্জন বলল, 'আর কোন বাধা নেই—চলো, এগিয়ে যাই।'

আবার জানাকে পিঠে নিয়ে ঝুলে ঝুলে এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাওয়া, জানার অফুরন্ত আনন্দ। টার্জনের নির্বিকার ঔদাসীন্য।

কিন্তু বেশীদূর যাওয়া হল না তাদের। বনের নীরবতা ভেদ করে একটা পদশব্দ জেগে উঠতেই লতাপাতায় ছাওয়া গাছের ডালে লুকিয়ে পড়ল দুজনে। কারণ, বনের সব প্রাণীই যেমন শত্রু নয়, সব পদশব্দও তেমনি বন্ধুর নয়।

পদশব্দের মালিককে কিন্তু চিনি চিনি করেও চিনতে পারল না তারা। মানুষেরই কাঠামো। সারাদেহে কাদার পুরু আস্তরণ। একখণ্ড চামড়া দিয়ে নগ্নতা ঢাকা হয়েছে মাত্র। চামড়াটাও জলে-কাদায় দেহের সাথে লেপ্‌টে গেছে। দেহের আসল রং কাদার আড়ালে লুকিয়ে আছে। মাথায় ঝাকড়া-মাকড়া চুল। হাতে কোন অস্ত্র নেই।

পরিচয় জানবার জন্য টার্জন একাকী ঝুপ করে তার সামনে নেমে আসতেই খুশীর আবেশে চেঁচিয়ে উঠল আগন্তুক, 'টার্জন! আপনি তাহলে সত্যি বেঁচে আছেন!'

গলার স্বর শুনে টার্জনেরও চিনতে বিলম্ব হল না লোকটিকে। বলল, 'গ্রিডলে! আপনি তাহলে মারা যান নি? এদিকে জানা আপনার জন্য ভেবে ভেবে সারা।'

এতটা আশা করেনি গ্রিডলে। কণ্ঠে চড়ামাত্রায় বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলে উঠল, 'আপনি জানাকেও চেনেন দেখছি। কোথায় দেখেছেন তাকে? কোথায় সে?'

'অতটা উতলা হবেন না। জানা আমার সাথেই আছে।'

স্থান-কাল-পরিবেশ সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠল গ্রিডলে, 'জানা! কোথায় তুমি? সাড়া দাও।'

সেই মুহূর্তে জানা কোন উত্তর দিতে পারল না। দু-গাল বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। প্রবল অনুরাগে বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল তার।

কিছুটা সামলে নিয়ে লতাপাতার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল জানা, 'তুমি পাষাণ! তুমি নিঠুর! তুমি—।'

টার্জন বুঝল, এসব ভাবাবেগের মধ্যে তার মাথা গলানো ঠিক হবে না। নিঃশব্দে স্থানান্তরে যাবার উদ্যোগ করতেই নিগ্রো যোদ্ধাদের সাথে কাদের যেন তীব্র বাদানুবাদের আওয়াজ পাওয়া গেল। দৃশ্যটা হাস্যকর সন্দেহ নেই। কিন্তু টার্জন সময়মত সেখানে না পৌঁছলে শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা হতে বিশেষ বিলম্ব হত না।

টার্জন দেখল, পেল্যুসিডারের লোক চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে নিগ্রো যোদ্ধারা। উভয় দলের কেউ-ই দমবার পাত্র নয়। নিগ্রোরাও ছাড়বে না, আর ওরাও বশ্যতা মেনে নেবে না। এদের কথা ওরা বোঝে না, আবার ওদের কথা এরাও বোঝে না। নিগ্রো যোদ্ধারা ভেবেছে, টার্জনের অন্তর্ধানের জন্য থোর এবং লাজোর দলবল দায়ী। আবার থোর এবং লাজো মনে করছে, গ্রিডলেকে খতম করে দিয়েছে নিগ্রো যোদ্ধারাই।

টার্জন, গ্রিডলে এবং জানাকে দেখে সমস্ত বাদ-বিসম্বাদের মিটমাট হয়ে গেল। টার্জনকে জীবিত দেখে থোর বিস্মিত হল। থোরকে পেয়ে জানা অভিভূত হল। জানা ছুটে গিয়ে আবদ্ধ হল থোরের বাহুবন্ধনে। নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে গ্রিডলে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ক্ষুদে বর্বর মেয়েটির ভালবাসার স্বরূপ। থোর তার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু সভ্যতার মাপকাঠিতে গ্রিডলের তুলনায় বহু পিছিয়ে আছে সে। থোরের প্রতি জানার এমন গভীর প্রীতি দেখে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল জ্যাসন গ্রিডলে।

নিগ্রো যোদ্ধাদের সাথে পেল্যুসিডারের লোকেরা শীগ্‌গিরই ভাব জমিয়ে ফেলল। টার্জনই অবশ্য মধ্যস্থতা করল এ-ব্যাপারে।

লাজোর দেশের নাম কোর্সার। পেল্যুসিডারের প্রথম সম্রাট্ ডেভিড ইন্‌স সেখানেই বন্দী হয়ে আছেন। তাকে উদ্ধার করতেই গ্রিডলে এবং টার্জনের আগমন এই অজানা জগতে। অথচ, এই ডামাডোলের মধ্যে সেই

আসল উদ্দেশ্যই ভুলে বসেছে তারা। লাজো এদের অভিপ্রায় জানতে পারলে কিছুতেই নিজের দেশে নিয়ে যাবে না। তাছাড়া, 0-220 বিমানখানা খুঁজে না পেলে এই সুদীর্ঘ সমুদ্র-পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে যাওয়াও মুশকিল। যাই হোক, লাজোর নৌকোতে করেই সমুদ্রের দিকে যাওয়া স্থির হল।

থোর এবং জানাকে সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না টার্জনের। কারণ, এখন তারা ক্রমেই জোরাম থেকে দূরে চলে যাবে। অথচ, তাদের একা ছেড়ে দিতেও ভরসা পাওয়া যায় না। একা যাত্রা করলে কোনদিনই হয়ত জোরামে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না তারা। বরং বিমানখানা খুঁজে পেলে জোরামে পৌঁছে দিতে তাদের অসুবিধে হবে না।

থোর হঠাৎ বলে উঠল, 'দাঁড়াও, আমার একটা প্রশ্ন করবার আছে।

তারপর জানার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'গ্রিডলে তোমার কোন ক্ষতি করে নি তো?'

অধোবদনে উত্তর দিল জানা, 'ক্ষতি করলে আমিই কি তাকে ছেড়ে দিতাম।'

'বেশ, শুনে সুখী হলাম।'

লাজোর বিরাট নৌকোটাকে যথাস্থানেই পাওয়া গেল। বনপর্ব শেষ হয়ে শুরু হল নদীপর্ব। দলের সদস্য সংখ্যা কম নয়—সতেরোজন। দশজন নিগ্রো যোদ্ধা, লাজো আর তার দুজন সাথী, থোর এবং তার বোন জানা, টার্জন এবং গ্রিডলে।

সারা পথ জানাকে এড়িয়ে চলেছে গ্রিডলে। থোরের সাথে জানার কি সম্পর্ক একথা এখনো সে জানে না। তাই জোরামের রূপসী মেয়েকে ভুল বুঝে বসে আছে। নদীবক্ষ ভেদ করে যত এগিয়ে চলল তাদের নৌকো, ততই গ্রিডলের মনে পড়ে গেল পিছু-ফেলে-আসা বিভীষিকাময় অভিযানের কথা। জানার সাথে প্রথম পরিচয়, ভাব জমানো, বিচ্ছেদ, পুনর্মিলন, সব একে একে স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল। জানার সাথে দৈহিক ব্যবধান এখন কয়েক হাত মাত্র, কিন্তু মনের ব্যবধান কয়েক সহস্র যোজন।

এখন আর নদীর একূল-ওকূল দেখা যায় না। স্রোতে দেখেই শুধু বোঝা যায়, এখনো তারা সমুদ্রে পড়েনি। লাজো বলল, তাদের জাহাজ নাকি তাদের ফেলেই দেশে ফিরে গেছে। দেশে ফিরতে হলে দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করে যেতে হবে তাদের। কিন্তু এই নৌকোর পক্ষে সেটা সম্ভব হবে কি-না যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এবার দীর্ঘ সমুদ্র-পথ পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি দরকার। একটা ছোট্ট দ্বীপে নামা হল। শিকার করা হল। মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে শুকিয়ে নেওয়া হল। ব্লাডারে জমা করা হল প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু জল। নৌকোতে পাল খাটানো হল। তারপর নৌকো খুলে দেওয়া হল ঊর্মিমুখর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে।

গ্রিডলেকে প্রথম জীবিত দেখে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল জানার। এখন আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। হয়ত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনে কাজ করে যাচ্ছে। তবু জানার হাবভাব দেখে বোঝার উপায় নেই যে তার প্রেমাস্পদ তার পাশেই আছে।

এত ঔদাসীন্য সহ্য হল না গ্রিডলের। একবার সে বলেই বসল, 'আমাকে এত এড়িয়ে চলছ কেন, জানা? আমার কি পরস্পরের কাছে আরো সহজ হয়ে উঠতে পারি না? আমার মনে হয়, তাতে আমরা আরো বেশী সুখী হব।'

জানা হেসে উত্তর দিল, 'আমি সুখী নয় তোমাকে কে বলল? জোরামে ফিরে যাওয়ার আগে এই সুখে ভাঁটা পড়বে বলে তো মনে হয় না।'

[১৭]

0-220 বিমানের আরোহীরা তখন ধৈর্যের চরম সীমায় এসে গেছে। অনন্তকাল ধরে আকাশে চক্কর খাওয়া বরদাস্ত করবে না তারা। ফুয়েল বা জ্বালানীর যত বিপুল সঞ্চয়ই থাক না কেন, এক সময়ে সেটা শেষ হয়ে যাবেই। তখন দলের লোকদেরও আর খুঁজে বের করা যাবে না এবং নিজেরাও ফিরতে পারবে না ওপরের পৃথিবীতে। ফলে পেল্যুসিডারের এই প্রাগৈতিহাসিক আমলের প্রাণীদের সাথেই বনিবনা করে থাকতে হবে তাদের। বহুদিন তারা ঘর ছাড়া হয়ে আছে। বহুদিন তারা প্রিয়াসঙ্গ থেকে বঞ্চিত। আর দেরী করা যায় না। সমুদ্রটা একবার দেখে নিয়েই ফিরে যাবে তারা।

এদিকে টার্জনের নৌকো যখন মাঝ দরিয়ায়, তখন ঝড় উঠল। অদ্ভুত ঝড়। আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই, বাতাসে এক ছিঁটে বৃষ্টি নেই, বিদ্যুতের সঘন চমক নেই, তবু ঝড়। বাতাসের সাথে সমুদ্রজলের সে কি উথালি-পাথালি নৃত্য! যেন স্বয়ং নটরাজ ভারতনাট্যম্ শুরু করে দিয়েছেন।

প্রমাদ গণল টার্জন। নৌকোর প্রতিটি লোক যে-যার আসনে পাথরের

মূর্তির মতই বসে রইল। নৌকো সমুদ্রবক্ষ চিরে কোথায় ভেসে চলল কে জানে।

জ্যাসন গ্রিডলে জানার পাশেই বসে ছিল। মৃত্যুকে সে ভয় করে না ঠিকই। কিন্তু নিজের মনের কথা জানাকে না বলা পর্যন্ত মরেও তৃপ্তি পাবে না সে। একথা ভেবেই জানাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, 'শোন জানা, না-বলা কথায় বুক ভারী হয়ে আছে আমার। এখন যদি না বলি আর সময়ও পাব না বলার। তুমি আমাকে ভালবাস কি-না জানি না, কিন্তু আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়েই তোমাকে ভালবাসি।'

উত্তর শোনবার প্রতীক্ষা না করেই সরে এল গ্রিডলে। বুঝল, কাজটা তার ভাল হল না। জানা হয়ত রেগে গেল কথাটা শুনে। তাছাড়া, অপরের প্রিয়তমাকে ভালবাসার মন্ত্র শোনানো মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়। থোর জানতে পারলে হয়ত হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসবে। পরক্ষণেই মনকে এই বলে প্রবোধ দিল যে, এই প্রলয়ঙ্কর তুফান থেকে রেহাই পেলেই না সে-ভয়।

কিন্তু তুফান থেমে গেল। অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও প্রতিটি লোকই বেঁচে রইল বহাল-তবিয়তে। উপরন্তু ফল হল এই যে তিনদিনের পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করল তারা। আর তখনই জানা চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই, ওটা কি?'

সবার দৃষ্টি একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেদিকে। টার্জন দেখেই চিনল—পালতোলা যুদ্ধজাহাজ। একটা নয়, দুটো নয়—অনেকগুলি।

লাজো বলল, 'ওগুলো আমাদের দেশের যুদ্ধজাহাজ নয়।'

টার্জন একথাই শুনতে চাইছিল। লাজোর দেশের যখন নয়, তখন ডেভিড ইন্‌স-এর দলেরই হবে। কারণ, তার দল ছাড়া ছাড়া এ-ধাঁচের জাহাজ কে বানাবে? লাজোকে এখনো জানতে দেওয়া হয় নি যে তাদের দেশের অন্ধ কারাগার থেকে ডেভিড্ ইন্‌স্-কে মুক্তি দেওয়ার জন্যই টার্জনের আগমন।

গ্রিডলে বলেছিল, 'জাহাজগুলো কোন জলদস্যু দ[illegible] তো হতে পারে। জলদস্যুরা আমাদের তোয়াক্কা করে কথা বলবে এ-ধারণা করাও অন্যায়। কামান দেগে হয়ত ডুবিয়েই দেবে আমাদের ভাল করতে না পারলেও মন্দ করবার লোকের তো অভাব হয় না।'

টার্জন উত্তর দিয়েছিল, 'যাদের জাহাজই হোক, এখন আর এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই নেই।– ধরা পড়তেই হবে।'

সেই ধরাই পড়তে হল। জাহাজ থেকে ঘোষণা করা হল, আত্মসমর্পণ না করলে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে নৌকোটাকে।

জ্যাসন গ্রিডলে জাহাজগুলোর পরিচয় জানতে চাইল।

যা আশা করেছিল তাই শুনতে পেল—ডেভিড ইন্‌স-এর জাহাজ।

গ্রিডলে নিজেদের পরিচয় দিল। সব কথা খুলে বলল সে। অ্যাব্‌নার পেরীর কাছ থেকে বেতার মারফত ডেভিড ইন্‌স-এর বিপদের কথা জানতে পেরে তাঁকে উদ্ধার করতেই যে তারা এসেছে, সে-কথাও জানাল।

এদের দুঃসাহস দেখে বিস্মিত হল জাহাজের লোকেরা।

টার্জন ভুল ভেঙে দিল তাদের। বলল, 'সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের শক্তি অমোঘ অব্যর্থ। আমাদের বিমানখানা একবার খুঁজে বের করি, তখন দেখবে আমাদের কথা সত্যি কি-না। আমাদের কাছে এমন সব অস্ত্র আছে যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

অনেক কথা কাটাকাটি করবার পর নৌকোর সতেরোজন যাত্রীকে বরণ করে নেওয়া হল জাহাজের ভেতর। জাহাজগুলো চলেছিল কোর্সার রাজ্যের দিকে। সে-দেশের সাথে যুদ্ধ করে প্রিয় সম্রাট্‌কে মুক্ত করে আনবে সম্রাটের অনুগত সৈন্য সৈন্যসামন্ত। লাজোও স্বীকার করল, এই বিরাট নৌবহরের সামনে তাদের দেশ তাসের ঘরের মত তছনছ হয়ে যাবে।

জাহাজের ডেকে বসে টার্জন নিজের রোমাঞ্চকর অভিযানের কথাই বলছিল। উৎসাহী মাঝিমাল্লারা উন্মুখ হয়ে শুনছিল তার কথা। এমন সময় সোরগোল উঠল সমস্ত জাহাজে। গল্প শোনার জন্য টার্জনকে যারা ছেঁকে ধরেছিল তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। কামানের মুখ আকাশের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। হাতে হাতে তৈরী হয়ে রইল বন্দুক। কারণ অনুসন্ধানে ওপরদিকে তাকাতেই হর্ষবিষাদে আপ্লুত হল টার্জনের অন্তর। অতিকায় পাখি ভেবে যেটাকে তাক করা হচ্ছে, আসলে সেটা তাদেরই সুপরিচিত O-220 বিমান!

ঝটিকাবেগে টার্জন গিয়ে হাজির হল জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরে। নক্ষত্র বেগে জাহাজ থেকে জাহাজে খবর চলে গেল। সবাই বুঝল, রাক্ষস-দানো কিছু নয়—আসলে ওটা হচ্ছে একটা আকাশযান। আর ওর ভেতরে যারা আছে তারা শত্রু নয়—মিত্র।

জ্যাসন গ্রিডলেও ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। বর্শার ফলায় একটা

রঙীন রুমাল বেঁধে সেটাকে বাতাসে হেলিয়ে দুলিয়ে সাংকেতিক ভাষায় নিজের বক্তব্যও জানিয়ে দিয়েছে বিমানটিকে। বিমানের প্রতিটি লোক জেনে গেছে —জাহাজের পরিচয় কি, জাহাজে কে কে আছে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি।

সমুদ্রবক্ষে বিমানখানা নেমে আসতেই সম্রাটের সম্মানার্থে পরস্পর একুশবার তোপধ্বনি করা হল সেখান থেকে। গ্রিডলে ক্যাপ্টেনকে তোপধ্বনির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিল। জাহাজ থেকে পাল্টা তোপধ্বনি করা হল।

এরপর ঘটনা এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে। বিমানের সবাই উঠে এল জাহাজে। আনুষঙ্গিক পরিচয় আদান-প্রদানের পালা সাঙ্গ হল। শত্রুদেশের লোক বলে মাজো এবং তার সঙ্গী দুজনকে শৃঙ্খলিত করা হল। টার্জন অবশ্য আশ্বাস দিল, কোনরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা হবে না তাদের ওপর।

জীবনে কখনো জাহাজ দেখেনি জানা। কচি খুকীর মত নেচেকুঁদে আশ মিটিয়ে দেখে চলল জাহাজের এলাহী কাণ্ডকারখানা। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, জাহাজখানা যেন তার নিজেরই সম্পত্তি।

গ্রিডলের মূর্তি এখন কর্মচঞ্চল। হাবভাব পোশাকে-আশাকে পুরো সাহেবীয়ানা। ক্ষণপূর্বের গ্রিডলেকে আর চেনাই যায় না। এ যেন তার আর এক রূপ।

দলের লোকজনের মধ্যে একজনকেই শুধু পাওয়া গেল না। সে হল ভন হোর্ষ্ট। এক ফোঁটা বিষাদই পুনর্মিলনের সমস্ত আনন্দকে মলিন করে দিল। কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না। অনেক কাজ বাকী এখনো। সম্রাটকে কোর্সার রাজ্য থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

বিস্তর শলা-পরামর্শ হল, যুক্তিনিষ্ঠ পরিকল্পনা হল। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য বিমানখানা আবার উঠল আকাশে। টার্জনের পুরো দলবল ছাড়াও বিমানে রইল থোর এবং জানা, লাজো এবং তার দুজন সঙ্গী।

টার্জন লাজোকে বলল, 'দেখো বাপু, তোমার দেশের লোকেরা এদের সম্রাট্‌কে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে। তাকে যদি ভালয় ভালয় ছেড়ে না হয়, তাহলে বুঝতেই পারছ, গতিক বিশেষ সুবিধে নয়। এই বিরাট নৌবহরেরও দরকার হবে না, আমাদের বিমানখানাই তোমাদের দেশটাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারবে। বোমার নাম শুনেছ? শোননি। সেই বোমাই আছে আমাদের বিমানে। এর যে কি ক্ষমতা সেটা তোমার মগজে ঢুকবে

না। তবে একের পর এক যখন পড়তে শুরু করবে, তখন বুঝতে পারবে কার নাম রাম আর কাকে বলে রহিম। ভাবছ, তোমাদের কামানের গোলা আমাদের বিমানটাতে লাগবে? আরে ছোঃ, বামন হয়ে কেউ চাঁদে হাত দিতে পারে নাকি? তাই বলছিলাম—।'

'আমাকে শুনিয়ে কি লাভ? আমাকে কি করতে হবে তাই বল।'

'সে-কথাই তো বলতে যাচ্ছি। তুমি গিয়ে তোমাদের রাজাকে বলবে সম্রাট্ ডেভিডকে তার নৌবহরে নিরাপদে পৌঁছে না দিলে তোমাদের দুর্ভাগ্য কেউ রুখে রাখতে পারবে না।'

'বেশ তাই বলব!'

সম্মতির অপেক্ষা না রেখে লাজোর দেহে প্যারাস্যুট লাগিয়ে দেওয়া হল।

টার্জন বলল, 'যখন ঝাঁপ দিতে বলা হবে তখনই ঝাঁপ দেবে।'

'কি? আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি?'

'না, মারা পড়বে না। তোমাকে মেরে আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। এতগুলো লোক নিয়ে আমরা যখন উড়ে যেতে পারি, তখন তোমাকে নির্বিঘ্নে নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের আছে। যদি কাপুরুষ না হও তাহলে ঝাঁপ দিতে অস্বীকার করবে না।'

'আচ্ছা বাবা, তোমাদের মর্জিই মেনে নিলাম।'

নিচে রাজার প্রাসাদে তখন কোন্ নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল কে জানে! তবে রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পিলপিল করে লোক বেরিয়ে এসেছিল খোলা জায়গায়। বিমানটার সম্বন্ধে তাদের হয়ত ভয়মিশ্রিত কৌতূহল ছিল। সেই কৌতূহল আরো বেড়ে গেল প্যারাস্যুটযোগে একটি মানুষকে নেমে আসতে দেখে রাজার চৈতন্যোদয় হওয়ায় সমস্ত ব্যাপারটার সুরাহা হয়ে গেল অচিরেই। দীর্ঘ কারাবাসের পর কালকুঠরী থেকে বেরিয়ে এলেন সম্রাট্ ডেভিড ইন্স। কৃশকায় দুর্বল দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি গিয়ে উঠলেন কোর্সার দেশেরই জাহাজে। তাঁকে নিয়ে জাহাজখানা সমুদ্রে অপেক্ষমান তাঁর নৌবহরের দিকেই ছুটে চলল। মাথার ওপরে 0-220 বিমানখানাও চলল সাথে সাথে।

অনভিজ্ঞ ক্ষুদে বর্বর মেয়েটি এসব দেখেশুনে বেজায় খুশী। নাম তার জানা, কিন্তু মানুষ যে সভ্যতার পথে এতদূর এগিয়ে গেছে, তার কিছুই জানা ছিল না তার। পাখির মত অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখত শৈশবে।

তার সেই স্বপ্ন যে বাস্তবে রূপায়িত হবে, একথা কল্পনাও করতে পারে নি সে। কি করে এত কিছু সম্ভব, জানতে ইচ্ছে হয় তার। মনের মত উত্তর দেবার একটিই লোক আছে। নাম তার গ্রিডলে। কিন্তু সে এত ব্যস্ত যে কাছেই ঘেঁষা যায় না তার।

টার্জন গ্রিডলেকে বলল, 'লাজোর সঙ্গী দুজনকেও নামিয়ে ছেয়া যাক। এবার আরো একটা কাজ আছে—জোরামে যেতে হবে। থোর এবং জানাকে নামিয়ে দিতে হবে সেখানে। তারপরই আমাদের অভিযান শেষ।'

'আপনাদের শেষ, কিন্তু আমার আরম্ভ।' গ্রিডলে উত্তর দিল।

'তার মানে? আপনি ফিরবেন না?'

'না। আমার উদ্যোগেই এই অভিযান। তাই ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত দায়দায়িত্বও আমার। ভন হোষ্টকে আমরা হারিয়েছি। তিনি হয়ত পেল্যু-সিডারের এই ভয়াবহ জঙ্গলে এখনো একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে না নিয়ে আমি ফিরব না।'

'কিন্তু আপনার একার পক্ষে কি ভন হোষ্টকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে?'

'একার পক্ষে সম্ভব হবে না ঠিকই, কিন্তু সম্রাট্ ইন্‌স-এর অনুগ্রহ পেলে তো সম্ভব হবে। আমাকে তাঁর জাহাজেই নামিয়ে দিন।'

নিজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিল গ্রিডলে। প্যারাস্যুট এঁটে নিল দেহে। একে একে সবার সাথে করমর্দন করে শেষে জানাকে বলল, 'বিদায় জানা! তুমি বরং একাই জোরামে ফিরে যাও। আমি আমার পথেই চললাম।'

মুখের ওপর জবাব দিল জানা, 'তোমার পথ আর আমার পথ আলাদা নাকি?'

থোর বাধা দিল, 'জানা, একি করতে যাচ্ছ?'

জানা বলল, 'দাদা, তুমি বরং একাই জোরামে ফিরে যাও। আমি গ্রিডলের সাথেই চললাম।'

গ্রিডলের সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে আচমকা কে যেন কষে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। হাঁ করে সে তাকিয়ে রইল জানার মুখের পানে। থোর যে তার ভাই একথা মুখ ফুটে বলে নি কেন জানা? পরে ভাবল, বলবার সুযোগই বা পেল কোথায়।

টার্জন দেখল, ছত্রাকারে ছড়ানো প্যারাস্যুট দুটো গ্রিডলে আর জানাকে নিয়ে হেলে-দুলে জাহাজের পাটাতনের দিকে নেমে যেতে যেতে হঠাৎ জড়িয়ে গেল। জানাকে বলতে শোনা গেল, 'হেই, জলে ডুবে মরবার ইচ্ছে আছে নাকি?'

উত্তর হল, 'ক্ষতি কি, তোমাকে নিয়ে না হয় জলের তলায়ই বাসা বাঁধব।'

'বেশ, তাই হোক।'

ঈশ্বর কি আছেন ?···

পৃথিবী এখন তিনহাজার আলোক বর্ষ দূরে।···

এক সময়ে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতুম, ভগবান আছেন। মহাকাশ বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন, ভগবান থাকবেন। বিশ্বরহস্যের কণা মাত্র গৌরবও আমরা মুছে ফেলতে পারবো না আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রগতি দিয়ে।

কিন্তু আজ ? আজ সন্দেহ জাগছে দেয়ালে মার্ক VI কম্পিউটারের নীচে ঝোলানো ঐ ক্রুশটা সত্যই একটা ফাঁপা প্রতীক কিনা। সন্দেহ জাগছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে।

এখনও কাউকে বলিনি সে কথা। কিন্তু আর লুকিয়েও রাখা যাবে না। অগণিত মাইল দীর্ঘ ম্যাগনেটিক টেপ আর হাজার হাজার ফটোগ্রাফের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে সে সব তথ্য। এ সবই পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে চলেছি আমরা। তারপর ? যে কোন বিজ্ঞানী আমার মতই নিমেষে জেনে ফেলবে সেই পরম সত্যকে—যা আমি এতদিন ধরে সযত্নে গোপন করেছি ফিতে, ছবি আর আমার মগজের মধ্যে।

সঙ্গীরা এর মধ্যেই বেশ খানিকটা দমে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের এই পরিহাস ওরা কি ভাবে নেবে জানি না। ওদের অনেকেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা চলে ওদের মধ্যে। ছিলুম পাদরী। হয়েছি চীফ অ্যাসট্রোফিজিসিষ্ট। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমাকে কুপোকাৎ করার যে অস্ত্র ওরা দুদিন বাদে হাতে পাবে—তা নিয়ে পুলকিত হতে পারবে না কেউই।

ডক্টর স্যাণ্ডার পয়লা নম্বরের নাস্তিক, ভদ্রলোক কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে আমি একজন পাদরী। মাঝে মাঝে অবজারভেসন ডেকে আমার পাশে এসে দাঁড়ান ডক্টর। আলো এখানে ক্ষীণ—তাই চারপাশে হীরক কুঁচির মতই ঝিকমিক করতে থাকে অগণিত তারকা। নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়ান উনি। ডিমের আকারে তৈরী বিরাট পোর্ট দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহাকাশের পানে—আর খুব আস্তে আস্তে ঘুরপাক খেতে খেতে পেছনে সরে থাকে যেতে অজস্র চুমকি বসানো মহাকাশপথ।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বলেন ডক্টর স্যাণ্ডার—"ফাদার, হয়তো এসবই কারোর সৃষ্টি। কিন্তু বলতে পারেন কেন এই সৃষ্টি, আর কেনই বা তার ধ্বংস? সৃষ্টিকর্তার স্বার্থ কি এতে?" সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যায় তর্ক। আর, অবজারভেসন পোর্টের নিখুঁতভাবে পরিষ্কার প্ল্যাষ্টিকের ওপরে সীমাহীন রেখায় নিঃশব্দে ঘুরতে থাকে নক্ষত্র আর নীহারিকার রাশি।

জানি না নীহারিকার এরকম অদ্ভুত নাম কে দিয়েছে। এরকম বাজে নাম আমি আর শুনি নি। এ নামের মধ্যে যদি কোনো ভবিষ্যদবাণী লুকিয়ে থাকে, তবে তার সভ্যতা যাচাই করতে কয়েক কোটি বছর কেটে যাবে। তাছাড়া নীহারিকা শব্দটিও বেখাপ্পা। সারা ছায়াপথ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কুয়াশার অকল্পনীয় মেঘ—জন্মের আগে নক্ষত্রসমূহের উপাদান মিশ্রণ—তাদের তুলনায় অনেক ছোট এই নীহারিকারা। আর, মহাজাগতিক মাপকাঠিতে বাস্তবিকই ফিনিক্স নীহারিকা তো একেবারেই পুঁচকে বস্তু—ফাঁপা গ্যাসের মোড়কে একটি মাত্র নক্ষত্র।

অথবা একটি নক্ষত্রের অবশিষ্ট.....

পৃথিবী ছেড়ে রওনা হয়েছিলুম এই ফিনিক্স নীহারিকা অভিমুখে। সার্থক হয়েছে আমাদের অভিযান। আজ আমরা ফিরে চলেছি জ্ঞানের স্তূপ নিয়ে। কিন্তু আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম, যদি এখুনি এই স্তূপ নামিয়ে দিতে পারতুম কাঁধ থেকে।

ঈশ্বর, তুমি কি আছো? আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি, তারপর তো আর বিশ্বাস করা যায় না তোমার অস্তিত্বে?

ফিনিক্স নীহারিকা আগে কি ছিল তা আমরা জানি। প্রত্যেক বছর শুধু আমাদের ছায়াপথেই যত নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটে তাদের সংখ্যা একশোরও বেশী। বিস্ফোরণের পর কয়েক ঘণ্টার জন্যে প্রচণ্ড তেজে জ্বলতে থাকে

তাদের ফেটে পড়া দেহ, কখন কখন দিনের পর দিন কেটে যায় এই অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি কমে আসতে।

স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের বহুহাজার গুণ বেশী এই দীপ্তি। তারপর তা নিভে যায় ধীরে ধীরে, আসে মৃত্যু। অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এ তো নিয়মিত দুর্ঘটনা। চাঁদের মানমন্দিরে কাজ করাও সময়ে এরকম ডজন খানেক নোভার স্পেকট্রোগ্রাম আর আলোক বৃত্তের রেকর্ড রেখেছি আমি।

কিন্তু প্রতি হাজার বছরে বার তিন চারের জন্যে এর চাইতেও ভয়াবহ যে কাণ্ড ঘটে এই ব্রহ্মাণ্ডে, তার কাছে নোভাও নিতান্ত তুচ্ছ।

কোনো নক্ষত্র যখন সুপার নোভা হয়ে দাঁড়ায়, তখন যে কোন ছায়াপথের সব কটা সূর্য এক করলেও হার মেনে যায় তার তেজের কাছে। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে চীনে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন—কি যে হোলো কিছুই বুঝতে পারেননি। পাঁচশো বছর পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ক্যাসিওপিয়াতে একটা সুপারনোভা এমন তেজে জ্বলে উঠেছিল যে দিনের আলোতেও তা দেখতে অসুবিধে হয়নি। এরপরের হাজার বছরে এরকম আরও তিনটি সুপারনোভা দেখা গিয়েছে।

আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এই রকমই একটা বিপর্যয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসা। বিপর্যয়ের কারণ কি এবং কোন্ কোন্ চমকপ্রদ ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপে এহেন বিস্ফোরণ—তা জেনে আসা। দীর্ঘ ছহাজার বছর আগে বিস্ফোরিত গ্যাসের গোলকের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলুম আমরা। একটা গোলকের বাইরে আর একটা গোলক, তার বাইরে আর একটা—ফাঁপা খোলসের মত এইভাবে পর পর সাজানো গ্যাসের স্তর। ছহাজার বছর আগে বিস্ফোরণের সময়ে এইভাবেই তা বিক্ষিপ্ত হয়েছিল একই কেন্দ্র থেকে—আজও বিরাম নেই তার ছড়িয়ে পড়ার। সত্যিই বিস্ময়কর। ভীষণ উত্তপ্ত এই গ্যাসের ফাঁপা গোলক থেকে আজও ছিটকে আসছিল চোখ ধাঁধানো ভয়ংকর বেগুণী আলো। কিন্তু তা এতই সূক্ষ্ম যে মোটেই ক্ষতিকর নয় আমাদের পক্ষে। ফেটে পড়ার সময়ে নক্ষত্রের বাইরের স্তরগুলো এমন প্রচণ্ড বেগে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, মাধ্যাকর্ষণের আওতা ছাড়িয়ে তা ছিটকে গিয়েছিল মহাকাশের সুদূর অংশে। এখন এইগুলোই বিরাট একটা ফাঁপা খোলসের সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে একটা নয়, একহাজার সৌরজগত সেঁধিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। ঠিক কেন্দ্রে দাউ দাউ করে জ্বলছিল একটা

ক্ষুদে বস্তু—এক সময়ে যা নক্ষত্র নামে পরিচিত ছিল—ছোট্ট এই শ্বেতপিণ্ড আকারে আমাদের পৃথিবীর চাইতে অনেক পুঁচকে হলেও ওজনে তার চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী ভারী! অতিবড় দুঃস্বপ্নেও যা ভাবা যায় না—তাই!

আমাদের চারপাশে ঘিরেছিল প্রদীপ্ত গ্যাসের সেল—প্রখর আলোয় দুই তারকার মধ্যবর্তী মহাকাশের স্বাভাবিক রাত্রি উধাও হয়েছিল ছহাজার বছর আগেই। আমরা উড়ে চলেছিলুম মহাজাগতিক বোমার ঠিক কেন্দ্রে—বহু বছর আগে শুরু যার প্রথম বিস্ফোরণ ক্রিয়া—যার জ্বলন্ত আলোকময় টুকরোগুলো এখনও কল্পনায় আনা যায় না এমন বেগে ধেয়ে চলেছে দিগ্‌বিদিকে। কোটি কোটি মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যে বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া—তাদের গতিশীলতা শুধু চোখে ধরা যায় না। নিদারুণ আলো আর উত্তাপ বিকিরণ করছে যে গ্যাসকুণ্ডলী, তার অস্থিরতা যন্ত্রের সাহায্য বিনা পরিমাপ করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে প্রাথমিক গতিবেগকে কমিয়ে এনেছিলুম আমরা। এখন ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলুম সামনের ভয়ংকর ছোট্ট নক্ষত্রটার দিকে। একসময়ে আমাদের সূর্যের মতই ছিল তার তেজ—কিন্তু মাত্র ক'টি ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষিত করে ফেলেছে সে নিজেকে—শক্তির সেই বিপুল অপচয় না ঘটলে আরও কত নিযুত বছর ধরে প্রদীপ্ত থাকতো তার বিপুল দেহ। এ যেন স্বল্প পরিসরে সঞ্চিত সম্পদের মধ্যে দিয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ যৌবন স্মৃতির রোমঞ্চন।

গ্রহ দেখতে পাবো, এরকম আশা আমরা কেউই করিনি। বিস্ফোরণের আগে যদিও বা থাকতো, এখন তা পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পে পরিণত হয়ে হারিয়ে গিয়েছে—নক্ষত্রের বৃহত্তর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। কিন্তু নিয়মমাফিক অটোমেটিক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। অজ্ঞাত সূর্যের দিকে এগোলেই এ নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হয়। নক্ষত্র থেকে বহু বহু দূরে ঘূর্ণমান ছোট্ট গ্রহটাকে সেই কারণেই খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের সৌরজগতে প্লুটোর যা অবস্থা—এই সৌরজগতে এ বেচারী গ্রহেরও সেই অবস্থাই দেখলাম। পরিবার থেকে বহুদূরে একাকী ঘুরে চলেছে অনন্ত রাত্রির সীমারেখা বরাবর। কেন্দ্রীয় সূর্য থেকে এতদূরে এর অবস্থান যে জীবনের স্পন্দন কোনোদিনই দেখা যায়নি তার বুকে—শুধু বিপুল দূরত্বের জন্যেই বেঁচে গিয়েছে অন্যান্য সঙ্গীদের শোচনীয় পরিণতি থেকে।

পাহাড়গুলো ঝলসে গিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখায়……বিপর্যয়ের বহু-পূর্ব থেকে যে জমে যাওয়া গ্যাসের ম্যান্টল ঘিরেছিল গ্রহটিকে, অগ্নিস্রোতে তাও জলে খাক হয়ে গিয়েছে। নেমে পড়লাম আমরা। নেমেই দেখতে পেলাম ভল্টটাকে।

ভল্টনির্মাতাদের উদ্দেশ্যই ছিল তাই। প্রবেশপথের সামনেই একখানি পাথর কুঁদে তৈরী স্তম্ভ গলে অনেক নীচে নেমে এলেও দূরপাল্লার ফোটোগ্রাফ থেকেই বুদ্ধির স্বাক্ষর লক্ষ্য করেছিলুম। একটু পরেই পেলুম সারা মহাদেশে ছড়ানো রেডিও অ্যাকটিভিটির প্যাটার্ণ। পাথরের তলায় তা ঢাকা পড়ে গেলেও আমাদের যন্ত্রে তা ধরা পড়লো। ভল্টের ওপর অনেকটা মিশরীয় স্থাপত্যরীতিতে তৈরী সুউচ্চ পাইলনটা ধ্বংস হয়ে গেলেও যা ছিল তাই থেকেই কল্পনা করে নিয়েছিলুম তার আকৃতি। ধ্বংস না হয়ে গেলে অনন্তকাল ধরে আকাশের তারাদের সে নিমন্ত্রণ জানাতো সুউচ্চ শির তুলে। লক্ষ্যবস্তুতে ছুটে চলা তীরের মতই এই সুবিশাল চাঁদমারীর কেন্দ্রবিন্দুতে নেমে এল আমাদের মহাকাশপোত।

নিশ্চয় মাইল খানেক উঁচু করে তৈরী করা হয়েছিল পাইলনটাকে। আজ কিন্তু তা গলে গলে নিভে যাওয়া মোমবাতির মতই নেমে এসেছিল অনেক নীচে। জমে যাওয়া গলিত পাথর খুঁড়তেই এক হপ্তা গেল। কেন না, আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ নই—জ্যোতির্বিজ্ঞানী—তবুও হাল ছাড়বার পাত্র নই। তাই মূল উদ্দেশ্য ভুলে যেতে বাধ্য হলুম এক ভয়ানক চিন্তায়—মৃত সূর্য থেকে এত দূরে এই পরিত্যক্ত জগতে এরকম নিদারুণ পরিশ্রম করে এই একক মনুমেণ্ট বানানোর একটি মাত্রই উদ্দেশ্য থাকতে পারে: তা হলো, মৃত্যু আসন্ন জেনে অমর হওয়ার শেষ চেষ্টা করে গেছে এক সুউন্নত সভ্যতা।

কয়েক পুরুষ কেটে যাবে ভল্টের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদের হিসাব নিতো। চরম বিস্ফোরণের অনেক অনেক বছর আগে থেকেই নিশ্চয় বিপদসংকেত পাঠাতে শুরু করেছিল নির্বাসিত এই জগতের হতভাগ্য সূর্য—তাই তৈরী হওয়ার প্রচুর সময় পেয়েছিল তারা। সবশেষ হয়ে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই ধীশক্তির যাবতীয় সৃষ্টি এই প্রাণহীণ গ্রহে বয়ে নিয়ে এসেছিল তারা এই আশায় যে, একদিন না একদিন অন্য জাতির চোখে পড়বে তাদের সভ্যতার নিদর্শন—ফলে মরেও অমর হয়ে রইবে তারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই।

হায়রে, যদি আরও কিছু সময় পেতো ওরা! এই সূর্যেরই গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর বিজ্ঞান তারা রপ্ত করেছিল—নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণের বিদ্যা ছিল

অজ্ঞাত। তাই একশো আলোকবর্ষ উড়ে গিয়ে সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রে আশ্রয় নেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না সেই অন্তিম মুহূর্তে। অবশ্য ট্রান্সফিনিট ড্রাইভের রহস্য তারা সে সময়ে জানলেও কয়েক লক্ষের বেশী জীবন রক্ষা কোনোমতেই হতো না। তাই, বোধ হয় এই ছিল মন্দের ভালো।

স্থাপত্য থেকে জেনেছিলুম ওদের চেহারা প্রায় মানুষদের মতই। মানবিক চেহারা না পেলেও কি ওদের এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে আমরা চোখের জল ফেলতুম না? হাজার হাজার চাক্ষুস রেকর্ড রেখে গিয়েছিল ওরা ভল্টে—তা' পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্যে ছিল বিচিত্র মেশিন; ছবিসহ এমন সব বিস্তারিত নিদর্শন আমরা পেয়েছি যা থেকে ওদের লিখিত ভাষা শিখে নেওয়াও খুব বেশী কঠিন হবে না। এরকম অনেক রেকর্ড ঘেঁটে ছ হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম আমরা আবার জীবন্ত করে তুলেছি সেই সভ্যতাকে—একদিন যা সৌন্দর্যে গরিমায় অনেকদিক দিয়ে আমাদের সভ্যতার চাইতে ছিল অনেক উন্নত। সম্ভবত ওদের সেরা দিকটাই ওরা তুলে ধরতে চেয়েছে ভাবীকালের জাতের কাছে—কিন্তু সে জন্যে তাদের বেশী দোষও দেওয়া যায় না। ভারী সুন্দর ছিল সেই দুনিয়া···শহরগুলো এত চমৎকার যে মানুষের তৈরী যে কোনো শহরের সঙ্গে তার তুলনা চলে। আমরা দেখেছি ওদের কাজ করতে, খেলা করতে, শুনেছি গানের মত বক্তৃতা শত শত বছরের ওপার থেকে। একটা দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে—অদ্ভুত নীল বালির ওপর খেলায় মেতেছে একদল ছেলেমেয়ে—খেলা করছে দামাল ঢেউয়ের সাথে—যেমনটি পৃথিবীতে দেখা যায়। চাবুকের মত বিদঘুটে গাছের সারি রয়েছে বেলাভূমি বরাবর। বিরাট আকারের কয়েকটা জন্তু ঘুরছে এদিকে সেদিকে—কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই কারোরই।

আর, সমুদ্রে ডুবছে সূর্য। তখনও তা প্রাণ-প্রদায়িনী বন্ধুর মতই উষ্ণ রক্তবর্ণ। দুদিন পরেই যা বিশ্বাসহন্তার মতই মুছে দিয়েছে এই নির্দোষ সুখের প্রাচুর্যকে।

সম্ভবত বাড়ী থেকে এতদূরে না এলে আর এই রকম নিঃসীম নির্জনতার মধ্যে না থাকলে আমরা এতটা বিচলিত হতুম না। অন্যান্য গ্রহের ওপর বহু সভ্যতার ভগ্নস্তূপ দেখে এসেছে আমাদের অনেকেই। কিন্তু কখনই এভাবে কেউ মুষড়ে পড়েনি। বাস্তবিকই, অতুলনীয় এই ট্র্যাজেডী। পৃথিবীর ওপর এক এক জাতির আর সংস্কৃতির উত্থান আর পতন অন্য জিনিস, কিন্তু সভ্যতার

চরম শিখরে উঠে একজন উত্তর পুরুষও না রেখে সম্পূর্ণভাবে মুছে যাওয়া আর এক জিনিস। ঈশ্বরের করুণা বলে কি কোনো বস্তু এর পরেও থাকতে পারে?

সহকর্মীরা এই কথাই বার বার জিজ্ঞেস করেছে আমাকে। যা পেরেছি, তাই উত্তর দিয়েছি। কি উত্তরই বা দেব? জীব হিসেবে তো ওরা খারাপ ছিল না। জানি না কোন ভগবানকে পুজো করতো ওরা—করতো কিনা তাও জানি না। কিন্তু বহু শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে আমি দেখেছি নিভেআসা সূর্যের ছায়াতেও অক্ষুণ্ণ থেকেছে তাদের মহিমা, তাদের সৌন্দর্য। ওদের কাছে অনেক কিছুই শিখতে পারি আমরা। তবুও কেন ধ্বংস করা হলো ওদের?

পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পর এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে আমার সহকর্মীরা—আমি তা জানি। বলবে, ব্রহ্মাণ্ডের কোনো উদ্দেশ্যই নেই, কোন পরিকল্পনা নেই। যেহেতু আমাদের ছায়াপথেই প্রতিবছরে বিস্ফোরণ ঘটছে একশোটা সূর্যের—সুতরাং এই মুহূর্তে মহাকাশের গভীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে একটা না একটা জাতি। সারা জীবন ধরে তারা ভাল করেছে কি মন্দ করেছে, অন্তিমকালে তার কোনো মানেই থাকছে না—কেন না, ভগবানের বিচার বলে কিছুই নেই···নেই ঈশ্বর স্বয়ং।

কিন্তু আমরা যা দেখেছি, তা দিয়ে এ রকম কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এভাবে তর্কের ঝড় যারা তুলবে, ধরে নিতে হবে তারা ভাবাবেগে আকুল হয়েছে—যুক্তির ভিত্তিতে নয়। মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোনো দরকার আছে কি ঈশ্বরের? যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড গড়েছেন, যখন খুশী অণুপরমাণুতে বিলীন করে দেওয়ার অধিকারও তাঁর আছে। তিনি কি করতে পারেন আর কি পারেন না—তা নিয়ে প্রশ্ন করা চরম স্পর্ধা অথবা শয়তান উপাসনারই নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি মেনে নিতে পারতুম এই ব্যাখ্যাকে—যদিও জীবন সমেত এতগুলো গ্রহকে চুল্লির মধ্যে ফেলে দেওয়ার কল্পনাও অতি ভয়াবহ। কিন্তু এর পরেই আসছে এমন একটা তথ্য, যার পর সুদৃঢ়তম বিশ্বাসের বনিয়াদও কেঁপে ওঠে। সামনে ছড়ানো কাগজপত্রে বিস্তর গণনার মধ্যে দিয়ে, আমি জানি, আমি এখন সেই সত্যেই উপনীত হতে পেরেছি।

নীহারিকায় পৌঁছোনোর আগে আমরা বলতে পারিনি কত বছর আগে ফেটে পড়েছিল সেখানকার সূর্য। কিন্তু এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাক্ষ্য প্রমাণ আর সেই পরিত্যক্ত গ্রহের পাথরের রেকর্ড থেকে আমি নির্ভুলভাবে

হিসেব করে বার করে ফেলেছি। আমি জানি, কোন বছরে এই বিশাল অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের আলো পৌঁচেছিল আমাদের পৃথিবীতে। পেছনে ফেলে আসা সুপারনোভার মৃতদেহই যে একদিন কি পরিমাণ দীপ্তি ছড়িয়েছিল পৃথিবীর কালো আকাশে—আমি তা জানি। আমি জানি, পূর্বে সূর্য ওঠার আগে কি ভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল সে—প্রাচ্যের ঊষার পবিত্র সংকেতের মতই ছিল তার প্রাখর্য।

না, যুক্তিসংগত কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। পাওয়া গিয়েছে সুপ্রাচীন রহস্যের সমাধান। কিন্তু, ভগবান, আরও অনেক নক্ষত্রকেও তো তুমি কাজে লাগাতে পারতে? কি প্রয়োজন ছিল এতগুলি প্রাণীকে অগ্নিজঠরে নিক্ষেপ করে তাদের মৃত্যুর প্রতীককে বেথেলহোমের আকাশে প্রোজ্জ্বল করে রাখার?

সেটা কি সম্ভব!

"আপনার বয়স কতো?"...সংবাদপত্রের রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত প্রাণীটিকে।

"তিনশো বিরাশী বছর," জবাব দিল মঙ্গলের আগন্তুক।

"সেটা কি সম্ভব!" রিপোর্টার অবাক হয়ে মঙ্গল-আগন্তুকের সঙ্গীটির দিকে তাকালেন।

"আমি ঠিক বলতে পারবো না," উত্তর দিলসঙ্গটি। "কারণ, আমি ওর সঙ্গে মাত্র ২০৯ বছর ধরে রয়েছি।"

["মামাবাবুর নিদ্রাভঙ্গ" গল্পের শেষাংশ—৭ পৃষ্ঠার পর]

কোন প্রকাশকের কাছ থেকে গণপতি হাজরার ঠিকানা জেনে নিয়ে সরাসরি চলে এসেছেন মামাবাবু কেন নীরব সেই খোঁজ করতে।

'আশ্চর্য!' সম্পাদককে কিছুতেই ধকান গেল না। ঘণ্টা দুই বসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর অকাট্য যুক্তিতে মামাবাবুর কীর্তি কাহিনী প্রকাশের ব্যবস্থা করতে রাজী হতেই হল।

সেই জন্যেই খাতাপত্র পুরোন ডায়েরী ইত্যাদি ঘাঁটা।

পুরোনোর বদলে নতুন কিছু লেখা যায় না এমন নয়। গণপতি হাজরার লেখাই বন্ধ হয়েছে, মামাবাবুর কীর্তিকলাপ ত ফুরিয়ে যায়নি। তবু সুরু যখন করা হল তখন আগেকার কাহিনীগুলোকে বাদ দিলে অন্যায়ই হবে।

বছর কয়েক আগেকার এমনি শীতের দিনের একটি সকাল থেকেই সুর করা যাক।

সবে তার আগের দিন সন্ধ্যায় দিল্লী থেকে ফিরেছি। দিল্লীর হাড়ভাঙা শীতের পরে কলকাতার শীতে কাবু হবার কিছু নেই। কিন্তু কাবু হয়েছি কলকাতার ধোঁয়া ধুলো মেশানো বিদঘুটে কুয়াশায়।

আগের রাত্রে ফিরে আর মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। পরের দিন সকালেই বার হলাম সেই উদ্দেশ্যে।

ইচ্ছে করে একটু বেলা করেই বেরিয়ে ছিলাম। মামাবাবুর হালচাল ত আর জানতে বাকি নেই। এমনিতেই বেলা আটটার আগে তাঁর ঘুম ভাঙে না। আর এই শীতের দিনে নটার আগে কি আর লেপ কম্বল ছেড়ে উঠবেন!

নটার একটু আগেই অবশ্য এসেছিলাম। এখনো জেগে না থাকলে ঠেলেঠুলে বিছানা থেকে তুলব এই অভিপ্রায়।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ভোরের গাঢ় কুয়াশা তখনো কাটেনি। একটু ফিকে হয়েছে মাত্র। সেই কুয়াশার মধ্যে মামাবাবুর বাড়ির সামনে প্রথমেই এক পুলিশের গাড়ি দেখে অবাক। শুধু গাড়ি নয়, বাড়ির চারিদিকে বেশ জন কয়েক পুলিশ খাড়া পাহারায় দাঁড়িয়ে।

কুয়াশায় দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে কি না প্রথমটা সেই সন্দেহই হ'ল।

কিন্তু দেখার ভুল নয়, সত্যিই জলজ্যান্ত পুলিশ বাড়ির চারিধারে!

বেশ একটু হ্যাঙ্গামা হ'ল পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে। সেখানে গিয়েও দেখি জন দুই অফিসার নিচের বাইরের ঘরে মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ করছেন। বাড়ির নিচে-ওপরেও পুলিশ দুচারজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল।

ব্যাপার কি?

পুলিশ অফিসারদের আলাপ থেকে তেমন কিছুই বোঝা গেল না।

আমি ঘরে ঢোকবার পর প্রথম পরিচয়ের শেষে একজন আগের কোন কথার খেই ধরেই নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করলেন,—তাহলে আপনি কিছুই টের পাননি বলছেন? বলছেন, আপনার ঘরের আর সমস্ত বাড়ির কিছুই চুরি যায় নি?

না।

মামাবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্লান্ত অসহায় ভাবের সঙ্গে একটু বিরক্তিও যেন মেশানো।

দ্বিতীয় অফিসার সেটুকু বোধহয় লক্ষ্য করেই বললেন,—আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত, কিন্তু আপনার বিপদের কথা ভেবেই এ হ্যাঙ্গামা করতে হচ্ছে, এটুকু আশা করি বুঝছেন। একটা মানুষ এই বন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে সত্যি হাওয়ায় ত আর মিলিয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু তাকে ত কোথাও খুঁজে পেলেন না!—মামাবাবুর গলায় যেন ক্লান্ত অনুযোগ।

সেইটেই ত আশ্চর্য, আশ্চর্য কেন, প্রায় আজগুবি!—প্রথম অফিসার বললেন।

ব্যাপারটা কি একটু জানতে পারি?—এবার না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

প্রথম পুলিশ অফিসার আমার দিকে একটু ভ্রূকুটি ভরেই চাইলেন। আমার এ অনধিকার চর্চাটা তাঁর পছন্দ নয়।

দ্বিতীয় অফিসার একটু উদার। তাঁর কাছে সংক্ষেপে যা জানা গেল তা সত্যিই অদ্ভুত। ভোরের কিছু আগে মামাবাবুর এক প্রতিবেশী মিঃ ভোরা তাঁর গ্যারেজ থেকে মোটর বার করতে বেরিয়ে হঠাৎ একজন লোককে ঝোলানো দড়ি বেয়ে মামাবাবুর ঘরের জানলায় উঠতে দেখেন। গাঢ় কুয়াশার দরুন প্রথমটা তাঁর নিজের চোখের দৃষ্টির ওপরই সন্দেহ হয়। কিন্তু পরে আরো একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে জানলার একটা গরাদে সরিয়ে স্পষ্ট ভেতরে ঢুকতে দেখে মিঃ ভোরা চীৎকার করে মামাবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করেন। তাঁর চীৎকারে নিজের বাড়ির ড্রাইভার চাকর বেরিয়ে এলেও মামাবাবুর বাড়ি থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। লোকটা তখন ভেতরে ঢুকে দড়িটাও টেনে তুলে নিয়েছে। মিঃ ভোরা এবার ড্রাইভার ও চাকরকে জানলার নিচে পাহারায় রেখে অন্যদিকে মামাবাবুর বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করেন। কিছুক্ষণ বাদে মামাবাবুর নতুন অনুচর রঘুবীর জেগে দরজা খোলবার পরও মামাবাবুর ঘুম ভাঙতে বেশ সময় লাগে। মামাবাবু অবশ্য অসময়ে ঘুম ভাঙার দরুন আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারেন না। তাঁর ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা দড়িটা দেখিয়ে মিঃ ভোরাকে ব্যাপারটার গুরুত্ব তাঁকে বোঝাতে হয়। তা সত্ত্বেও মামাবাবুর বিশেষ উৎসাহ না

থাকলেও মিঃ ভোরা তখন পুলিশকে ব্যাপারটা জানান। পুলিশ এসে তন্ন তন্ন করে সমস্ত বাড়িঘর খোঁজ করেও কোথাও কাউকে পায়নি। যে লোকটাকে মিঃ ভোরা স্পষ্ট দড়ি বেয়ে উঠে জানলার গরাদে সরিয়ে মামাবাবুর ঘরে ঢুকতে দেখেছেন, সে লোকটা তাহলে গেল কোথায়? মামাবাবু একটি চাকর নিয়ে একলাই এ বাড়িতে থাকলেও বাড়িটি নেহাৎ ছোট নয়। আসলে সেটি একটি মিউজিয়ম লাইব্রেরী আর ল্যাবরেটরীর সমাবেশ। নিচের কয়েকটা ঘর শুধু বইএ বোঝাই। কীট পতঙ্গ আর বিরল জন্তু জানোয়ারের মরা নমুনা দুটি করে কাঁচের ঢাকনা দেওয়া নানা আকারের আলমারী বাক্সে সাজানো। দোতালায় মামাবাবুর নিজের ব্যবহার্য ঘরগুলি ছাড়া আপাততঃ সবই ল্যাবরেটরী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মামাবাবুর পুরানো চাকর মঙপো থাকলে ওপরের ল্যাবরেটরীর পাশের একটি ছোট ঘরে শোয়। মাসখানেক হল সে ছুটি নিয়ে গেছে বলে নতুন দরোয়ান রঘুবীর নিচের একটি ঘরে থাকে।

রঘুবীর তাঁর ডাকে দরজা খোলবার পর মিঃ ভোরা নিজে সে দরজা আবার বন্ধ করে মামাবাবুকে ওপরে ডাকতে পাঠিয়েছেন। বাইরের যে জানলা দিয়ে লোকটা ঢুকেছিল তার নিচেও মিঃ ভোরার চাকর ঠায় পাহারায় দাঁড়িয়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার আর কোন রাস্তাই নেই কোনখানে। মামাবাবুর না হয় কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। লোকটার ঘরে ঢোকা তিনি টেরও পাননি। কিন্তু লোকটা এই বন্ধ বাড়ি ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল কি করে এই হল সমস্যা।

অফিসার তাঁর বিবরণ শেষ করবার পর আমার মনে যে প্রশ্নটা উঠেছিল, তিনি নিজেই সেটা প্রকাশ করে তার উত্তর দিলেন। বললেন,—সমস্ত ব্যাপারটা মিঃ ভোরার দৃষ্টিভ্রম ভাবতে পারতাম, কিন্তু জানলার ভাঙা একটা গরাদে আর ঘরের মেঝের ওপরকার ফেলে-যাওয়া দড়িটা ত আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তাহলে সে এখানেই কোথাও আছে মনে করুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। —মামাবাবুর গলাটা খুব প্রসন্ন মনে হ'ল না। একটু বিদ্রূপও তাতে যেন মেশানো।

আপনি বিরক্ত হয়ে পরিহাস করছেন বুঝতে পারছি।—প্রথম অফিসার একটু হেসে বললেন,—কিন্তু এ ব্যাপারে অদৃশ্য মানুষের মত আজগুবি ব্যাখ্যা ত' সত্যি মেনে নিতে পারি না।

দ্বিতীয় অফিসার হঠাৎ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, আপনার বাড়িতে লুকোন কোনো চোরা দরজা বা কুঠুরী গোছের কিছু নেই ত?

না, মশাই!—এবার মামাবাবুই হেসে উঠলেন,—আমি রোমাঞ্চ কাহিনীর গোয়েন্দা কি পাপিষ্ঠ নই যে, বাড়িতে ওই সব প্যাঁচ রাখব। আমার বাড়িতে যা আছে চোখেই দেখা যায়। দেখলেনও ত সব।

দেখুন!—প্রথম অফিসারের গলায় এবার একটু আহত অভিমানের সুরই শোনা গেল,—আমরা যেন আপনাকে সাহায্য করতে এসে অপরাধ করেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মত লোকের বাড়িতে সন্দেহজনক কিছু ঘটলে আর মিঃ ভোরার মত সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে তার খবর পেলে কর্তব্য হিসেবে আমাদের যা করবার করতে আসতেই হয়। আমাদের সাধারণভাবে যা করবার করেছি, মিঃ সেন ফিংগার প্রিণ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আঙুল-টাঙুলের ছাপ কিছু পান কি না দেখতে এসেছিলেন। চোর বা খুনে যেই এ বাড়িতে ঢুকে থাকুক, লোকটা অত্যন্ত হুঁসিয়ার। ঢোকবার পর গরাদে জানলা সমস্ত এমন ভাবে মুছে দিয়েছে যে, চাকর-বাকরের হাতের ছাপ পর্যন্ত কোথাও মিঃ সেন পান নি। সারা বাড়িতে ওই দড়িগাছটা আর ভাঙা গরাদে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি আমিও। তবু রহস্যটা অলৌকিক কিছু বলে ছেড়ে দিতে পারছি না। আপনাকে সেই আগেকার প্রশ্নটাই

আবার তাই করছি। আপনি সব দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে এখনো বলছেন যে, কিছুই আপনার বাড়ির কোথাও থেকে চুরি যায় নি? সব যেমন ছিল ঠিক আছে?

নিশ্চিত হয়ে চুরি কিছু যায়নি এই কথাই বলেছি।—মামাবাবু রীতিমত গম্ভীর মুখে বললেন,—কিন্তু সব যেমন ছিল ঠিক আছে তা ত বলিনি!

তার মানে?—অফিসার দুজনের চোখই কপালে উঠল।

এ আবার কি হেঁয়ালি?—আমিও জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম।

হেঁয়ালি কিছু নয়।—মামাবাবু আগের মতই গম্ভীরভাবে বললেন,—চুরি যাবার বদলে বাড়িতে বাড়তি কোন জিনিষ যদি এসে যায়, তাহলে সব ঠিক আছে ত আর বলা যায় না।

চুরি যাবার বদলে বাড়তি জিনিষ বাড়িতে এসেছে!—অফিসার দুজনেই বেশ হতভম্ব ও সেই সঙ্গে একটু বিরক্ত,—কই একথা ত আগে বলেন নি!

আপনারা ত জিজ্ঞাসা করেন নি!—মামাবাবু সরলভাবে জবাব দিলেন,—আপনারা চুরির কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মামাবাবুর সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তর্কে যাওয়া নিষ্ফল বুঝে অফিসার মিঃ সেন একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,—বাড়তি জিনিষটা কি?

একটা ছোট পিপে বলতে পারেন। আমার পোকামাকড় প্রভৃতির নমুনা যে ঘরে থাকে সেই ঘরেই সেটা এখন আছে। আগে ছিল না।

আশ্চর্য ত! কিসের পিপে তাহলে দেখতে হয়।—মিঃ সেন উঠে দাঁড়িয়ে অন্য অফিসারকেও ডাকলেন,—আসুন মিঃ ধর।

কিসের পিপে জানবার জন্যে উঠে গিয়ে দেখতে হবে না।—মামাবাবু মিঃ সেনকে থামালেন,—ও পিপের মধ্যে কি আছে আমি জানি।

আপনি জানেন !—প্রথম অফিসার মিঃ ধর অবাক হয়ে মামা-বাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন করে ?

অনুমানে ! —মামাবাবু এবার একটু হাসলেন,—আর আমার অনুমান নির্ভুল বলেই ধরে নিতে পারেন।

অফিসার দুজনের মুখেই একটু বিরক্তির ভ্রূকুটি যেন ফুটে উঠল। মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার অনুমানটা তাহলে শুনি। কি আছে ও পিপেয় ?

এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস।

কি ? !

অফিসার দুজনের সঙ্গে আমিও এক রকম হতভম্ব।

মিঃ সেনই প্রথম বেশ অপ্রসন্ন সুরে বললেন,—এ সময়ে আপনার রসিকতার ঠিক তারিফ করতে পারছি না।

রসিকতা আমি করছি না।—মামাবাবুর গলা এবার বেশ গম্ভীর,—ও পিপের মধ্যে এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস আছে নিশ্চয়। আর একটা আধটা নয়, প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বলে মনে করি।

একটু চুপ করে থেকে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে মিঃ ধর ভুরু চকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস মানে একরকম পোকা ?

হ্যাঁ কক্সিনেল্লিডি বংশের পোকা। বৈজ্ঞানিক নামটা দাঁত-ভাঙা হলেও একটা সোজা নাম আছে। ইংরাজিতে বলে 'লেডী বার্ড'। আমাদের দেশে বিদঘুটে বদগন্ধের পোকা বলেই আমরা জানি।

কিন্তু ওই পোকা ভরা পিপে আপনার বাড়িতে রেখে যাওয়ার মানে কি ?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ সেন।—শেষ রাত্রে দোতালার জানলা ভেঙে চোর ঢোকার সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কি ?

মামাবাবু একটু যেন দুঃখের সঙ্গেই বললেন—এ সব প্রশ্নের জবাব আপনাদেরই খুঁজে বার করা উচিত নয় কি ?

হ্যাঁ, তাই করব।—মিঃ ধর একটু রাগের স্বরেই বললেন,

আপনার একটু অসুবিধে করার জন্যে মাপ চাইছি। এ বাড়ির ভেতর এখনো কাউকে পাওয়া যায়নি। ভেতরের অনুসন্ধান এখন বন্ধ থাকলেও বাইরে পুলিশ পাহারা তাই থাকবে। আর আপনাকে ও মিঃ ভোরাকে হয়ত একবার কষ্ট করে লালবাজারে যেতে হ'তে পারে। আপনার চাকরকে এখন একটু নিয়ে যেতে পারি?

দরকার বোধ করলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন। মামাবাবু একটু যেন অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি দিলেন,—কিন্তু ও ত সারারাত বাড়ির ভেতরেই ছিল। ভেতর থেকে বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল, তারও ত প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন।

তা পেয়েছি, তবু দু' চারটে প্রশ্ন করে ওর জবানবন্দীটা নিতে চাই। এ চাকর ত আপনার বিশ্বাসী পুরানো লোক?—জিজ্ঞেস করলেন মিঃ ধর।

অবিশ্বাসের কোন কারণ ত এখনো পাই নি।—মামাবাবু জানালেন, তবে পুরোনো লোক নয়, আমার আগেকার চাকর ছুটি নিয়ে চলে যাওয়ায় একমাস হল কাজ করছে।

মাত্র একমাস কাজ করছে! —মিঃ ধর একটু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন,—একমাসে একটা লোককে কি চেনা যায়?

একমাসে যেমন যায় না তেমনি কখনো কখনো সারাজীবনেও নয়। মামাবাবু হেসে বললেন,—তবে একমাসের মধ্যে সন্দেহ করবার মত কিছু পাইনি সেই কথাই জানাচ্ছি। তা ছাড়া আজকের যে ব্যাপার নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন তার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক আছে ভাবাতে আজগুবি বলে মনে হয়। প্রথমতঃ ওই দুমণি বপু নিয়ে রঘুবীরের দড়ি বেয়ে দোতলার জানলায় ওঠাই অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ আমার ঘরে একটা অদ্ভুত পোকা ভরা পিপে এনে রাখবার মত মানুষ ওকে মনে হয় কি?

হুঁঃ বলে গম্ভীর ভাবে খানিক চুপ করে থেকে মিঃ ধর তাঁর

সঙ্গীকে নিয়ে নমস্কার করে বেশ যেন একটু অপ্রসন্ন মেজাজেই চলে গেলেন।

এ সব কি ব্যাপার, মামাবাবু? অফিসাররা চলে যাবার পর ভৎর্সনার সুরেই এবার বললাম,—দু'মাস মাত্র বাইরে গেছি। এর মধ্যে এসব কি বিদঘুটে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ! মণ্ডপো বাড়িতে থাকলেও এসব কাণ্ড বোধহয় হ'তে পারত না। সে ছুটি নিয়ে গেছে শুনেই ত অবাক লাগছে। এত কাল তোমার কাছে আছে। মণ্ডপোকে ত' একদিনের জন্যেও কখনো ছুটি নিতে দেখিনি।

কখনো যা হয় নি তা আর হবে না এমন কোন কথা আছে কি? মামাবাবু হাসলেন, আমার দোতালার ঘরের জানলা বেয়ে কাউকে কোন দিন ঢুকতে কেউ এর আগে দেখেছে কি? না, আমার ঘরে, আচমকা অদ্ভুত পোকার পিপে পাওয়া গেছে!

সত্যি, সমস্ত ব্যাপারটা ত আজগুবি বলে মনে হয়। দড়ি বেয়ে জানলা দিয়ে একটা লোক ঢুকল অথচ বন্ধ বাড়ী থেকে বেরুল না। কোথা থেকে একটা অদ্ভুত পোকার পিপে তোমার ঘরের মধ্যে রাখা। এ সব রহস্যের কোন মানে থাকতে পারে তাইত ভাবতে পারছি না।

রহস্য যত গভীরই হোক একটা মানে নিশ্চয় আছে। মামাবাবু যেন দার্শনিক মন্তব্য করলেন।

মানে কিছু খুঁজে পেয়েছ?—সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম।

মানেটা যথাসময়ে আপনা থেকে প্রকাশ পাবে। সেই অপেক্ষাতেই আছি। আসুন আসুন মিঃ ভোরা।

মামাবাবুর অসংলগ্ন কথাগুলোতে প্রথম একটু হতভম্ব হলেও পেছনে চেয়ে মামাবাবুর হঠাৎ অভ্যর্থিত মানুষটিকে দেখতে পেলাম।

মাঝবয়সী বেশ লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক। পরনে দামী সাহেবী স্যুট। মাথায় শুধু দেশী গোল টুপি। চেহারা পোষাকে সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধির স্পষ্ট ছাপ।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে তিনি বললেন,—বিশেষ জরুরী

কাজে সেই সময়টাতেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম না। পুলিশ কিছু হদিশ পেয়েছে কি?

পেয়ে থাকলেও আমায় অন্ততঃ জানায় নি। মামাবাবু একটু হেসে বললেন,—শুধু আমার চাকরটিকে থানায় নিয়ে গিয়ে আমায় অসহায় করে গেছে। আপনাকে এক কাপ কফিও খাওয়াতে পারব না।

না, না, কফির আমার দরকার নেই। মিঃ ভোরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—কিন্তু আপনার চাকর মানে রঘুবীরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার মানে! সে ত নেহাৎ নিরীহ ভালোমানুষ! দরজা বন্ধ করে বাড়ির ভেতরেই সে ছিল তারও প্রমাণ আছে!

কিন্তু সে প্রমাণেও ত ফাঁকি থাকতে পারে।—মিঃ ভোরার সঙ্গে অপরিচিত না হলেও অনাহুত ভাবেই না বলে পারলাম না।

কি ফাঁকি? —মিঃ ভোরা একটু ভ্রূকুটিভরে আমার দিকে চাইলেন।

দোতালার জানলা দিয়ে যে ঢুকেছিল তাকে রঘুবীরই নিচের দরজা খুলে প্রথমে বার করে দিয়ে তারপর দরজা বন্ধ করে রেখেছে এ রকম হওয়া ত' সম্ভব। —আমার সংশয়টা খুলে বললাম।

না, তা সম্ভব নয়।—মামাবাবু আমার কথাটা তাচ্ছিল্যভরেই উড়িয়ে দিয়ে বললেন,—প্রথমত কোন লোক যদি সত্যি ঢুকে থাকে তাহলে পেছনের জানলা দিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে মিঃ ভোরার সামনের দরজায় আসতে যেটুকু সময় লেগেছে তার মধ্যে ওপর থেকে গরাদেতে বাঁধা দড়ি খুলে তুলে রেখে নিচে নেমে এসে বেরিয়ে যাওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ রঘুবীরকে ওরকম অবিশ্বাস করাই যায় না। রঘুবীর মিঃ ভোরার বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর। মণ্ডপো ছুটিতে চলে যাওয়ায় মিঃ ভোরাই রঘুবীরকে আমায় দিয়েছেন।

মিঃ ভোরা একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—দেখুন মানুষ সম্বন্ধে

কিছুই অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু আমার কাছে বহুদিন বিশ্বাস রেখে কাজ করেছে বলেই রঘুবীরকে নিশ্চিন্ত মনে আপনাকে দিয়েছিলাম। আমার বাগানে প্রায় দশ বছর ধরে ও দরোয়ানী করেছে।

হ্যাঁ বাগান বলতে মনে পড়ল মিঃ ভোরা।—মামাবাবু যেন ইচ্ছে করেই আমার বেয়াদবিটা ভোলাবার জন্যে অন্য কথা তুললেন,—আমার বন্ধু চালিহার কাল আবার একটা চিঠি পেয়েছি। এখন ত' সে তার সমস্ত বাগান বিক্রী করতেই চায়। আপনি যে দাম দিতে চেয়েছিলেন তাইতেই রাজী।

কিন্তু আমি যে আর রাজী হতে পারছি না।—মিঃ ভোরা মুখখানা কেমন করুণ করে বললেন—বছর বছর ওখানকার বাগানের কি হাল হচ্ছে দেখছেন ত! ফল ধরছেই না। ধরলেও শুকিয়ে যাচ্ছে। লাভের বদলে তাই শুধু লোকসানই গুণছি সবাই। এখন ঘরের পয়সা বার করে নতুন বাগান কেনা মানে ভস্মে ঘি ঢালা নয় কি?

ও সব বাগানের দাম আরো তাহলে পড়ে যাবে মনে করুন!—মামাবাবু চিন্তিতভাবে মিঃ ভোরার দিকে তাকালেন,—কিন্তু বাগান গুলো বাঁচাবার জন্যে আপনি ত অনেক কিছু করছেন শুনছি। বিদেশ থেকে ওষুধপত্র আরো কত কি আমদানিও করেছেন!

তা করেছি কিন্তু ফল ত কিছু পাচ্ছি না। মিঃ ভোরা বিষণ্ণ মুখে বললেন—আপনার বন্ধু মিঃ চালিহাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আমি যা যা আনিয়েছি তা ত তাঁকেও ব্যবহার করতে দিয়েছি।

হ্যাঁ তা দিয়েছেন বটে। চালিহা সে জন্যে কৃতজ্ঞতাই জানিয়েছে…

মামাবাবু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ বাড়ির দুর্ভেদ্য রহস্যের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে কোঁথাকার কোন বাগানের লাভ লোকসানের জোলো আলোচনায় তখন আমার মেজাজ

বিগড়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললাম, তোমাদের বাগানের আলোচনাই তাহলে চলুক। আমি উঠছি।

আহা উঠবি কেন এর মধ্যেই!—মামাবাবু বেশ লজ্জিত হয়ে পড়লেন,—বাগানের আলোচনা আর করব না। তবে কিসের বাগান জানলে অতটা ব্যাজার বোধহয় হতিস না। এ সব কমলা লেবুর বাগান, বুঝেছিস্। আসামের সেরা কমলা!

আমার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে মামাবাবু আবার বললেন, তা সে কমলা বাগানের কথাও এখন থাক। নিজের চোখেই যখন দুদিন বাদে দেখতে যাচ্ছিস্ তখন মুখের আলোচনার দরকারটা কি?

বিরক্তি থেকে একেবারে বিমূঢ়তায় পৌঁছে, অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকালাম। মিঃ ভোরার অবস্থাও আমারই মত।

তিনিই প্রথম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কি সত্যিই কমলা বাগান দেখতে আসাম যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ,—মামাবাবু নেহাৎ যেন নিরুপায় হয়ে বললেন,—বাগান যখন বিক্রীই হবে না, তখন বন্ধুকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যেও যাওয়া দরকার।

একটু থেমে ভুলে যাওয়া কর্তব্যটা এতক্ষণে স্মরণ করে মামাবাবু আমায় দেখিয়ে আবার বললেন,—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি, মিঃ ভোরা। এটি আমার ভাগনে, গণপতি রায় নামেই পরিচিত। ওকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

কথা বলব কি, আমার গলায় তখন আর আওয়াজ নেই।

দুদিন নয়, মামাবাবুর নানা অজানা ধান্দায় লালবাজার থেকে কাস্টাম্স অফিস পর্যন্ত ঘোরাঘুরির পর, প্রায় দিন সাতেক বাদে সত্যিই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশনের প্লেনে দমদম থেকে গৌহাটি আর সেখান থেকে সারাদিন মোটর হাঁকিয়ে

মামাবাবুর বন্ধু মিঃ চালিহার বিশাল কমলালেবুর বাগানের অফিস বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সারাদিনের ধকলের পর যে একটু বিশ্রাম করব তারও সুবিধা হল না। চালিহার কাছে তাঁর প্রতিবেশী মিঃ ভোরাও নিজের বাগানে দুদিন আগে এসেছেন শুনে মামাবাবুর প্রীতি একেবারে উথলে উঠল। তখুনি মিঃ ভোরার সঙ্গে দেখা করতে না গেলেই নয়।

নিরুপায় হয়ে মিঃ চালিহার একটি জীপে মামাবাবুর সঙ্গী হতে হল। প্রায় মাইল দশেক পাহাড়ী রাস্তায় জীপ চালিয়ে মিঃ ভোরার বাগানে যখন পৌঁছোলাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

মিঃ ভোরার কাঁটা তার ঘেরা বাগানের গেট বন্ধ।

বিরক্তিটা অনেকক্ষণ ধরেই মনে মনে জমা হচ্ছিল। এবার সেটা আর প্রকাশ না করে পারলাম না। বললাম,—এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে এটা কি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময়? গেট ত বন্ধ দেখছ। মিঃ ভোরার এখন বোধহয় অর্ধেক রাত। চলো, ফিরে চলো।

মামাবাবু কিন্তু নির্বিকার। জীপের হেডলাইটটা সমানে জ্বেলে রেখে তারস্বরে ইলেকট্রিক হর্ন বাজিয়েই চললেন।

উপায় থাকলে জীপ থেকে রাগের চোটে নেমেই যেতাম। তার বদলে জোর করে ইলেকট্রিক হর্ন থেকে মামাবাবুর হাতটা সরাতে যাচ্ছি, এমন সময় গেটের ওপর থেকেই কে যেন বিকট ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলে,—কে আপনারা? কি চান?

প্রথমটা চমকে উঠলেও তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝলাম। গেটের ঠিক মাথাতেই একটা লাউডস্পীকারের চোঙা লাগানো। আগে সেটা চোখে পড়েনি। আওয়াজটা তার ভেতর দিয়েই আসছে।

মামাবাবু চিৎকার করে এবার নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, মিঃ- ভোরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

খানিকক্ষণ তারপর কোন সাড়াশব্দ কোথাও না পেয়ে মনে হল মামাবাবুর বাড়াবাড়ির উচিত শিক্ষাই বুঝি হবে। কিন্তু তার পরেই গেটটা আপনা থেকে খুলতে সুরু করল। বোঝা গেল সেটা ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে খোলে ও বন্ধ হয়। লাউড স্পীকারের চোঙা থেকেও এবার শোনা গেল,—গাড়ি নিয়ে ভেতরে আসুন।

যান্ত্রিক অভ্যর্থনাটা একটু কড়া গোছের হলেও মিঃ ভোরার নিজের অভ্যর্থনাটা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তাঁর চমৎকার বাংলো বাড়ির সুসজ্জিত বসবার ঘরে আমাদের সাদরে বসিয়ে তিনি আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন,—সত্যিই আপনারা আসবেন আমি ভাবতে পারিনি। এত রাত্রে গেটে হর্নের আওয়াজ পেয়ে আমি ত প্রথমটা একটু ভড়কেই গেছলাম। এত রাত্রে এ অঞ্চলে—

হ্যাঁ, আমাদের আসাটা একটু অসময়েই হয়ে গেছে।—মামাবাবু লজ্জিতভাবে স্বীকার করলেন,—কিন্তু আপনার জন্যে যে উপহারটা এনেছি সেটা দেবার আগ্রহে সকাল পর্যন্ত আর সবুর করতে পারলাম না।

আমার জন্যে উপহার এনেছেন!—মিঃ ভোরার মুখে আনন্দের চেয়ে বিস্ময় বেশী,—কি উপহার?

সেটা খানিক বাদেই জানতে পারবেন!—মামাবাবু হাসিমুখে বললেন,—এখন সেটা জীপেই রেখে এসেছি।

মামাবাবুর কথা শুনে আমিও অবশ্য কম বিস্মিত হইনি। জীপে একটি কার্ডবোর্ডের বড় বাক্স মামাবাবু সঙ্গে এনেছেন অবশ্য দেখেছি। প্লেনে আসবার সময়ও সেটি তাঁর কাছেই ছিল। সেটা যে মিঃ ভোরাকে উপহার দেবার জন্যে আনা তা অবশ্য ভাবতে পারি নি। কি সেটা হতে পারে তাও বুঝতে পারলাম না।

আমার চেয়ে মিঃ ভোরার কৌতূহল আরো বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি বেশ একটু অধীর হয়ে বললেন,—উপহার এনে আবার জীপে রেখে এলেন কেন?

উপহার দেবার আগে একটু ভনিতা করবার জন্যে, সেই সঙ্গে একটা প্রস্তাব করবার জন্যেও। মামাবাবু মধুরভাবে হেসে বললেন,—শুনুন মিঃ ভোরা। আপনাদের এ অঞ্চলের কমলা বাগানের দুর্দশার কথা শোনবার পর থেকেই এ বিষয় নিয়ে আমি ভাবছি। ভেবে ভেবে আর পড়াশুনা করে এ দুর্দশা ঘোচাবার একটা উপায় আমি বার করে ফেলেছি।

বলেন কি!—মিঃ ভোরার গলার স্বরে সামান্য একটু যেন বিদ্রূপের আভাস পেলাম। তার জন্যে তাঁকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। এমন বেয়াড়া সময়ে উপহার দেবার নামে এই ভনিতা আমারও তখন খুব ভালো লাগছে না।

মামাবাবুর কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের উৎসাহেই বলে চললেন,—হ্যাঁ মিঃ-ভোরা। আপনি জানেন নিশ্চয় যে আজ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে যে কমলা লেবুর এত আদর তার আদি জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ বলেই বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান করে জেনেছেন। যেখান থেকে এ ফল সমস্ত দুনিয়া পেয়েছে সেই ভারতবর্ষেই কমলার চাষ নষ্ট হয়ে যাবে এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। কমলা-গাছের নানারকম শত্রু আছে। এ অঞ্চলে যে শত্রুতে সমস্ত বাগান ছারখার করছে তা প্রধানতঃ হল অ্যাফিড জাতীয় পোকা। পোকা মারার রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে তাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সে সব ব্যবহারে মানুষেরও কিছু আনুষঙ্গিক কুফলের ভয় আছে। ইওরোপ আমেরিকাতে পর্যন্ত কীটপতঙ্গ নাশক রাসায়নিক ওষুধের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন তাই সুরু হয়ে গেছে। রাসায়নিক ওষুধের চেয়ে অ্যাফিড নির্মূল করবার অনেক সহজ নিরাপদ উপায় কিন্তু আছে। সেই উপায়ের কথাই আপনাকে প্রথম বলব।

মিঃ ভোরা একটু যে হাই তুললেন তা আমার দৃষ্টি না এড়ালেও মামাবাবুর নজরেই পড়ল না। তিনি সোৎসাহে বলে চললেন,

সে উপায়কে এক হিসাবে ষাড়ের শত্রু বাঘ দিয়ে খাওয়ানো বলা যায়। পোকাদের coleoptera বিভাগের coccinellidae বংশের একটি জাতের পোকা আছে ইংরেজিতে যার বাহারে নাম লেডী-বার্ড। এই লেডী-বার্ড পোকা অ্যাফিড জাতীয় পোকার যম। এই লেডীবার্ডেরও অবশ্য প্রায় তিনহাজার শাখা আছে। ফলের বাগানের শত্রু-পোকা ধ্বংসের জন্যে এই লেডীবার্ড ব্যবহার করে নানা দেশে বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ায় আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। লেডীবার্ড এখন তাই কোটি কোটি বিক্রী হয়। শীতকালে এ পোকা জড়ভরত হয়ে ঘুমোয়। সে সময়ে এদের সংগ্রহ করে তারপর পিপেয় ভরে খরিদদারদের কাছে পাঠান হয়। একটা এক গ্যালনের পিপেতে প্রায় এক লক্ষ পঁইত্রিশ হাজার পোকা ধরে। একজন বিদেশী ব্যবসাদারের কথা জানি যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় চারশ কোটি লেডীবার্ড বিক্রী করেছেন। এই লেডীবার্ডই আপনাদের কমলা বাগানের মুস্কিল আসান। ইনসেক্‌টিসাইড রাসায়নিক ওষুধের বদলে এই লেডীবার্ড কিনে আপনাদের বাগানে ছাড়ুন।

মিঃ ভোরা এবার স্পষ্টই হাই তুলে বেশ একটু কৌতুকের স্বরে বললেন,—আপনার মুস্কিল আসানের দাওয়াইএর জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু দাওয়াইটার কি আপনিই প্রথম সন্ধান পেয়েছেন মনে করেন? তাহলে বলি শুনুন, আজ দুবছর ধরে অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকা এমন কি আমেরিকা থেকে এই লেডীবার্ডই লক্ষ লক্ষ আমদানি করেছি।

তাই নাকি? —মামাবাবুকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে হল,—আমি মার কাছে মাসির গল্প করতে এসেছিলাম! ছিঃ ছিঃ, আমার উপহারটাই মাটি হয়ে গেল দেখছি!

আপনি কি আমার জন্যে লেডীবার্ডই এনেছিলেন নাকি? —মিঃ ভোরা এবার হেসে উঠলেন,—তা এনেছেন যখন দিয়ে যান। অধিকন্তু ন দোষায়।

হ্যাঁ এনেছি যখন দিয়ে যেতেই হবে।—মামাবাবু একটু যেন করুণ সুরে বললেন,—কিন্তু তার আগে যে প্রস্তাবের কথা বলেছিলাম সেটা সেরে নিই।

প্রস্তাব আবার কি?—মিঃ ভোরার মুখে বিদ্রূপ মেশানো কৌতুক।

আপনি আমার বন্ধু চালিহার বাগান আর কিনতে চান না ত?—মামাবাবু যেন কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

না, সে কথা ত' আগেই বলেছি।—মিঃ ভোরার গলায় একটু অধৈর্য প্রকাশ পেল,—জলের দরে ও বাগান কেনাও ত এখন লোকসান।

হুঁ,—মামাবাবু আবার যেন দ্বিধাভরে বললেন,—তাই আমি চালিহার হয়ে আপনার বাগানটাই কিনতে এসেছি।

আমার বাগান! আমার বাগান কিনতে চায় চালিহা!—মিঃ ভোরার মুখটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে হিংস্র হয়ে উঠে আবার বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকা হয়ে উঠল,—আমার বাগান আমি বিক্রী করব কেন?

করবেন, আপনার বাগানেরও জলের দর হতে পারে বলে!—মামাবাবুর গলা হঠাৎ গম্ভীর।

মাপ করবেন,—মিঃ ভোরা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন,—রাত অনেক হয়েছে, আপনার প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই।

সময় যদি না থাকে তাহলে আমি নাচার,—মামাবাবু যেন লজ্জিত হয়ে বললেন,—চলুন, আমার উপহারটা তাহলে নেবেন চলুন।

আমাকে যেতে হবে না। আমার লোক দিয়েই আনিয়ে নিচ্ছি।—মিঃ ভোরার গলায় এখন আর খুব সৌজন্য নেই।

না, না, তা কি হয়! —মামাবাবু যেন মিনতি করলেন,—উপহারের মর্যাদাটা অন্ততঃ রাখুন।

[এরপর ২০৯ পৃষ্ঠা দেখুন]

চাঁদের অজানা রাজ্যে
দুঃসাহসিক অভিযান ও আবিষ্কারের
ধারাবাহিক কল্পকাহিনী

চাঁদের মেয়ে

বিশু দাস

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(২) চাঁদের রহস্য ॥

এতক্ষণ বিরাধের ডিউটি ছিলো। সে ছুটলো পাইলট রুমের দিকে। পাইলট রুমের ওপর প্রায় একফুট উঁচু একটা মোটা নল লাগানো। নলটার চারিদিকে কাঁচের জানালা বসানো। সেখান থেকে বাইরের চতুর্দিকে পরিষ্কার দেখা যায়। এই ঘরটা ইঞ্জিন রুমের ঠিক সামনে।

মরিচিকে ব'ললাম, "তুমি এবং ময়, দুজনে মিলে কমাণ্ডার মুচুকুন্দকে ওর ঘরে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখো। যদি কোন রকম গোলমাল ক'রে তবে হত্যা ক'রতেও দ্বিধা ক'রো না, আমার আদেশ।" তারপর ছুটলাম বিরাধের কাছে। পেছন থেকে শুনতে পেলাম অপ্রকৃতিস্থ মুচুকুন্দের অট্টহাসির শব্দ। পাইলট রুমে বিরাধ যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ক'রছিলো। তার কাজের মধ্যে এতটুকু ভয় বা ব্যস্ততার লক্ষণ নেই—শান্ত, সংযত। মুখটা কিন্তু ছাইয়ের মত রক্তশূন্য ফ্যাকাশে।

"কি হ'লো, বিরাধ?" জিজ্ঞেস করলাম। ও জবাব দেবার আগেই কম্পাসটার দিকে নজর প'ড়লো। সব কিছু জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেলো এবার আমার কাছে। গন্তব্য পথে না গিয়ে তার সাথে সমকোণে চ'লেছে আমাদের মহাকাশযান।

"আমরা চাঁদের দিকে চ'লেছি, স্যার। ইঞ্জিনটাকে কনট্রোল করা যাচ্ছে না, সব বিগড়ে গেছে!"

"ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দাও।" আদেশ দিলাম আমি। "চালু থাকলে আমাদের পড়ার বেগ শুধু বাড়বেই।"

"আচ্ছা স্যার," জবাব দেয় বিরাধ।

"চাঁদের অষ্টমরশ্মির ট্যাঙ্কে যতখানি রশ্মি জমা আছে তাতে আমরা নিরাপদে চাঁদে নামতে পারবো, অবশ্য যদি ট্যাঙ্কটা কোন রকম জখম না হ'য়ে থাকে।"

"আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম, স্যার।"

"প্রেসার গজের কাঁটাটা দেখে তো মনে হচ্ছে ট্যাঙ্ক ভর্তিই আছে।"

"কিন্তু ট্যাঙ্ক যদি ভর্তিই থাকবে তাহলে এত দ্রুত চাঁদের দিকে নেমে যাচ্ছি কি ক'রে?" ব'ললে বিরাধ।

প্রেসার গজ্ পরীক্ষা ক'রে দেখলাম ট্যাঙ্কটা জখম হ'য়েছে এবং কাঁটাটাকে সবচেয়ে বেশী চাপের অবস্থানে আটকে দেওয়া হ'য়েছে। দেখলে মনে হবে ট্যাঙ্ক ভর্তিই আছে।

"বিরাধ, তাড়াতাড়ি ট্যাঙ্কটা পরীক্ষা ক'রে জানাও আমাকে," আমি আদেশ দিলাম।

আমাকে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলো সে। মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এলো যখন, তখন কিন্তু আগের মত বিষণ্ণ মনে হ'লো না ওকে।

"কি ব্যাপার?" আমার সামনে এসে থামতেই জিজ্ঞেস ক'রলাম আমি।

"বাইরের ভাল্‌ভ্‌টা খুলে দিয়েছিলো। এতক্ষণ অষ্টমরশ্মি বেরিয়ে যাচ্ছিলো ট্যাঙ্ক থেকে, আমি ভাল্‌ভ্‌টা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

ঐ ভাল্‌ভ্‌টা খুব কম ব্যবহার হ'তো। ডকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ট্যাঙ্ক ভর্তি করার সময়ই কাজে লাগতো কেবল। ফলে বাইরের দিকে এমন জায়গায় ভাল্‌ভ্‌টা বসানো হ'য়েছে যেখানে সহজে পৌঁছানো সম্ভব নয় বা হঠাৎ কোন কারণে ভাল্‌ভ্ খুলে যাওয়াও সম্ভব নয়।

অল্টিমিটারের দিকে চোখ রেখে বিরাধ ব'ললে, "এবার আর আমরা আগের মত তত তাড়াতাড়ি নামছি না।"

"হ্যাঁ," জবাব দিলাম, "আমিও লক্ষ্য ক'রেছি সেটা। প্রেসার গজটা মেরামত করাও হ'য়ে গেছে। ট্যাঙ্ক অর্ধেক ভর্তি রয়েছে এখনও।"

"কিন্তু ঐ পরিমাণ অষ্টমরশ্মি কি চাঁদের ওপর আছাড় খাওয়া থেকে রক্ষা ক'রতে পারবে আমাদের ?" ব'ললে বিরাধ।

"চাঁদে বাতাস থাকলে আরও খানিকক্ষণ হয়তো ভেসে থাকতে পারতাম। যাইহোক, মনে হয় নিরাপদেই নামতে পারবো আমরা—আর ওখানে নেমেই বা লাভ কি হবে ? আমার মনে হয় এইখানেই শেষ···" আমি বললাম।

"আমাদের এই অকৃতকার্যতা দুটো গ্রহের অগ্রগতির ওপরেই বিরাট এক আঘাত আনবে"—উদাসভাবে ব'ললো কথাগুলো, যা শুনেই বুঝতে পারা যায় ওর চরিত্রের মহত্ত্ব।

"খবরটা যদিও দুঃখের তবু এক্ষুনি এটা পাঠিয়ে দাও শান্তি বাহিনীর সেক্রেটারিকে ঃ

{ মরুৎ মহাকাশযান, ২রা জানুয়ারী ২০২৬ খৃষ্টাব্দ। চাঁদের বিশ হাজার মাইল দূর দিয়ে পার হবার সময় লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার মুচুকুন্দ মদের নেশায় অক্‌জিলিয়ারী ইঞ্জিনটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে এবং চাঁদের অষ্টমরশ্মির ট্যাঙ্কটা প্রায় খালি ক'রে দিয়েছে। আমরা দ্রুত গতিতে চাঁদের দিকে নামছি। যাইহোক, আমরা নিয়মিত খবর পাঠাবো·····}

রেডিও ডেস্ক থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো বিরাধ। চীৎকার ক'রে ব'ললে, "হায় ভগবান, কমাণ্ডার মুচুকুন্দ রেডিও ট্রান্সমিটার, রিসিভার সব কিছু জখম ক'রে রেখেছে। না পারবো খবর পাঠাতে, না পারবো খবর শুনতে !"

বেতার যন্ত্র এমনভাবে জখম ক'রে রেখেছে যে মেরামত করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। বিরাধের দিকে চেয়ে বললাম, "শুধু যে মারাই গেলাম তা নয়, সমাধিও হ'য়ে গেলো এবার আমাদের····· ।"

"একটা দুঃখ র'য়ে গেলো যে পৃথিবীর মানুষ কোন দিন জানবেও না যে আমাদের অকৃতকার্যতার জন্যে যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা

এসব দায়ী নয়," মৃদু হেসে কথাগুলো ব'ললে বিরাধ। সে হাসি দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে মৃত্যুর ভয়ে ভীত সে নয়।

"এটা সত্যিই খুব খারাপ হ'লো" বললাম আমি, "কারণ এই দুর্ঘটনার ফলে পৃথিবী এবং মঙ্গলের পরিবহন ব্যবস্থা প্রায় একশ' বছর পিছিয়ে গেলো কিম্বা চিরকালের মত শেষ হয়ে গেলো তাই বা কে ব'লতে পারে?"

মরিচি এবং ময়—এদের ডাকলাম। মুচুকুন্দকে ওর ঘরে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছে। সব কথা ওদের ব'ললাম। শান্ত হয়ে শুনলো, কারও মুখে কোন উত্তেজনা বা ভয়ের চিহ্ন নেই! আমিও খুব অবাক হ'লাম না, কারণ বহু লোকের মধ্যে থেকে বাছাই ক'রে নেওয়া হয়েছে এদের এই সব গুণের জন্যেই। যে কোন অবস্থাকেই হাসি মুখে মেনে নিতে পারে এরা।

অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে আর কোথাও কোন গোলমাল পাওয়া গেলো না। কেবল চাঁদের অষ্টম রশ্মির ট্যাঙ্কটা খারাপ হওয়াতে এর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'লো না।

"তোমরা সবাই বুঝতে পারছো কি অবস্থার সম্মুখীন হ'তে চলেছি আমরা," ব'ললাম আমি। "অক্‌জিলিয়ারী জেনারেটারটা যদি মেরামত ক'রে চাঁদের অষ্টম রশ্মি পৃথক করে ট্যাঙ্কে জমা ক'রতে পারি তবেই আবার ফিরে যেতে পারবো এখান থেকে। কিন্তু মুচুকুন্দ যেভাবে ইঞ্জিনটা অকেজো ক'রে দিয়েছে তাতে মেরামত করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিছুক্ষণ হয়ত চাঁদের ওপরে ভেসে থাকতে পারবো, কিন্তু তাতেই বা কি লাভ হবে? শেষ পর্যন্ত নীচে তো প'ড়তেই হবে। সুতরাং আমি ঠিক ক'রেছি আমরা নেমেই পড়বো। চাঁদের সম্বন্ধে কত কাল্পনিক গল্প, কত বৈজ্ঞানিক তথ্য তো এতদিন পড়েছি এবং শুনেছি। এবার স্বচক্ষে দেখেই সব কিছু বুঝতে পারা যাবে। কপাল ভালো হ'লে এমন কিছুর সন্ধান পেয়ে যেতে পারি ওখানে, যা আমাদের

ফিরে আসার কাজে সাহায্য ক'রবে। পনেরো বছর ধরে মহাকাশ-যানের ভেতর ব'সে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করবার চেয়ে একেবারে ম'রে যাওয়া অনেক ভালো। উদ্ধারের কোন পথ যে নেই তা তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি। মুচুকুন্দ যদি রেডিও ট্রান্সমিটারটা খারাপ না ক'রে দিতো তবু একটা আশা ছিল। পৃথিবী থেকে অন্য কোন মহাকাশযান আসতে পারতো উদ্ধারের জন্যে; তাড়া-তাড়ি না হোক কয়েক বছর পরে। কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস—কেউ জানতেও পারবে না আমাদের কপালে কি ঘটলো! এখন যে অবস্থায় প'ড়েছি তাতে আমি তোমাদের সকলের মত নিয়ে পরবর্তী কার্যসূচী ঠিক ক'রতে চাই। পৃথিবীতে ফিরে যাবার পথ আমাদের বন্ধ একথা বেশ ভালো ক'রেই বুঝতে পারছি সুতরাং আশা করি তোমরা সবাই আন্তরিকভাবে আমার পরিকল্পনায় যোগ দেবে এবং পরিকল্পনাটা সফল ক'রে তুলবে।"

মরিচি ওদের মধ্যে বয়সে বড়, সুতরাং সে-ই প্রথমে জবাব দিলো, "আপনি যেখানে ব'লবেন সেইখানেই যেতে আমরা প্রস্তুত।" বিরাধ এবং ময় তার কথায় সায় দিয়ে তাদের বাধ্যতাপূর্ণ মনোভাব জানিয়ে দিলো। একথাও ওরা ব'ললো যে চাঁদের পৃষ্ঠে অভিযান চালিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো যদি নতুন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে কাটিয়ে দেওয়া যায় তবে তার চেয়ে ভালো উপায় আর কি হ'তে পারে?

"বেশ," ব'ললাম আমি, "আমাদের মহাকাশযানের মুখ চাঁদের দিকে ফেরাও। সোজা নেমে চ'লো ওখানে।"

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসতে লাগলাম নীচের দিকে।

অবিশ্বাস্য গতিতে নেমে আসতে লাগলো আমাদের মহাকাশযান।

চাঁদের আকার বড় হয়ে উঠতে লাগল আমাদের চোখে। প্রায় পনেরো ঘণ্টা পর পর আমি ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ দিলাম। তখন আমরা চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ন'হাজার ফুট ওপরে। তীক্ষ্ণ চূড়াওয়ালা পর্বতগুলো দেখে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলাম। জীবনে এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। তিন-চার হাজার ফুট উঁচু পর্বত তো যেখানে সেখানে ছড়ানো। অসংখ্য নানা রংয়ের পাথর দিয়ে তৈরী সেগুলো। মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো নানা আকারের। কোন কোনটা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। এই রকম এক বিরাট গর্তের মধ্যে নেমে এলো আমাদের মহাকাশযান। চতুর্দিকে আধো আলো, আধো অন্ধকার। ভালো ক'রে দেখার জন্যে যতদূর সম্ভব চোখ বিস্ফারিত ক'রে আমরা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নীচে একটা মৃদু আলোর আভাষ দেখতে পেলো। ময় ব'ললো, "এটা বোধহয় আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার বিকীর্ণ আলো।" আমার মনে হ'লো ময়ের কথাই যদি ঠিক হয় তবে যত আমরা নীচে নামছি তাপ তো ততই বাড়বার কথা।

এই উচ্চতায় একটা নতুন আবিষ্কার ক'রলাম আমরা। চাঁদের পৃষ্ঠ ঘিরে একটা বায়ুমণ্ডল র'য়েছে। যদিও সেই বায়ুমণ্ডলের বাতাস খুব পাতলা। চাঁদের পৃষ্ঠের দেড় হাজার ফুট ওপরে যখন ছিলাম তখনই আমাদের ব্যারোমিটারে ধরা প'ড়েছিল বাতাসের চাপ। উপত্যকার যে সব অংশে বৃক্ষলতা জন্মায় সেই সব অংশে বাতাস কিছুটা ঘন। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই, কারণ চাঁদের পৃষ্ঠে এখনও আমরা নামতে পারিনি।

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের দেওয়ালের সাথে সমান্তরালভাবে ঘুরতে লাগলো আমাদের মরুৎ মহাকাশযান। সঙ্গে সঙ্গে গতি পরিবর্তনের আদেশ দিলাম আমি। কারণ নামতে নামতে একেবারে নীচে চ'লে গেলে উঠে আসবার আর কোন উপায় থাকবে না।

আমার পরিকল্পনা ছিলো যেখানে উদ্ভিদ জন্মাতে দেখেছি সেই রকম একটা উপত্যকায় অবতরণ করা। মরিচির ডিউটি তখন। মহাকাশযানের গতি পরিবর্তন ক'রতে গিয়ে দেখলো যে ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। জ্বালামুখের ওপরেই ঘুরতে লাগলাম আমরা। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মাত্র পাঁচশ ফুট ওপরে তখন আমরা, ধীরে ধীরে নামছি নীচের দিকে। মরিচি আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলো শুধু।

"এখন আর তাতে কোন লাভ হবে না, স্যার" বললো সে। "সব আশা শেষ হ'য়ে গেছে। আমরা ঘূর্ণীর মধ্যে প'ড়েছি আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছেন। আমাদের ঘূর্ণনের বৃত্তপথটা আস্তে আস্তে ছোট হ'য়ে আসছে?"

"কিন্তু বেগ তো বাড়ছে না" ব'ললাম আমি। "যদি কোন ঘূর্ণীর মধ্যে প'ড়তাম তাহলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ গতি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যেত।"

"আমাদের ট্যাঙ্কে এখনও যেটুকু চাঁদের অষ্টম রশ্মি অবশিষ্ট আছে তার দরুণই এরকম ঘটছে। ঐ রশ্মির কাজই হ'লো মহাকাশযানকে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে দূরে ঠেলে রাখা। পাথরের গর্তের প্রতিটি অংশ আমাদের বিকর্ষণ ক'রছে, যার ফলে ঘূর্ণনের পথটা আস্তে আস্তে ছোট হ'য়ে আসছে। শেষে গিয়ে পড়বো গর্তের একেবারে তলায়।"

"আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক, বিরাধ। তোমার থিওরীটাও ঠিক ব'লেই মনে হচ্ছে। মহাকাশযানের বেগ যেন আগের চেয়ে একটু বেশী বলে মনে হচ্ছে এবার, কিন্তু আগের মতই বৃত্তপথে ঘুরতে লাগলাম। তখন আমাদের পতনের বেগ ঘণ্টায় দশ মাইলের মত। ব্যারোমিটারে দেখছি বাতাসের চাপ বাড়ছে। অবশ্য আমাদের বাঁচবার জন্যে যতটা বাতাসের চাপের দরকার ততটা নয়। উত্তাপ আগের চেয়ে একটু বেশী হ'লেও অসহ্য নয়। গর্তের মুখে যখন

ঢুকছি তখনকার উষ্ণতা ছিলো শূন্যের নীচে পঁচিশ-তিরিশ ডিগ্রীর মত। নীচে নামবার সাথে সাথে উষ্ণতা বেড়ে যেতে আরম্ভ ক'রেছে। জ্বালামুখের ভেতরে প্রায় একশ পঁচিশ মাইল নামবার পর উষ্ণতা এসে পৌঁচেছে শূন্য ডিগ্রীতে। পরবর্তী দশ মাইল আমাদের গতি আগের চেয়ে ক'মে গেলো, শেষে একসময় বুঝলাম আর নীচে নামছি না, কিন্তু যেদিক থেকে এতক্ষণ নামছিলাম সেই দিকেই উঠে যাচ্ছি আবার! একটা রবারের বলকে মাটিতে ধাক্কা দিলে যেমন লাফাতে থাকে তেমনি একবার নামছি আর একবার উঠছি ওপরের দিকে। কয়েকবার এমনি ওঠানামা ক'রবার পর জ্বালামুখের একশ তিরিশ মাইল নীচে এসে থামলো আমাদের মহাকাশযান। চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ভেতরে যন্ত্রপাতি দেখে বাইরের অবস্থা আন্দাজ ক'রছিলাম, মহাকাশযানের ভেতরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত।

"গর্তের মুখে ঢোকবার সময় একটা মৃদু আলো দেখতে পেয়েছিলো বিরাধ। সেই আলোটা আমরাও স্পষ্ট দেখতে পেলাম এবার। ভাবছি ওটা কিসের আলো হ'তে পারে। শেষে বিরাধ প্রশ্ন ক'রল, "আমরা কোথায় রয়েছি? শূন্যে ঝুলে রয়েছি কেন?"

"একটা সম্ভাব্য উত্তরই মনে পড়ছে আমার, অবশ্য জানি না কতখানি সত্যি আমার কল্পনা। চাঁদ আসলে একটা ফাঁপা বলের মত। ওপরের শক্ত আবরণটা মাত্র শ'দুয়েক মাইল পুরু। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের উপরে উঠতে দিচ্ছে না, আর কেন্দ্রাতিগ বল দিচ্ছে না নীচে নামতে।"

মাথা নেড়ে সকলে আমার মতের সমর্থন ক'রলো। বাধ্য হ'য়েই ওদের বিশ্বাস ক'রতে হলো আমার থিওরী কারণ সত্যিকার ব্যাপারটা আমাদের সকলেরই অজানা। বিরাধ গেলো ব্যারোমিটার দেখতে, এতক্ষণ ওটা লক্ষ্য করার কথা কারোই মনে ছিলো না। বিস্ময়ে চোখ দুটো যেন ওর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাথাটা

আরও সামনে নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে দেখছে, নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে চাইলো আমার দিকে।

"আমার মনে হয় ব্যারোমিটারে কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে স্যার। এখানে বাতাসের চাপ তো দেখছি পৃথিবী পৃষ্ঠের বাতাসের চাপের সমান!"

এগিয়ে গেলাম ব্যারোমিটারের কাছে। নর্টন যা ব'ললো চাপ ঠিক ততটাই অথচ যন্ত্রটার কোথাও কোন গোলমাল হ'য়েছে ব'লে তো মনে হ'লো না।

"পরীক্ষা ক'রে দেখবার একটা উপায় আছে" ব'ললাম আমি: "কয়েক মুহূর্তের জন্যে এয়ার কক্‌টা খুলে যদি খানিকটা বাতাস ভেতরে ঢুকতে দিই, তাহলেই বোঝা যাবে ব্যারোমিটারের রিডিং ঠিক কি না।" পরিকল্পনাটা যদিও বিপজ্জনক তবু মরিচি জেনারেটারে, ময় এয়ার ককে এবং বিরাধ পাম্পে ব'সলে ব্যাপারটা অনেক নিরাপদ হ'য়ে যাবে, এমন কি চাঁদের পৃষ্ঠে যদি বায়ুমণ্ডল না-ই থাকে। আসলে বিপদের আশঙ্কাটা হচ্ছে, যদি এখানকার বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত গ্যাস থাকে? পরীক্ষার ফলাফল যাই হোক না কেন আমাদের পক্ষে সবই সমান। কারণ এবারকার অভিযানের সমাপ্তি তো হ'য়ে গেছেই—আর ভয় কিসের?

তিনজন নিজের নিজের জায়গায় বসে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রছে আমাদের আদেশের। সত্যি সত্যি চাঁদের পৃষ্ঠে যদি বায়ুমণ্ডল আবিষ্কার ক'রতে পারি তবে আশা করা যায় আরও অনেক কিছু দেখতে পাবো এখানে। বায়ুমণ্ডল যদি সত্যিই থাকে তবে আর কিছু না হোক ডেকের ওপর গিয়ে খোলা হাওয়ায় প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারবো। সব রেডি, আমার আদেশ পাওয়ামাত্র মরিচি জেনারেটার বন্ধ করে দেবে, ময় খুলে দেবে এয়ার কক্ আর বিরাধ পাম্প চালিয়ে দেবে। বিশুদ্ধ বাতাসের সন্ধান যদি না পাওয়া

যায় তবে আবার তিনজনেই উল্টো কাজ করবে তৎক্ষণাৎ।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছে ময়। আমিও তার পাশে ব'সে নলটার কাছে নাক লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তার-পর কাজ আরম্ভ করার আদেশ দিলাম। সব কিছুই সুন্দরভাবে হয়ে গেলো। একটু পরেই নাকে এসে ঢুকলো এক ঝলক্ ঠাণ্ডা বাতাস। মরিচি এবং বিরাধ লক্ষ্য করছিলো আমাদের। মুখের ভাব দেখেই তারা বুঝতে পারলো যে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। সবার মুখে আনন্দের হাসি, কিন্তু কেন যে এত খুশী আমরা কেউই ব'লতে পারব না। হয়তো পৃথিবীর মত বাতাস পেয়ে, পৃথিবীতে আর কোনদিন ফিরে না যেতে পারলেও সেখানকার মত বাতাসে শ্বাস তো নিতে পারবো, সেই ভরসাতেও হ'তে পারে।

মোটর ষ্টার্ট ক'রে দেওয়া হলো। ঘুরে ঘুরে ভেতরের দিকে উঠতে লাগলো আমাদের মহাকাশযান। ওপরে ওঠার সাথে সাথে উষ্ণতা যেন বাড়তে লাগলো এবং ব্যারোমিটারে দেখলাম বাতাসের চাপও ক'মে আসতে আরম্ভ ক'রলো। পাথরের দেওয়াল আবছা আলোয় আলোকিত।

মুচুকুন্দ তখনও তার ঘরে বন্দী। আমি সবাইকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলাম যে ওকে খাবার এবং জল যেন সময়মত দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ যেন একটি কথাও না ব'লে ওর সাথে। বিরাধকে থাকবার জায়গা ক'রে দিয়েছিলাম আমার ঘরে। মাতাল, দেশদ্রোহী মুচুকুন্দের ওপর কোন সহানুভূতি ছিলো না আর। মনে মনে ঠিক ক'রেছিলাম জীবনের কয়েকটা দিন বা বছর ওর সাথে এক জায়গায় না কাটিয়ে কোর্টমার্শাল করে দেবো ওকে। মহাকাশযানের অন্য অভি-যাত্রীদের এবং পৃথিবীর নৌ কিম্বা বিমান বাহিনীর বিচারে ওর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। অন্যান্য জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় এ দিকে মন দেওয়ার সুযোগ হ'য়ে ওঠেনি এতদিন আর সেই জন্যেই মুচুকুন্দ এখনও বেঁচে আছে। আমাদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ভয় কোনটার

ভাগই সে পায়নি।

গর্তের ভেতরে ঢোকবার ২৬ ঘণ্টা পর আর একটা মুখ দিয়ে বেরুলাম। চাঁদের ওপরের পৃষ্ঠের তুলনায় এ জায়গাটা অনেক বেশী সুন্দর-অনেকটা পৃথিবী পৃষ্ঠের মত। পর্বত, উপত্যকা সমুদ্র—সব কিছু যেন একটা আবছা রহস্যময় আলোয় আলোকিত। এখানকার পাহাড়গুলোও চাঁদের ওপরের পৃষ্ঠের মত অদ্ভুত গঠনের আর তেমনি উঁচু। একটু দূরে ঘন বন। গাছপালাগুলো কেমন যেন অপার্থিব—যেন স্বপ্নে দেখা একটা ভৌতিক বন।

বনের ধারে ফাঁকা জায়গা দেখে একটা ছোট নদীর ধারে নেমে প'ড়লাম। হ্যাচগুলো খুলে আমাদের মহাকাশযানের ডেকের ওপর এসে দাঁড়ালাম। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আমরা চাঁদের বাতাসে বুক ভ'রে শ্বাস নিলাম। পৃথিবীর ঘড়ি ও ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সময় এবং তারিখ ২০২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী বেলা ১১টা।

চাঁদের ভেতরের সর্বব্যাপী আবছা আলোর রহস্য ভেদ করাটা তখন আমাদের আসল লক্ষ্য। মাথার ওপর ভাসছে মেঘের টুকরো। মেঘখণ্ডের নীচের দিকগুলোও আলোকিত হ'য়ে উঠেছে ঐ আলোতে। সূর্যের মত কোন উৎস চোখে প'ড়লো না যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঐ আলো। খুব আবছা ছায়া প'ড়ছে সেই আলোতে—পৃথিবীতে মেঘলা দিনে যেমন ছায়া প'ড়তে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর অবশ্য বুঝতে পারলাম দুটো জায়গা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোটা। প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে চাঁদের মাটিতে মেশানো ও পাহাড়ের গায়ের রেডিয়াম এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরির জ্বালা মুখ দিয়ে ভেতরে আসা সূর্যের আলো। যে উত্তাপটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটুকু আসছে সূর্য্যের আলো থেকে। উত্তাপের পরিমাণ সব সময়ে প্রায় ৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মত।

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ এবং কেন্দ্রাতিগ বল, এই দুটো শক্তির আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল একটা কম্বলের মত আটকে আছে চাঁদের গায়ে।

বায়ুমণ্ডল প্রায় ৫০ মাইল পুরু। ওপরের দিকে উঠতে থাকলে বাতাসের ঘনত্ব ক'মতে থাকে, ফলে উঁচু পাহাড় চূড়াগুলো সব সময়েতেই বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে হিমবাহ নেমে আসে ঐ চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ থেকে। বহুযুগ হতে চাঁদের এই পাতাল পুরীর উত্তাপের সমতা রক্ষা হচ্ছে ঐ বরফের ঢাকনাতে। শীত এবং গ্রীষ্মে সামান্য কয়েক ডিগ্রীর তফাৎ হয় উষ্ণতার। প্রায় প্রত্যেক মাসেই ওখানে একটা প্রচণ্ড ঝড় ব'য়ে যায়। যতদূর সম্ভব বিভিন্ন জ্বালামুখ দিয়ে সূর্যের আলো ভেতরে এসে সব জায়গা গুলোকে সমানভাবে উত্তপ্ত করে না। কোন কোন জায়গায় বাতাস বেশী গরম হয়ে ওপরে উঠে যায় তখন আশেপাশের ঠাণ্ডা জায়গার বাতাস ছুটে আসে সেখানে আর তখনই হয় ঘূর্ণী ঝড়ের সৃষ্টি। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও প'ড়ে মুষলধারে। মাঝে মাঝে চতুর্দিক ঢেকে যায় তুষার ঝড়ে। নীচের মেঘের বৃষ্টির জল একটু গরম, বেশ আরামদায়ক। কিন্তু উঁচু মেঘের বৃষ্টির জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা, ঝড় বৃষ্টি যাই হোক না কেন, আলোটা কিন্তু বরাবর এক রকমই থাকে না অন্ধকার নামে কখনও। রাত ব'লে কিছু নেই এদেশে। (ক্রমশঃ)

এই চমকপ্রদ ধারাবাহিক উপন্যাস

"চাঁদের মেয়ে"

নিয়মিত পড়বার বন্দোবস্ত করতে হলে এক্ষুনি গ্রাহক হয়ে পড়ুন!
তাহলে বিশেষ সংখ্যাগুলিও কনশেসনে পেতে থাকবেন।

গ্রাহক চাঁদা ১২৲ টাকা মাত্র!

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্
পোস্টবক্স ২৫৩৯, কলিকাতা-১

নবদ্বীপ ধাম দর্শন করে এলাম। এই তীর্থস্থান দর্শনের সঙ্গে অন্য একটি অভাবিত অচিন্তনীয় দর্শনের অনুভূতি ঘটে গেল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অবিশ্বাস্য। তাই ভ্রমণ বিবরণ, বা শ্রীধামের মন্দিরাদির বর্ণনা না দিয়ে, আমি সেই কৌতূহলোদ্দীপক অভাবনীয় দর্শনের কথাই আজ বলছি।

আগেই বলে রাখি, ঘটনাটির মধ্যে কি বৈজ্ঞানিক সত্য, বা কোন্ ধর্মতত্ত্ব সত্য। অবশ্য বিশ্বাস করা না করা, সুধী পাঠক পাঠিকাদের নিজ নিজ অভিরুচি।

সমস্ত তীর্থস্থান এবং রম্য দৃশ্যাদি দর্শন করার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, সহসা নবদ্বীপ ধাম দর্শন করতে যাবার কোন বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অপ্রত্যাশিত একটি দায়, সেই সুযোগ এনে দিল। জনৈকা প্রৌঢ়া আত্মীয়া বাঁকুড়া থেকে আমার বাসায় এসে, তাঁকে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করিয়ে দেবার বাসনা প্রকাশ করলেন। ছাপোষা মানুষ, ভেবেছিলুম আমি একাই তাঁকে নিয়ে গিয়ে দর্শন করিয়ে আনব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সহধর্মিনীকেও সঙ্গে নিতে হল। ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে রইল।

স্থির করেছিলাম, কোন ধর্মশালায় গিয়ে উঠব। হোটেলে খাওয়া-দাওয়া হবে। কিন্তু জনৈক সহকর্মীর আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত তাঁরই নবদ্বীপস্থ বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। সহকর্মীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহকর্তা গোস্বামী মহাশয়ের এবং তদীয় পত্নীর স্নেহপূর্ণ অন্তরঙ্গ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম।

এইবার ঘটনাবলীর মধ্যে রহস্যের সঞ্চার সুরু হল।

বারান্দায় বসে জানলা দিয়ে চেয়ে ছিলাম। প্রশস্ত আঙিনার মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছ। দু'চারটি এঁচড় দেখা যাচ্ছে। সহসা বোধ হল, এই গাছটি ঠিক এইখানে বসে, আমি যেন আগে কখন দেখেছি। আঙিনার এক পাশে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকার গাছ। গৃহকর্তার চার বছরের শিশুপুত্র একটি গাছ থেকে খেলাছলে অনেক গুলি পাতা ছিঁড়ে ফেলল। দেখেই আমার মনে হল, এখনি ওর বড়দিদি এসে দু'চার থাপ্পড় দেবে। মনে হওয়ার পরমুহূর্তে ঠিক তাই ঘটল।

এই সময় গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথোপকথন হচ্ছে শুনলাম। আমার স্ত্রী বললে, আমাদের দুপুরের খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবেন না, বৌদি। আমরা পথে কোন হোটেলে খেয়ে নেবো।

স্নেহশীলা বৌদিদি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—বেশ তো। চলুন তাহলে ভাই আমরাও সকলে গিয়ে হোটেলে খেয়ে আসি। একদিন বেশ মুখবদল হবে!

কথাটা শুনে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঠিক এই কথাবার্তাগুলি আমি যেন এইখানেই ওদের মুখে অনেকদিন আগে শুনেছিলাম কিন্তু আশ্চর্য! জীবনে আমার এই প্রথম নবদ্বীপ আসা!

এরপর আমরা দুটি রিক্সা ভাড়া নিয়ে তীর্থ দর্শনে বেরুলাম। পথ দেখানোর জন্য সঙ্গে রইল, গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শুভ্রা। আর ঠিক যাত্রার সময়, আমার স্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরে সঙ্গ নিল শুভ্রার ছোট ভাই খোকন।

প্রথমেই গেলাম নির্মীয়মান একটি মন্দির দেখতে। আকাশ স্পর্শী এই মন্দিরটির গঠন এখনও অসম্পূর্ণ। তবু বিগ্রহ বিরাজ করছেন। সুন্দর নয়নাভিরাম তিনটি মূর্তি। দুটি পাশে অন্যান্য মূর্তিও রয়েছে। সহসা মনে হল, এইখানে এসে, এইসব বিগ্রহ আমি যেন আগে কোনদিন দেখে গেছি! আর সেদিনও ঐ কদম-ফুল ছাঁটে চুল ছাঁটা বৈষ্ণবটি এই ভাবেই বিগ্রহের দিকে চেয়ে চেয়ে আঁখি জলে ভেসেছিল!

এখান থেকে বেরিয়েই আমরা গেলাম মণিপুর রাজবাড়ী। বিগ্রহ দর্শন করে ফেরার সময়, শুভ্রা আমাদের রাজবংশের ছোট ছোট বিশেষ ধরণের সারিবদ্ধ সমাধিগুলি দেখাতে লাগল। সহসা বোধ হল, এগুলি যেন আমি আগে কোন সময় দেখেছি। মনে করতে চেষ্টা করতে লাগলাম, কোন সময় এখানে এসেছিলুম কি না। না, যতদূর স্মরণ হল, নবদ্বীপ আসা আমার এই প্রথম।

এই সময় দু'জন মণিপুরী বালক আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম—এরা কি বাংলাতে কথা বলে? শুভ্রা উত্তর দিল—না। চুং ফুং করে। ঐখানেই বকুল তলে একটি বকুল কুড়িয়ে খোকন সহসা মুখে দিল। আমি ব্যস্তভাবে বাধা দিয়ে বললাম—খোকন! ওটা কাঁচা। খেও না, ফেলে দাও।

শুভ্রা বললে—পকেটে রাখো। বীজটা বের করে বাঁশী করে দেবো বাড়ী গিয়ে। শুধু চমকে নয়, অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠলাম। এই ঘটনা, ঠিক এইসব কথাবার্তা কখন যেন হয়েছে, ঠিক এই খানেই! আর সেদিনও আমরা ঠিক এই ক'জনই ছিলাম। একি দুর্ভেদ্য হেঁয়ালি! একই ঘটনা হুবহু দুবার কি করে হয়?

এরপর আমরা পোড়ামা তলা, শ্রীবাস আঙিনা শচীমাতা বিষ্ণু-প্রিয়া মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির, জগাই মাধাই উদ্ধার ক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান এবং মন প্রাণ ভোলানো নয়নাভিরাম বিগ্রহ দর্শন করে বেড়ালাম। আশ্চর্য এই যে, প্রতিস্থানেই আমার বোধ হতে

লাগল, সেখানকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা কথাবার্তা সবই যেন আগে কোনসময় এইভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কবে, কখন, কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। সে কি এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি!

গোবিন্দ মন্দিরে দেখলাম, সবই যেন আগে দেখেছি। এমন কি, যে একজন মুণ্ডিত মস্তক বৈষ্ণব সাধক, শান্ত গম্ভীর ভাবে এক পাশে পায়চারী করছেন, তাঁকেও ঠিক এইভাবেই এইখানে দর্শন করেছি বলে মনে হল।

একসময়ে পোড়া-মা তলায়, অপর একজন সহকর্মীর বাড়ীতে দেখা করতে গেলাম। সদর দরজার সঙ্গে স্প্রিং লাগানো ছোট দরজাটি, ওরা বললেন, নতুন লাগানো হয়েছে। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে হল, এটি ঠিক এই অবস্থায় বহুদিন আগে আমি কোনসময় দেখেছি। আরও আশ্চর্যের কথা, আজকের মত ভঙ্গিতেই সেদিনও শুভ্রাই দরজাটা ঠেলে রেখে ভেতরে ঢোকার সুবিধে করে দিয়েছিল। আর সেদিনও এই সুশ্রী লাবণ্যময়ী কিশোরীটির পরণে ছিল স্কুলের পোষাক। সাদা ব্লাউজ, সবুজ সায়া, জুতো।

অপরাহ্নে ঠিকানা খোঁজ করে, জনৈক বন্ধুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি দুসপ্তাহ আগে নবদ্বীপে এসেছেন। প্রতিবেশী একজন ভদ্রমহিলাকে তাঁর বিষয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি যেভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করে চললেন, সেটা আমার খুবই পরিচিত বোধ হতে লাগল, তাঁর ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গি এবং মৃদু উক্তিগুলি পর্যন্ত।

বন্ধুর মাকে দেখতে পাওয়া মাত্রই আমার মনে হল, উনি এখনই আমার পরিচয় দিয়ে পার্শ্বস্থ জনৈক বৈষ্ণবীকে বলবেন যে, আমি তাঁর ছেলের অফিসের একজন বাবু। একজন বন্ধু, একথা বলবেন না। পরমুহূর্তেই আমার হতচকিত কর্ণকুহরে তাঁর ঠিক উক্ত কথাগুলিই প্রবিষ্ট হল। আরও যে সব কথাবার্তা হল, মনে হতে

লাগল, ঠিক এইসব কথাবার্তা যেন আগে কোন দিন এইভাবে হয়েছে। অথচ বন্ধুর মা, মাত্র এক পক্ষকাল আগে এখানে এসেছেন! তাহলে? একি অদ্ভুত প্রহেলিকা!

আমার বিহ্বল মনের মধ্যে একটা আর্ত বিস্ময় মোচড় খেতে লাগল। যেন অতলান্ত রহস্যের কুটিল আবর্তে আত্মহারা হয়ে আমার সমস্ত চেতনা বিভ্রান্তির যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হতে লাগল বার বার। নিতাই-এর বাড়ীর সামনে দিয়ে ফেরার সময় ভেতরে ঢুকে দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমার স্ত্রী বললে—এখানে তো আমরা দর্শন করে গেছি। স্থানটি সত্যই পরিচিত বোধ হল কিন্তু ভেতরে কি দেখেছি স্মরণ হল না। আবার পরক্ষণেই মনে হল, ঠিক এইভাবেই যেন আর একবার কোন সময় স্ত্রীর এই প্রকার বাধা দানে দর্শন লাভে বঞ্চিত হয়ে আমি এই স্থানটি থেকে ফিরে গেছি।

একসময় পথের ধারে একটি শুষ্ক পুষ্করিণীতে দেখলাম, কালী প্রতিমার বিরাটাকার খড়ের মূর্তি পড়ে আছে। বিসর্জনের পর রঙ, মাটি সব গলে গেছে। এখন শুধু ঠাটটি পড়ে রয়েছে পুকুরটির শুষ্ক গর্ভে। দেখেই মনে হল, এ তো আমি আগেও দেখেছি। পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। আশ্চর্য! নবদ্বীপে আসা আমার জীবনে এই প্রথম। তবে, আমি এই দৃশ্য দেখলাম কবে?

এরপর এলাম সোনার গৌরাঙ্গ দর্শন করতে। শুনলাম, এর সেবায়েৎরা খুব ধনী। কিন্তু এই ধনী ব্যক্তিদের দ্বারী আমাকে বিনাভেটে দর্শন করার অনুমতি দিল না। এর প্রবেশ মূল্য দাবীর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর ঔদ্ধত্য আমাকে ব্যথিত করল। অন্যান্য স্থানের সেবায়েৎদের মত, সবিনয়ে বিগ্রহাদির সেবা পূজা যাওয়ার সাহায্য প্রার্থনার মত নিরীহ দর্শনী চাওয়া নয়—সিনেমা, সার্কাস বা কাঁচের জারে রক্ষিত তিনমুণ্ডু চারহাত শিশু দেখার প্রবেশ মূল্যের মত, এখানকার ভেট দাবীর ভঙ্গিতে এক ধরনের অধিকার বোধের

নগ্নতা, আর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির নির্লজ্জতা প্রকট হয়েছে বলে মনে হল।

বিগ্রহের প্রতি সমস্ত সম্মান এবং মর্যাদা বোধ অক্ষুণ্ণ রেখেই আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি যাও, আত্মীয়াকে দেখিয়ে আনো, আমি যাবো না। ওদের এই সোনার গৌরাঙ্গ, বিগ্রহ নয়—সোনার অহঙ্কার। পয়সা খরচ করে তা' দেখার আমার কোন আগ্রহ নেই।

আমার স্ত্রী সেই প্রৌঢ়া আত্মীয়াকে নিয়ে যখন দর্শন সেরে নেমে আসছে, তখন অকস্মাৎ মনে হল, ওদের এইভাবেই নেমে আসতে দেখেছি আমি বহুদিন আগে, ঠিক এইখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে।

একটি মন্দিরে, প্রাচীর সংলগ্ন রামায়ণ কাহিনীর চিত্রাবলী দেখে বেড়ানোর সময় স্পষ্ট মনে হল, এইগুলি নিশ্চিত ভাবেই আগে কোন সময় আমি দেখে গেছি। মন্দিরের এক পাশে প্রাচীরের বাইরে একটি তরুণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মনে হল, ওকে যেন দেখেছি ঠিক ঐখানে। একজন বৈষ্ণব সাধক একে যেন কিছু দিয়েছিল দেখেছিলাম। পরক্ষণেই স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, সত্যই একজন সন্ন্যাসী মন্দির থেকে বের হয়ে এসে, মেয়েটির হাতে একটি ছোট চরণামৃতের বাটি দিল।

এবার আমার স্ত্রীকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। আমার অনুভূতির কথা শুনে, সে চিন্তান্বিত ভাবে বললে, বহুক্ষণ থেকে আমিও ভাবছি, এসব কি হচ্ছে! এই সমস্ত ঘটনা, এইসব কথাবার্তা সবই তোমার মুখে আমি শুনেছি। প্রায় এক বছর আগে, একদিন ঘুম থেকে উঠে, ভোর বেলা তুমি বলেছিলে এইসব। তোমার সেই সব বর্ণনাগুলি আজ হুবহু মিলে যাচ্ছে। খুব আশ্চর্য! অদ্ভুত!

এতক্ষণে রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচিত হল। মনে পড়ল, এই দিনের প্রত্যেকটি ছোট বড় ঘটনা, এক বছর আগে, সারারাত ধরে একটি আশ্চর্য স্বপ্নের মধ্যে সংঘটিত হতে দেখেছিলাম। ভোরে ঘুম ভাঙতেই স্ত্রীকে বলেছিলাম সেই অদ্ভুত স্বপ্নটির কথা। বলেছিলাম-

কোথায় যেন কোন এক অজানা দেশে গেছি। সেখানে এই সমস্ত ঘটনা হল।

আজ বুঝলাম, সে দেশ শ্রীধাম নবদ্বীপ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এটা কি করে সম্ভব, আর কি এর তাৎপর্য? যা স্বপ্নে দেখেছিলাম, তা বাস্তবে ঘটল। কিন্তু সেই থেকেই শুধু ভাবছি যে, এক বছর আগে কি করে নির্ধারিত হয়ে গেছে—কে কোথায় যাবে, কি করবে, কি বলবে?

আর শুধু দু একজনের নয়, এতগুলি সংশ্লিষ্ট মানুষের অপ্রত্যাশিত কার্য-কারণ সম্বন্ধের এমন সুনিপুণ নিখুঁত সংযোগ এতদিন আগে থেকে নির্দিষ্ট হয়ে থাকা, কি করে সম্ভব? কি এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা?

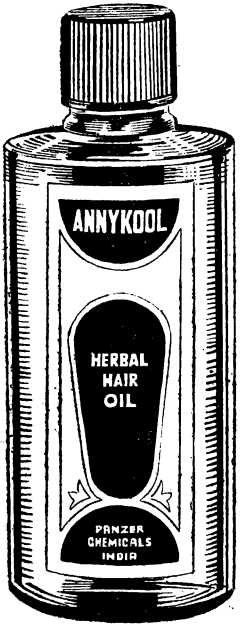

এনিকুল

আয়ুর্বেদিক

কেশতৈল

*

চুলের এবং মাথার
উপকার করার সব
গুণই এতে আছে

উল্কা সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা।

আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাবিশ্বের আর কোথাও জীবনের স্পন্দন জেগেছে কিনা এ প্রশ্ন আজ নতুন নয়। এ নিয়ে গবেষণা চলে আসছে আজ বহু দিন ধরে—ভবিষ্যতেও চলবে। ইদানীংকালে এমন কয়েকটি উল্কাপাত হ'য়েছে পৃথিবীতে, যাদের মধ্যে পাওয়া গেছে জৈব পদার্থের (organic substance) সন্ধান। এগুলো প্রধানতঃ মোম আর এ্যাসফল্ট জাতীয়। পৃথিবীতে এই জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় জৈব পদার্থের ধ্বংসের ফলে। সুতরাং একদল বিজ্ঞানী প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন যে, অন্য জগত থেকে আসা এই সব উল্কাপিণ্ডের ভেতর যখন জৈব পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন সেই সব গ্রহে জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ নিশ্চয়ই আছে। ফ্রাঙ্কফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কে. ক্রেজকীগ্রাফ কিন্তু এ বিষয়ে অন্যমত পোষণ করেন। আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানও অবশ্য উল্কাপিণ্ডে জৈব পদার্থের উপস্থিতি সহজেই প্রমাণ করে দিয়েছে, মহাশূন্যে জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার না করেই।

পুরোনো দিনের কতকগুলো উল্কাপিণ্ড ভালোভাবে পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে পার্থিব জৈব পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। আবার অন্য কতকগুলো উল্কাপিণ্ডে এমন জৈব পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার অস্তিত্বই নেই পৃথিবীর বুকে। ঐ সব উল্কাপিণ্ডে নাইট্রোজেন, গন্ধক, ক্লোরিন ইত্যাদি জাতীয় জিনিষের আভাষ পাওয়া গেছে, যা থেকে জৈব পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কেন্টাকি প্রদেশের মারেতে

যে উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছিলো, সেটা নিয়ে কিছুদিন খুব হৈ চৈ হয়েছিলো। এর মধ্যে এমন জাতীয় জৈব পদার্থ পাওয়া গেছে যাকে রসায়ন বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন Aromatic Heterocycles.

এই জৈব যৌগিক পদার্থটি পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কতকগুলো আবার জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বেন্‌জিন্ Aromatic যৌগিকের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর ষড়ভুজাকৃতি শৃঙ্খলে (Hexagon chain) ছ'টি কার্বনের পরমাণু থাকে, একথা বিজ্ঞানের সামান্য জ্ঞানও যাঁদের আছে তারাও জানেন। এর থেকে একটি বা দুটি কার্বনের পরমাণুকে সরিয়ে নাইট্রোজেনের পরমাণু একটি বা দুটি বসাতে পারলে ইন্‌ডোল (Indole) এবং পিউরিন (Purine) জাতীয় যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

আধুনিক জৈব রসায়নের (organic chemistry) গবেষণায় প্রমাণিত হ'য়েছে যে, প্রাণ সৃষ্টির জন্যে নিউক্লিক এসিডের (Neucleic acid) প্রয়োজনীয়তা প্রোটিনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। এক দিক দিয়ে নিউক্লিক এসিড বরং প্রোটিনের চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়, কারণ নিউক্লিক এসিড প্রোটিন সংশ্লেষণ (Protein synthesis) ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে।

নিউক্লিক এসিড এমন একটা জিনিষ যার মধ্যে থাকে একটা Heterocyclic যৌগিক পদার্থ, যেমন Purine বা Pyrimidin, একজাতীয় চিনি এবং ফসফরিক এসিড। এর বিন্যাস নানাভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব। এই পরিবর্তন জীবনের সংশ্লেষণ সম্বন্ধে অনেক সংবাদই দিতে পারে। মারেতে প্রাপ্ত উল্কাপিণ্ডে যতদূর সম্ভব cytosin যৌগিকের সন্ধান পাওয়া গেছে—যার মধ্যে আছে Pyrimidin এবং চিনি। Cytosin নানা জাতীয় নিউক্লিক এসিডের একটি প্রধান উপাদান।

এই আবিষ্কার আবার টেনেছে বিজ্ঞানীর মনকে মহাজাগতিক প্রাণের সম্ভাবনার দিকে। যদিও নিউক্লিক এসিডের উপস্থিতি জীবনের সম্ভাবনার স্বপক্ষে, তবু সে সম্ভাবনাকে নাকচ ক'রে দিয়েছেন আর একদল বিজ্ঞানী, যেমন করেছিলেন মোম আর এ্যাসফল্ট জাতীয় জিনিষের ক্ষেত্রে। অধ্যাপক ক্রেজকীগ্রাফ উল্কাপিণ্ডে মোম এবং এ্যাসফল্টের উপস্থিতির বিপক্ষে প্রথম যুক্তি দেন যে, উল্কাপিণ্ডগুলোর আকার স্তরীভূত খনিজ পদার্থের মত নয়। যদি তাই হ'তো, তাহলে জৈব পদার্থগুলোর সন্ধান পাওয়া উচিৎ ছিলো

উল্কাপিণ্ডের স্তরের ভেতরে। উল্কাপিণ্ডগুলো বিগত জীবনের ধ্বংসাবশেষ নয়; নতুন জীবনের অগ্রদূত।

বিজারনকারী (Reducing) বায়ুমণ্ডলে মিথেন, জলীয় বাষ্প, কার্বনডাই-অক্সাইড এবং এ্যামোনিয়ার পরিমাণই দেখা যায় বেশী—অক্সিজেন নেই বললেই চলে। বহু বছর আগে একসময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সম্ভবতঃ ঐ সব গ্যাসের অস্তিত্ব ছিল; বর্তমানের জারনকারী (oxidising) বায়ুমণ্ডলকে সে তুলনায় আনকোরা নতুন বললেও ভুল বলা হয় না। ঐ বিজারনকারী বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ প্রবাহ কিম্বা ক্ষুদ্র আলোক তরঙ্গের বিকিরণের ফলে নানা জটিল যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব। প্রোটিন সৃষ্টিকারী এমিনো এসিড এইভাবে সৃষ্টি হ'তে পারে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে একজন জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী এই ক্রিয়াকে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ ক'রে দেখান। পরবর্তী কালে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে শিকাগোতে এবং ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর হামবুর্গ শহরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'য়েছে যে, এ্যামোনিয়াপূর্ণ বিজারক বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে খাঁটি এ্যামিনো এসিড তৈরী করা সম্ভব, যদিও জীবনের কোন চিহ্নই নেই সেখানে। এমন কি পিউরিনের মত জটিল যৌগিক পদার্থও এই উপায়ে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

অধ্যাপক ক্রেজকীগ্রাফের মতে মারের উল্কাপিণ্ডে প্রাপ্ত জৈব পদার্থগুলো ঐ ধরনের বিক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন। এই প্রাথমিক বস্তুই হয়তো উল্কাপিণ্ডে জৈব পদার্থের উদ্ভবের জন্যে দায়ী। জটিল জৈব পদার্থের সৃষ্টির জন্যে অক্সিজেন প্রয়োজন—জীবনের জন্যে তো একান্তই দরকার। অক্সিজেন আসে সম্ভবতঃ গ্রহের অক্সাইড যৌগিক পদার্থ থেকে। অক্সাইডগুলো সাধারণতঃ অবশিষ্ট বস্তু থেকে হাল্কা। আমাদের পৃথিবীর ভেতর যেমন রয়েছে লোহা-নিকেল জাতীয় ভারী ধাতু। কোটি কোটি বছর পর হাল্কা ধাতব অক্সাইড গলিত পদার্থের উর্ধমুখী চাপে উঠে আসে ওপরের পৃষ্ঠে। পৃথিবীপৃষ্ঠ এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানকার প্রতি একক আয়তন স্থানে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ৯২ ভাগ। এই ধাতব অক্সাইড যখন বিজারনকারী বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এলো, তখনই সম্পূর্ণ হ'লো সংশ্লেষণের সর্তগুলো। সুতরাং একথা ভাবা অসঙ্গত নয় যে, ঐ উল্কাপিণ্ডগুলো সম্ভবতঃ এমন কোন গ্রহ থেকে আসে যেখানে রয়েছে বিজারনকারী বায়ুমণ্ডল।

এই জাতীয় বায়ুমণ্ডলের সন্ধান পাওয়া গেছে বৃহস্পতির প্রথম তিনটি

উপগ্রহে এবং শনির বৃহত্তর উপগ্রহ টাইটনের পৃষ্ঠে। এই উপগ্রহগুলোর ব্যাস আমাদের চাঁদের ব্যাসের সাথে তুলনীয়, যদিও ঐ উপগ্রহগুলোর ভর চাঁদের চেয়ে কিছু কম বা বেশী। বৃহস্পতির চতুর্থ উপগ্রহের ব্যাস চাঁদের প্রায় সমান এবং ভরও। কিন্তু সেখানে কোন বায়ুমণ্ডল নেই; আমাদের চাঁদে আছে অত্যন্ত পাতলা বায়ুমণ্ডল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন গ্রহ বা উপগ্রহে বায়ুমণ্ডল থাকা না থাকা তার ভরের ওপর নির্ভর করে না। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে উল্কাপিণ্ডে জৈব পদার্থ প্রাপ্তি সম্বন্ধে নতুন তথ্য জানতে পারা গেছে। বিজ্ঞানীরা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, বায়ুমণ্ডল দিয়ে ঘেরা কোন গ্রহ হয়তো বহু শতাব্দী আগে ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়েছিলো, তারই অংশ আজও এসে প'ড়ে পৃথিবীতে উল্কারূপে; মানুষের মনে জাগায় মহাজাগতিক প্রাণের কল্পনা। আসলে কিন্তু সে সম্ভাবনা যেমন অবাস্তব ছিলো এতদিন তেমনিই রয়ে গেছে।

হতেও পারে!

— — — —

মঙ্গলগ্রহ থেকে দুই নতুন অতিথি কলকাতায় এসে নেমেছে। রাস্তার ধারে একটি মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে, তার সামনে গিয়ে একজন হুকুম চালালো, "তোমাদের নেতার কাছে নিয়ে চলো আমাদের।"

কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ক্ষেপে গেল মঙ্গলী-অতিথি—মেরে দিল ধাঁ করে এক লাথি মোটরগাড়ীটার হেডলাইটে।

"ছিঃ ছিঃ করো কি!" মঙ্গলী-অতিথির সঙ্গীটি বলে উঠ্‌লো, "চশমা-পরা একজন লোককে এভাবে জখম করে নিজেরই অপমান করছো!"

জলের মধ্যে থেকে উঠে আসছে

একটা অদ্ভুত বিকট প্রাণী···

জালার মত মাথা···কিলবিলে হাত পা···!

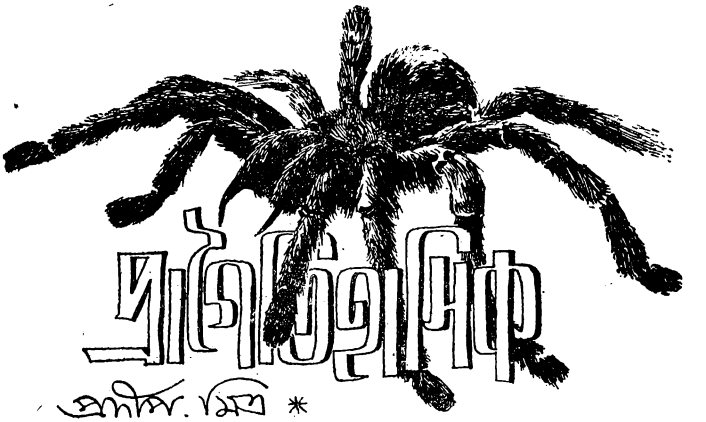

পুকুর না বলে ডোবা বলাই ভাল। কালো পচা জল। পাঁকের দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সুব্রত নাকে রুমাল দিল। রুমালে একটা সেন্টের গন্ধের রেশ তখনও ছিল। তবে সেই মৃদু সৌরভ সামনের পাঁকের ওই সুতীব্র গন্ধকে তাড়াতে পারবে না, সুব্রত বুঝতে পারল।

আজই সবে ও এখানে এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাতে হবে। কেন যে ওকে এইরকম জঘন্য জায়গায় পাঠালো অফিস থেকে! অফিসের ওপর রাগ হল সুব্রতর। তারপরেই ও নিজের ওপর রাগ করল। কেন মরতে জিওলজি পড়েছিলাম। আজ ত ফল ভোগ করতেই হবে।

এই জঙ্গলের মধ্যে ওকে তেল খুঁজতে হবে। মাটির নীচে কোনখানে তেল আছে বার করতে পারলেই ওর দায়িত্ব শেষ।

সুব্রত বাঁ হাতের দুটি আঙুলকে সন্তর্পণে ব্যবহার করে একটা ছোট পাথর তুলে নিল। তারপর সেটা পরীক্ষা করতে করতে উপলব্ধি করল, ওইভাবে আর দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

টুপ্। একটা শব্দ। সুব্রতর ছুঁড়ে দেওয়া পাথরটা ঠিক জলের মাঝখানে পড়েছে। সুব্রত একবার পেছন ফিরে দেখল আর তারপরেই হনহনিয়ে এগিয়ে গেল জীপের দিকে।

সেইরাত্রে সুব্রত স্বপ্ন দেখল। দুরন্ততম দুঃস্বপ্ন। ঘুমের মধ্যেই তার সমস্ত দেহ ভিজে উঠল। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে জবজবে হয়ে গেল। সুব্রত চমকে জেগে উঠল। উঠে আলোটা জ্বালতে চাইল, কিন্তু পারল না। ওর শরীর থেকে প্রতিটি কণা শক্তি যেন কে নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। ও উঠে বসতে চাইল কিন্তু হাত পা নড়ল না। সব অবশ হয়ে গেছে। চীৎকার করে পাশের ঘর থেকে আরদালিকে ডাকতে চাইল কিন্তু গলা থেকে কোন স্বর বেরোল না।

সমস্ত ফরেস্ট বাংলোটা যেন একটা বিশাল বাদুড়ের ডানার নীচে চাপা পড়ে গেছে। আলোকণিকার প্রবেশপথ রুদ্ধ। জমাট অন্ধকারটা সুব্রতর বুকের ওপর চেপে বসতে চাইল।

চোখের ওপর তখনও ভাসছে স্বপ্নের দৃশ্যগুলো। বিকেলের ওই ডোবাটাকেই ও স্বপ্নে দেখেছিল। ডোবাটা থেকেই ত উঠে এল সেই ছায়া ছায়া অশরীরী প্রাণীটা। আকারবিহীন বিকট প্রাণীটা। জলের ওপরে উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল সেটা সুব্রতর দিকে। সুব্রত পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। প্রাণপণ চেষ্টা করল দৌড়বার কিন্তু পারল না। ওর পা দুটোকে কে যেন জোর করে নরম পাঁকের মধ্যে গেঁথে দিতে লাগল। সুব্রত পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল। ততক্ষণে সেই প্রাণীটা, সেই নরকের থেকে উঠে আসা প্রাণীটা সুব্রতর কাছে এসে গেছে। সুব্রত ভয়ে চোখ বুঁজল। আর চোখ বন্ধ করেই শিউরে উঠল তার অপার্থিব ঠাণ্ডা স্পর্শে। তারপরেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

কি করা উচিত এবার? সুব্রত ভাবতে বসল। আলোটা জ্বালার চেষ্টা করবে, ও ঠিক করল। সুব্রত বিছানার ওপর এতক্ষণে উঠে বসল। উঠে বসতে পারল। আট, দশটা কাঠি নষ্ট হবার পর ও হারিকেনটা জ্বালাতে পারল। তারপর উঠে এক গেলাস জল খেয়ে বিছানায় এসে একটা সিগারেট ধরাল।

তখন ওর নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করল। একটা স্বপ্ন দেখে কিনা ও ভয় পেয়েছিল! সিগারেটটা শেষ করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল সুব্রত।

ঘুম এল না। নানা রকমের চিন্তা এসে ওর মাথায় ভীড় করতে লাগল। সুব্রত জেগে শুয়ে রইল।

দেখতে দেখতে একসময় বাইরের অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসতে লাগল। এবার আলো ফুটবে। সুব্রত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা কিসের আকর্ষণে সুব্রত বলতে পারে না—ও আবার গিয়ে সেই ডোবাটার ধারে দাঁড়াল। আর দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। মনে হল যেন কত প্রাচীন পরিবেশে সুব্রত দাঁড়িয়ে আছে। ডোবাটা কত পুরণো। যেন ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই ওটা ওখানে রয়েছে, কত শত সহস্র বছর ধরে। একটা অজানা আশংকার শিহরণ খেলে গেল ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

সূর্য তখন অস্তাচলে। আলো-আঁধারির আবছায়া থেকে রাজ্যের বিভীষিকা এসে জমাট বাঁধছে চারদিকে। জায়গাটার একটা আকর্ষণ আছে, সুব্রতর মনে হল। কাছে থাকলে অস্বস্তি হয় কিন্তু চলে যেতে ইচ্ছে করে না। কাজেই সুব্রতও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডোবাটাকে দেখতে লাগল।

সুব্রতর হঠাৎ মনে হল ডোবাটার জলটা ফুটছে। একটা দুটো করে বুদ্‌বুদ্ থেকে থেকে তৈরী হচ্ছে আর তারপর ভাসতে ভাসতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

সুব্রত একমনে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল। আর সেইভাবে দেখতে দেখতে ও চমকে উঠল। ভীষণভাবে চমকে উঠল। চমকে উঠল, কারণ ডোবার জলে তখন সাংঘাতিক তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেছে। মনে হল যেন জলের নীচে দুটো অপার্থিব দৈত্য তাদের প্রলয়যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে।

সম্মোহিতের মত নিষ্পলক চোখে সুব্রত দেখতে লাগল। দেখতে লাগল ওইটুকু জলের প্রচণ্ড আস্ফালন। তারপর এক সময় জলটা শান্ত হয়ে আসতে লাগল। আর তখনই সুব্রত দ্বিগুণ চমকে উঠল। জলটার মধ্যে থেকে উঠে আসছে একটা অদ্ভুত, বিকট প্রাণী! জালার মত বড় তার মাথা আর হাত পা গুলো কিল্‌বিল্ করছে।

দানবটা জল থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে লাগল। আর সেই সময়

সুব্রতর স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য! হুবহু এই রকম সে স্বপ্নেও দেখেছিল!

সুব্রতর মনে হল জানোয়ারটা ওর দিকেই আসছে। আবার মনে পড়ে গেল স্বপ্নের কথা। মনে পড়ে গেল এর পরেকার ঘটনা। সুব্রত পালাতে চাইল। কিন্তু পারল না! ওর পাগুলো যেন এখন পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। ও তলিয়ে যেতে লাগল। কী সর্বনাশ! সুব্রত শিউরে উঠল।

এদিকে সেই মূর্তিমান বিভীষিকা তখন ওর দিকে এগিয়ে এসেছে। জানোয়ারটার মুখ এবার চোখে পড়ল। ছোটবড় দাঁতগুলো অন্ধকারে চক্‌চক করে উঠল। আর তার চোখগুলো যেন জ্বলন্ত আগুনের টুক্‌রো।

সুব্রত চীৎকার করে উঠল। কিন্তু সে আওয়াজ কেউ শুনতে পেল না। আর কয়েক গজ। সুব্রত লক্ষ্য করল। আর কয়েক গজ এলেই দৈত্যটার একটা বাহু ওকে আকর্ষণ করতে পারবে। তারপর হয়ত প্রচণ্ড শক্তির নিষ্পেষণে গুঁড়ো করে ফেলবে ওকে। আর নয়ত ওই ভীষণ দন্তশ্রেণীর মাঝখানেই শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করতে হবে।

সুব্রত চোখ বুঁজল। যন্ত্রণার আগের মুহূর্তগুলো আর চেয়ে দেখতে চায় না। মৃত্যুর ধীর অগ্রসরমানতা নিজের চোখে দেখা যায় না। কাজেই সুব্রত চোখ বন্ধ করল।

মুহূর্তগুলো যথারীতি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। এক একটা সেকেণ্ড মনে হতে লাগল এক এক ঘণ্টা।

এমনি সময়ে একটি তীক্ষ্ণ চীৎকারে সুব্রত চমকে উঠল। সে চীৎকার গাছ থেকে অন্য গাছে, পাতা থেকে অন্য পাতায় ছড়িয়ে দিল তার হিমশীতল ভয়ংকর প্রতিধ্বনি। এক মুহূর্তে সমগ্র অরণ্যানী মুখর হয়ে উঠল ক্লান্ত পাখিদের আতঙ্ক-মিশ্রিত আর্তরবে।

সুব্রত চোখ চাইল। আর চেয়েই আবার বন্ধ করে ফেলল। ও বিশ্বাস করতে চাইছিল না ও যা দেখল।

একটা অত বড় বাদুড়! কালো কালো পাখা নাড়তে নাড়তে ওইরকম চীৎকার করছিল। আর সামনের ওই প্রাণীটা আকাশে ওর কিলবিলে হাত পাগুলো ছুঁড়ছিল বাদুড়টাকে ধরার জন্যে।

সুব্রত আবার তাকাল। আবার দেখতে পেল সেই দৃশ্য। অতিকায় বাদুড়টা ক্রমাগত নীচের অদ্ভুত জীবটাকে ঠোকরাচ্ছে। সেই সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ চীৎকার

সমস্ত জঙ্গলটাকে তটস্থ করে তুলেছে।

সুব্রত দেখতে লাগল। বিরাট মাকড়সাটা এবার আর পেরে উঠছে না বাদুড়টার সঙ্গে। সুব্রতর মনে হল বাদুড়টাকে যেন অন্য কিসের মত দেখতে। তারপরেই বুঝতে পারল ওটা বাদুড় নয়। ওটা সরীসৃপ যুগের উড়ন্ত সরীসৃপ টেরোড্যাক্‌টিল! তক্ষুণি সুব্রত চমকে উঠল। চমকে উঠল কারণ আজকের যুগে এদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

ততক্ষণে সুব্রত দেখল, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী দুটো জড়াজড়ি করে ডোবাটার মধ্যে পড়ে গেছে। জলটা তোলপাড় হয়ে উঠল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল। জানোয়ার দুটো জলের তলায় তলিয়ে গেল, সুব্রতর মনে হল।

এতক্ষণে সুব্রতর নিজের কথা মনে পড়ল। এবার পালানো দরকার। পাঁকের মধ্যে থেকে পা দুটো তুলবে বলে ও একটা হ্যাঁচকা টান দিল একটা পায়ে। কিন্তু কোথায় পাঁক! ও শুকনো খটখটে ডাঙায় দাঁড়িয়ে! অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত!

তখন আর দাঁড়িয়ে অবাক হবার সময় ছিল না, কাজেই সুব্রত ফেরার পথ ধরল।

পরের দিন সকালে বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু তবু জোর করে সুব্রত উঠে পড়ল। কারণ আগেই ঠিক করে রেখেছিল ডোবাটার মধ্যে কিছু অনুসন্ধানের কাজ চালাবে।

খানিক বাদে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুব্রত। ডোবাটার কাছে যখন পৌছল, তখন সূর্যদেব মধ্য গগন অতিক্রম করে গেছেন।

তারপর আরম্ভ হল খোঁজাখুঁজির পালা। একটা বড় আঁকশির মত জিনিষ কপিকলে করে নামিয়ে দিল ওর লোকেরা। তারপর অধীর আগ্রহে শুধু প্রতীক্ষা করে যাওয়া। প্রথমবার যখন সেটাকে তোলা হল তার সঙ্গে উঠে এল খানিকটা শুধু পাঁক আর পাথরের টুকরো। আর সুব্রত বুঝতে পারল, ডোবাটা অস্বাভাবিক গভীর। পরের বার আরও গভীরে নামিয়ে দিল আঁকশিটা কিন্তু সেবারও সেই একই পরিণতি।

সুব্রত অবাক হতে লাগল। আর একই সঙ্গে ওর চোখের ওপর আগের দিনের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠলো। কী আশ্চর্য! কাল সন্ধ্যেবেলা যা ও নিজের চোখে

দেখে গেছে, নিজের কানে শুনে গেছে, আজ সেসবের কোনও পাত্তাই নেই! সুব্রত ভাবল। অবাক হল। অবাক হল যখন মনে পড়ল আগের দিন এক সময় ওর মনে হয়েছিল ও পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে দেখেছিল, ও শুকনো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে। সুব্রত এর কারণ বুঝতে পারেনি। এখনও পারল না।

ওদিকে আঁকশিটা তৃতীয়বার ওপরে উঠে এসেছে, সুব্রত দেখতে পেল। কুলীরা বিরক্ত হয়ে উঠছে ও বুঝতে পারল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওটাকে আরও একবার নীচে পাঠাতে বলল।

এবার যদি কিছু না ওঠে তাহলে ফিরে যাবে, সুব্রত ঠিক করল। ঘড়ঘড় করে কপিকল থেকে দড়ি নেমে যাচ্ছে ডোবার মধ্যে, ও চেয়ে দেখল। আশ্চর্য! কাল ঠিক ওইখানেই জানোয়ার দুটো ডুবেছিল। সুব্রতর এবার সন্দেহ হল। কালকের সবটাই কি তা হলে সেদিনকার মত দুঃস্বপ্ন! না, তা কিছুতেই হতে পারে না।

আঁকশিটা চতুর্থবার উঠে এল। এবার একটা লম্বা কি যেন আটকানো। সুব্রত এগিয়ে গেল। জিনিষটা পরীক্ষা করল। হাড়। প্রস্তরীভূত হাড়। সুব্রত ওটাকে ধুয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল। আর তারপর চমকে উঠল নিজের অজান্তেই। কারণ ও বুঝতে পারল। বেশ ভাল করেই বুঝতে পারল যে, ওটা প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাক্‌টিলের চোয়ালের একটা অংশ।

সুব্রত ওর লোকেদের কাজ চালিয়ে যেতে বলল। আঁকশি আবার নীচে নেমে গেল। সুব্রতর মনে হল, এই ফসিলের সঙ্গে আগের দিনের দেখা জীবন্ত টেরোড্যাক্‌টিলের কোথায় যেন একটা সম্বন্ধ আছে কিন্তু কি সে সম্বন্ধ সুব্রত তা বুঝতে পারল না। যাই হোক, ও আবার ফসিলটাকে ভাল করে পরীক্ষা করল। করে নিঃসন্দেহ হল যে, ওটা সত্যিই টেরোড্যাক্‌টিলের চোয়াল।

দুদিন ধরে সমানে কাজ চলল। শেষকালে যখন পাঁক ছাড়া আর কিছু উঠছিল না, তখনই সুব্রত কাজ বন্ধ করার হুকুম দিল।

ডোবাটার পাড় অসংখ্য প্রস্তরীভূত হাড়ে ভরে গিয়েছিল। সুব্রত ঠিক করল এই হাড় জোড়া লাগিয়ে এর মালিকদের একটা কাঠামো তৈরী করবে।

তারপর আরম্ভ হল সুব্রতর অক্লান্ত পরিশ্রম। একটা একটা করে হাড় লাগানো সহজ নয়। কাজেই সুব্রতর সময় লাগল।

যেদিন শেষ ফসিলটা ও ঠিক জায়গায় লাগাতে পারল, সেদিন একটা অবর্ণনীয় খুশীর ব্যগ্রতা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ওর সামনে তখন পড়ে ছিল দুটো কঙ্কাল। একটা টেরোড্যাক্‌টিলের আর অন্যটা মাকড়সার মত দেখতে বিরাট একটা অজানা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর!

সেরাত্রে সুব্রতর ঘুম হল না। ও কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারল না। ওর দেখা সেই সন্ধ্যার ঘটনার সঙ্গে এই দুটো প্রাচীন জীবের কঙ্কাল পাওয়ার মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। তবে এটুকু মনে হয়েছিল যে, দুটোর মধ্যে একেবারে কোন মিলই নেই, এ হতে পারে না।

পরের দিনই সুব্রত ওর রিপোর্ট লিখল।

এরপর প্রচুর গবেষণা চলল ওই দুটো কঙ্কাল নিয়ে। সুব্রতর নামও কাগজের পাতায় পাতায় মুদ্রিত হল কয়েকবার। কাগজে কাগজে লেখা হল কিভাবে সুব্রত এতদিনের অজানা একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীর কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সুব্রতর প্রশ্নের সমাধান কেউ দিতে পারে নি।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটার একটা আবছা ব্যাখ্যা সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছিল।

সুব্রতর মনে ছিল, ও একবার কাগজে পড়েছিল জাপানে আণবিক বোমা পড়ার সময় কোন একটি সেতুর ওপর দিয়ে একটি মেয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি সেই সেতুসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার বহু বছর পরে আজও নাকি মাঝে মাঝে দেখা যায় তাকে সেইখানে সেইভাবে। বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, আণবিক বিস্ফোরণের ফলে ওখানকার ইথারে নাকি ওই ধরণের একটা ছাপ থেকে গিয়েছিল যার ফলে কয়েকটি বিশেষ সময়ে কয়েকটি বিশেষ কোণ থেকে ওই দৃশ্য চোখে পড়ে।

এই ব্যাপারেও সুব্রতর মনে হয়েছিল এই রকম কোন ঘটনাই ঘটে থাকবে। হাজার হাজার বছর আগেকার কোন ঘটনার ছায়া ধরে রেখেছিল এখানকার ইথার আর সেটাই সম্ভবত সুব্রতকে দেখিয়েছে এত দিন বাদে।

তবে অন্য রহস্যগুলো রহস্যের অন্ধকারেই থেকে গেছে, কেউ আর তাদের আলোক স্পর্শ করাতে পারে নি।

*

নাগ-নিকেতন

গৌরীশংকর দে

দ্বিতীয় সিগ্রেটটি ধরিয়ে, বেশ আয়েস করে একটা টান দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর বাবু তার জীবনের অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি বলতে শুরু করলেন।

আমরা, মানে জন ক'য়েক যাত্রী বসে আছি চুঁচুড়া রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। সবার সঙ্গে সবার সম্ভবত এই প্রথম এবং শেষ আলাপ। গাড়ি আসতে এখনো মিনিট চল্লিশেক বাকি। তাই খানিকক্ষণ উসখুস করে সর্বাঙ্গসুন্দর বাবু শেষ পর্যন্ত এই গল্প ফেঁদেছেন। আমরাও নড়ে চড়ে তার চারিদিকে গোল হ'য়ে বসেছি। তিনি বলতে লাগলেন :

"পেশায় আমি একজন খুদে এঞ্জিনীয়র। মহারাষ্ট্রের একটা এলাকায় রেলপথ বৈদ্যুতিক করণের কাজ চলেছে। জায়গাটা পুণা থেকে মাইল সত্তরেক দূরে। পাহাড়ী এলাকা। রীতিমতো দুর্গম। তবে এমন সুন্দর যে, নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে চারিদিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে আসে।

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুঁতখুঁত করার স্বভাব আমার নয়। সারাদিন কাজ করি, আর রাতে সরকারী তাঁবুতে থাকি। আমার সঙ্গী মাত্র দু'জন। সার্ভেয়ার রামকিষণ। আর শিউচরণ। আমাদের খাবার-দাবার ইত্যাদির দায়িত্ব ওর ওপর।

বৈকালিক ভ্রমণের অভ্যাস আমার সেই ছেলেবেলা থেকে। এখানে, এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এসেও, বদ অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি। সঙ্গীদের বারণ সত্ত্বেও নয়। বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের পৃথিবী যেন লক্ষ হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। যেন আগে থেকে কাকে কথা দিয়ে রেখেছি। আমাকে বেরুতেই হবে। পাহাড়ের ছায়া ঘন হ'য়ে ওঠে, ম্লান হ'তে হ'তে অস্পষ্ট হ'য়ে যায় গাছপালা। আমি একাই বেরুই অচেনা পথে। সঙ্গে থাকে একটা লাঠি আর একটা মাঝারী সাইজের টর্চ। দু এক দিন পথ হারিয়েও ফেলেছি। খুঁজতে

বেরিয়েছে সঙ্গীরা। নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে। ভেবেছি, কাল থেকে আর বেরুব না। কিন্তু বিকেল আসতেই সে সংকল্প ভেসে গেছে মাতালের সুরা-ত্যাগের প্রতিজ্ঞার মতো।"

গৌরচন্দ্রিকাতেই অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছেন দেখে আমরা একটু অধৈর্য হ'য়ে উঠেছিলুম। তা টের পেয়েই যেন সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু আসল ঘটনায় এসে পড়লেন :

"একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়িয়েছি। অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছিলুম। হঠাৎ খেয়াল হতেই তাকিয়ে দেখি, যে এলাকায় এসে পড়েছি তা আমার একেবারেই অপরিচিত।

এ-পথে সে-পথে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রেও তাঁবুতে ফেরার পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। বুঝলুম, আজো আমাকে পদ্মাদের সহৃদয়তার ওপর নির্ভর করতে হবে।

তবে চারদিকে দিনের মতো ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এই যা রক্ষে। কৃষ্ণপক্ষ হ'লে দুর্গতির সীমা থাকত না। সেই জ্যোৎস্নায় চারিদিকের পাহাড় আর গাছপালা কেমন অপার্থিব লাগছিল। যেন পথ ভুলে পরীর দেশে এসে পড়েছি।

পথটা একবার উঁচু, একবার নিচু হ'য়ে কোথায় গেছে কে জানে। চড়াই উৎরাই ভেঙে চলতে মন্দ লাগছিল না।

একটা জায়গায় উঁচু থেকে নিচুতে নামতেই হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ চোখে পড়ল একটা পুরোনো দুর্গ। মহারাষ্ট্রে এ রকম দুর্গ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এ-গুলির সাহায্যেই শিবাজী দুর্জয় প্রতিরোধে দাঁড়িয়েছিলেন পরাক্রান্ত মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে।

দুর্গটা পথের একেবারে ধারে। আকৃতি গথিক রীতিতে তৈরী গির্জের মতো। উপরের অংশটা কবে ভেঙে গেছে। কেবল আজো টিঁকে আছে নিচের দিকটা। পথ আর দুর্গের মাঝখানে একটা পরিখা। পরিখার পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর মূল দুর্গ। সেই ফাঁকা জায়গায় কতগুলি ছায়া দেখা গেল। মনে হল জ্যোৎস্নায় সেগুলি নড়া-চড়াও করছে।

অদ্ভুত এক কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে পা চালিয়ে দিলুম সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখতে পেলুম, পরিখায় জল সামান্যই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু জায়গাটাতে কেমন একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। পরিখার অপর পাড়ে চোখ পড়তেই সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলুম। এমন দৃশ্য জীবনেই কখনো আমি দেখিনি। দেখার কল্পনাও করিনি। আর কেউ কখনো দেখেছে কি না আমার সন্দেহ আছে।

পরিখার ওপারে ফাঁকা জায়গাটাতে খেলা করছে অগুণতি সাপ। সংখ্যায় অন্তত হাজার ক'য়েক হবে। ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলা-ফেরা করছে। মনে হচ্ছে অসংখ্য জীবন্ত জলের স্রোত ব'য়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। কখনো তরতর ক'রে উঠে পড়ছে গাছে। তখন দেখাচ্ছে অবিকল লতার মতো। কয়েকটি তো চোখের নিমেষে কুণ্ডলী পাকিয়ে পরের মুহূর্তেই খুলে যাচ্ছে অনায়াসে। মাঝে-মাঝে ফণা তুলছে শূন্যে। চাঁদের আলোতে চকচক ক'রে উঠছে ধাতব চামরের মতো। কোনোটি অতবড় মোটা শরীর অতি সহজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সরু গর্তের ভেতরে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এত সব কাণ্ড যে করছে তাতে যেন একটি পেশী বা হাড়েরও ব্যবহার মোটেই হচ্ছে না।

হাজার-হাজার-সাপ বিদ্যুত গতিতে চলাফেরা, জড়াজড়ি করছে একে অন্যের সঙ্গে, চলে যাচ্ছে একে অন্যের ওপর দিয়ে। মনে হল এক বিচিত্র সমুদ্র দেখছি। ওঠানামা করছে ঢেউ। মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ বাতাসে মতো একরকম হিস হিস শব্দ ছাড়া আর কোনো রকম আওয়াজ নেই। সমস্ত ব্যাপারটা তাই আরো বেশি রহস্যময়, ভয়াবহ মনে হচ্ছে।

এতদিন সাপ সম্পর্কে যে—সব গল্প শুনেছি, যে—সব কথা পড়েছি একসঙ্গে মনে ভিড় ক'রে এল। প্রাচীন কালে সাপকে মানুষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। সাপ ছিল তখন জ্ঞান আর সম্পদের প্রতীক। সাপের জন্যই মানুষকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হ'য়েছিল, খ্রীষ্টানদের শাস্ত্রে আছে। মধ্যযুগে সাপকে মনে করা হত জাদু আর অশুভ শক্তির প্রতীক। অন্ধকার গুহায় আর সমুদ্রের নিচে সাপ ফণা তুলে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে এমন গল্প কত পড়েছি। সেই সব গল্প এখন অতি সত্য আর বাস্তব ব'লে মনে হতে লাগল। নাগ-নাগিনীর অপ্রাকৃত শক্তিতে ক্রমেই যেন আমি বিশ্বাসী হ'য়ে পড়ছিলুম। এই সর্পপুত্রদের মধ্যে শেষনাগ স্বয়ং নিশ্চয়ই আছেন। নাগলোক ত্যাগ ক'রে তিনি সদলে উঠে এসেছেন এখানে। কী অভিপ্রায় কে জানে!

সেই মুহূর্তে সভয়ে লক্ষ্য করলুম ওরাও আমাকে দেখতে পেয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পেলুম আলোড়িত নাগ-সমুদ্র আরো আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে। আর সেই সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ক'য়েক শ সাপ এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে পরিখার ধারে। একেবারে খাঁটি গোখরো। গায়ের রং হলদে—বাদামী এক একটি লম্বায় অন্তত ছ ফুট হবে। শরীরের তিন ভাগই এখন শূন্যে। মারাত্মক ক'য়েকশ ফণা দুলছে এ-দিকে ও-দিকে। কাচের মতো চোখে, কেমন ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে

আছে আমারই দিকে। একেবারে না ব'লে ক'য়ে যে প্রাণীটি ওদের আপন জগতের রহস্য হঠাৎ দেখে ফেলেছে, তাকে ওরা দেখে নিচ্ছে কুটিল চোখে। লকলকে আগুনের শিখার মতো মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে চেরা জিভ। আমার দিকে তাকিয়ে ওরা যেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে হাসছে। সঙ্গে-সঙ্গে ওপার থেকে ভেসে এল উৎকট গন্ধ।

পরের মুহূর্তেই যা দেখলুম প্রচণ্ড আতংকে আমাকে পালানোর কথা ভাবতে হল। ক'য়েকটা সাপ নেমে পড়েছে সেখানে। বাকিরাও তৈরী হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য। এই ক'য়েক শ জীবন্ত মৃত্যুদূত একবার কাছে এসে পড়লে, দৌড়ে যিনি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন, তার পক্ষেও নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন হবে। শুধু সে-কথা ভেবেই যে-পথে এসেছি পা-দুটি ছুটিয়ে দিলুম সে-দিকে। বিপদে পড়লে যে মানুষ ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটতে পারে, নিজেকে দিয়ে সে-দিন তার প্রমাণ পেলুম।……"

সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু থামলেন। প্লাটফর্মে গাড়ি এসে ঢুকছিল। সবাই ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে গেলুম সামনের দিকে। আমি যে কামরায় উঠে পড়লুম সেখানে ওয়েটিংরুমে চেনা মানুষগুলির একজনও নেই। মনে একটা কথা এল—সর্বাঙ্গসুন্দরবাবুর কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে ওই এক জায়গাতে এত সাপ জড়ো হ'য়েছিল কেন? সে কি নেহাৎই কাকতালীয় ব্যাপার? না কি এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে? কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াবার পর অনেক খোঁজা-খুঁজি ক'রেও বক্তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু বিপুল জনারণ্যে চিরকালের মতোই মিশে গেছেন।

রকেট বই বেরুলো!

মঙ্গলের ভয়ানক রক্তমণি

শ্রীধর সেনাপতি

লাল আগুনের জ্বলন্ত গোলা···মঙ্গলগ্রহের বিভীষিকা···
রকেট ফুটো করে ফেলে···ধ্বংস করে ফেলে···নিস্তার
পাবার কি উপায়? একে একে মারা পড়ে মহাকাশচারীরা!
সত্যি সত্যি চাঞ্চল্যকর দুঃসাহসে ভরা উপন্যাস।
বোর্ড বাঁধাই, দাম মাত্র টা ১·৭৫।

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্
মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক
পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা ১

সমুদ্রে
কত
সম্পদ !

[একটি সত্যিকারের ছবি-গল্প]

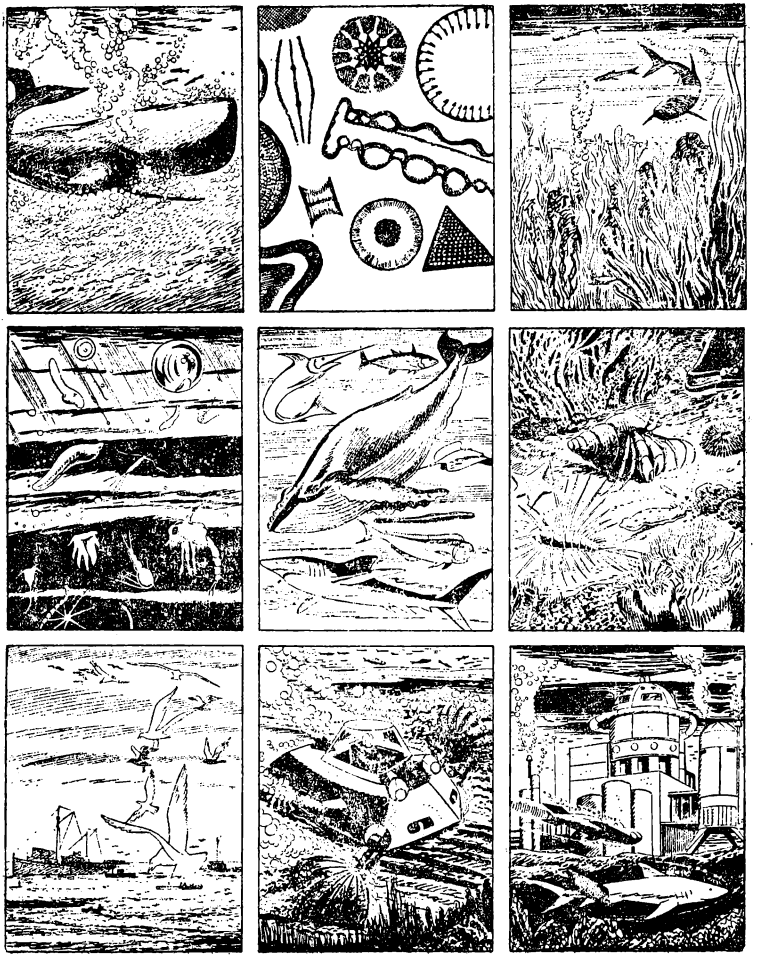

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

প্রথম সারি

প্রথম ছবি—সমুদ্রের প্রাথমিক খাদ্যই হলো উদ্ভিদ জগৎ—ডাঙার ওপরে যেমনটি দেখা যায়, ঠিক তাই। জলের তলায় বেজায় তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে এসব গাছপালা। প্রোটিন খুব বেশী পরিমাণে থাকে এদের কোষে। বেশীর ভাগ উদ্ভিদই অনুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না ভাসতে থাকে তারা জলের ওপর। এই সব খুদে খুদে গাছপালা আর প্রাণীজীবনকে একত্রে বলা হয় "Plankton"—এরাই হলো সমুদ্রের পুষ্টিকর "সুপ"।

দ্বিতীয় ছবি খাবারের উৎস হিসেবে মানবকুলের কাছে আরও দরকারী হয়ে উঠবে সমুদ্রের উদ্ভিদজগৎ। আমেরিকায় গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে এককোষী গাছের চাষ করে একর পিছু ২০ টন খাঁটি প্রোটিন উৎপাদন করা সম্ভব। এই ধরনের সামুদ্রিক চাষবাস সত্যি সত্যিই লাভজনক কি না তা যাচাই করার জন্যে ইতিমধ্যেই একটা পাইলট প্ল্যান্ট বসানো হয়ে গেছে সেদেশে।

তৃতীয় ছবি আমরা যাকে সামুদ্রিক গুল্ম বলি, তারা কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রাণী তো বটেই, মানুষদের কাছেও দারুণ দরকারী। কেল্প নামের একরকম গুল্ম তো জাপানীদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। ভেষজশিল্প, রাবার, বস্ত্রশিল্প, চামড়া, মৃৎশিল্প প্রভৃতিতেও কাজে লাগে বিবিধ সামুদ্রিক গুল্ম।

দ্বিতীয় সারি

প্রথম ছবি—সমুদ্রের বাসিন্দাদের তিনভাগে ভাগ করা যায়—ভাসমান প্রাণী, সাঁতারু প্রাণী আর জলতলনিবাসী প্রাণী। এককোষী প্রোটোজোয়া এবং মাছ কাঁকড়া, চিংড়ি আর সামুদ্রিক পোকামাকড়ের লার্ভার মত খুদে খুদে প্রাণীরাই হলো ভাসমান বাসিন্দা। স্রোতের টানে ভেসে চলে এরা। খিদে পেলে খায় এমনি সব গাছপালা আর জান্তব প্ল্যাঙ্কটন যাদের অনুবীক্ষণ ছাড়া দেখাই যায় না। বড় প্রাণীদের খিদে পেলে কিন্তু এই খুদে ভাসমান বাসিন্দাদের ধরে চটপট গিলে ফেলে।

দ্বিতীয় ছবি—ঝানু সাঁতারু বাসিন্দাদের সবরকম গভীরতাতেই দেখতে পাওয়া যায়। এদের দলে আছে মাছ আর সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জীব। জলচাপ আর উষ্ণতা অনুসারে নির্দিষ্ট জলস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে এদের লম্ফঝম্প। পরি-

পার্শ্বের সঙ্গে দৈহিক ক্ষমতাকে খাপ খাইয়ে নেয় সাঁতারুরা। চেহারা আর খাওয়ার বৈশিষ্ট্য, আত্মরক্ষার পদ্ধতি জলের গভীরতা, জলের চাপ আর দেখতে পাওয়ার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

তৃতীয় ছবি—জলতলনিবাসী প্রাণীদের মধ্যে ফেলা যায় কাঁকড়া, চিংড়ি, শুক্তিদের। এরা সমুদ্রের তলায় জমির ওপর গুঁড়ি মেরে ঘুরে বেড়ায় অথবা কোনো পাহাড় বা অন্য প্রাণীদের গায়ে লেগে থাকে। কতকগুলো স্পঞ্জ, নরম প্রবাল, সামুদ্রিক সজারু ইত্যাদিদের দেখতে ফুল বা গাছ মনে হলেও আসলে তারা প্রাণী।

তৃতীয় সারি

প্রথম ছবি—আজকের জেলেরা এখনও পুরোনো পদ্ধতিতে মাছ ধরে। এদের মধ্যে কেউ অবশ্য আধুনিক হাতিয়ারের সাহায্য নেয়। যেমন এরোপ্লেন থেকে মাছের বসতি লক্ষ্য করে রেডিও টেলিফোনে খবর দেয় জেলে-নৌকোদের। তারপর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বলে দেয় কতখানি গভীরে বিহার করছে মৎস্যকুল। কিন্তু আরও উন্নত পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে হবে—প্রতি বছরেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে—কাজেই সবার খাবার জোটাতে হলে সেকেলে পদ্ধতি বর্জন করতে হবেই।

দ্বিতীয় ছবি বিজ্ঞানীরা অবশ্য মাছের চাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। "সমুদ্রে বাগান" তৈরীর এই হলো প্রথম ধাপ। মানুষ শুধু বীজ 'পুঁতবে,' নধরকান্তি করে তুলবে, তারপর কাস্তের বদলে জাল নিয়ে তুলে আনবে শস্য অর্থাৎ মাছদের—ডাঙায় জমি চাষ করার মতই। সাবমেরিন ট্রাক্টর দিয়ে চলবে এই সব চাষবাস। শুরু হবে মানুষের ইতিহাসে আর একটি নতুন যুগ—"জলচাষের যুগ"।

তৃতীয় ছবি—ঐ দেখুন আগামীকালের সেই রূপকথার মত ছবি—আজকে যাকে আমরা সায়ান্স ফিকশন বলবো—তাই। সাগরতলে শহর, গোলাবাড়ী আর খনি বানিয়ে ফেলবে মানুষ—এতটুকু অপচয় হতে দেবে না। এই বিশাল জলধি সম্পদকে। একজন বিখ্যাত জলতল বিশেষজ্ঞ বলেছেন—"মানুষ সমুদ্র থেকে এসেছে—আবার সমুদ্রেই ফিরে যাবে।" সম্প্রতি বাহামায় আমেরিকান নেভী এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে এই ভবিষ্যদবাণীকেই বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্যে।

[শেষ]

আগামী সংখ্যায় নতুন ছবি-গল্প

কোলে

মেরী

বিস্কুট

PPS/KB-6/64-BEN

কোলে বিস্কুট কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১০

পথ চলতে মনে রাখবেন—১

অল্প স্বল্প, নিতান্ত প্রয়োজনীয় মালপত্র সঙ্গে করে আপনি রেলের কামরায় ঢোকামাত্রই দেখবেন সহযাত্রীরা যেন হাসিমুখে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। কারণ আপনার মালপত্র যত্রতত্র না ছড়িয়ে, অন্য যাত্রীর বসার অসুবিধা না ঘটিয়ে সহজেই বেঞ্চের তলায় বা সুবিধামত জায়গায় রাখা যায়।

যাত্রাপথে অপ্রয়োজনীয় বাড়তি মালপত্র স্বচ্ছন্দে লাগেজ ভ্যানে রেখে দিতে পারেন।

অল্প মাল নিয়ে চলুন, এতে আপনারও আরাম, অন্য যাত্রীদেরও স্বস্তি। সবাই আপনাকে সহযাত্রী হিসাবে পেতে চাইবে

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

আশ্চর্য !

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ সংখ্যায়
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের চাঞ্চল্যকর গল্প
"চাঁদের মেয়ে" ধারাবাহিক উপন্যাস,
আরো অনেকগুলি আশ্চর্য গল্প
দাম এক টাকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা

Printed and Published by A. Bardhan,
Alpha-Beta Publications, Post Box 2539, Calcutta 1

["মামাবাবুর নিদ্রাভঙ্গ" গল্পের শেষাংশ : ১৬৮ পৃষ্ঠার পর]

বেশ চলুন।—মিঃ ভোরা বিরক্তি ভরেই উঠলেন।

ঘর থেকে বারান্দা পেরিয়ে নিচে গিয়ে জীপ থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলেই মামাবাবু প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন,—এ কি ব্যাপার!

গত কয়েক মিনিটের কথাবার্তায় মাথাটা কেমন গুলিয়েই ছিল, মামাবাবুর হঠাৎ এ আর্তনাদে একবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

কি হল কি মামাবাবু?—জিজ্ঞাসা করলাম দিশাহারা হয়ে।

ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে গেছে!—মামাবাবুর হতাশ চেহারা,—অথচ এ বাগানে ঢোকা পর্যন্ত কোথাও ফুটো ছিল না আমি জানি।

কি বেরিয়ে গেছে, কি!—মিঃ ভোরা বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠলেন,—কার্ডবোর্ডের বাক্সে ত পোকা রাখবার পিপেই দেখছি। ও থেকে লেডীবার্ডগুলোই বেরিয়ে গেছে ত?

হ্যাঁ।—মামাবাবু কেমন একটু অদ্ভুত ভাবে মিঃ ভোরার দিকে তাকালেন।

তাতে আর হয়েছে কি?—মিঃ ভোরা ব্যঙ্গ করে বললেন,—ওগুলো বেরিয়ে আমার বাগানেই ছড়িয়ে গেছে এতক্ষণে।

তবু নিজের হাতে আপনাকে দিতে পারলাম না।—মামাবাবুকে অত্যন্ত দুঃখিত মনে হল,—ওগুলো ঠিক সাধারণ লেডীবার্ড ত' নয়। বিশেষ জাতের।

বিশেষ জাতের!—মিঃ ভোরার গলার স্বর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

হ্যাঁ,—মামাবাবু যেন কাতরভাবে বললেন,—আমেরিকা থেকে স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে আনিয়ে আপনার প্রতিবেশী মিঃ চালিহাকে তাঁর বাগানে ছাড়বার জন্যে যা আপনি উদারভাবে সরবরাহ করেছেন গত এক বছর, এ সেই বিশেষ জাতের লেডীবার্ড, এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস্!

আপনি !—আপনি !—মিঃ ভোরার মুখ দিয়ে যেন ফেনা উঠবে মনে হ'ল,—আপনি আমার বাগানে ওই পোকা ছেড়েছেন ! ইচ্ছে করে পিপের জালে ফুটো করে এনেছেন ও পোকা ছাড়বার জন্যে !

আজ্ঞে, উপকারের প্রতিদান ত' দিতে হয় !—মামাবাবু বিনয়ের অবতার,—আমার বন্ধু চালিহার জন্যে আপনি যা করেছেন তার একটু শোধ না দিলে চলে ? এক লক্ষ পঁইত্রিশ হাজার আন্দাজ ওই পোকা আপনার বাগানে এতক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ থেকে কোটি হতে ওদের কত আর দেরী হবে ? আপনার এ বাগান জলের দরে নামতে বা কতক্ষণ ! লেডীবার্ডের মধ্যে ওই বিশেষ জাতের পোকাই উপকারের বদলে চরম সর্বনাশ করে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বড় বড় বাগান এক সময়ে ওই পোকার উৎপাতে ছারখার হয়ে গেছল। কিন্তু আপনাকে এ সব বলে আবার মার কাছে মাসির গল্প করছি। আপনি সব জেনে শুনেই আশপাশের সমস্ত বাগানের দর নামিয়ে সস্তায় কিনে নেবার ফন্দিতেই ত সাহায্যের ছলে ওই পোকা অন্যদের এতদিন বিলিয়েছেন !

মিঃ ভোরার তখন প্রায় হাত পা খিঁচে ফিট হবার অবস্থা। হিংস্র চিৎকার করে বললেন,—আপনাকে আমি গুলি করব। আমার ও গেট যে বিদ্যুতের সাহায্য ছাড়া খোলে না বা বন্ধ হয় না, তা দেখেছেন। বেরুবার উপায় আপনার নেই। আমার বাগানে চুরি করে ঢুকেছেন বলে আমি আপনাকে গুলি করে মারব।

না, না ওসব হাঙ্গামায় যাবেন না।—মামাবাবুর গলা স্নিগ্ধ শান্ত, —আহাম্মকের মত নেহাৎ অসহায়ভাবে কি আপনার বাগানে ঢুকেছি মনে করেন। লালবাজার মারফৎ আসাম পুলিশকে সব জানিয়ে তবে এখানে ঢুকেছি। গেটের বাইরে একটু চেয়ে দেখুন, পুলিশ জীপের হেডলাইটগুলোও তাহলে দেখতে পাবেন ! আচ্ছা নমস্কার। সুবোধ ছেলের মত গেটটা খোলার ব্যবস্থা করুন গিয়ে।

মামাবাবুর সঙ্গে জীপে চালিহার বাগানে ফিরতে ফিরতে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আর সবই ত বুঝলাম। কিন্তু ওই এপিল্যাক্যা বোরিয়ালিস্ পোকার পিপে তোমার নিচের ঘরে কোথা থেকে এল? আনলেই বা কে?

এল আর কোথা থেকে?—মামাবাবু হাসলেন,—ওই মিঃ ভোরার বাড়িরই গোপন গোডাউন থেকে!

তার মানে তোমার জানলার দড়ি বেয়ে যে উঠেছিল সে-ই ওই পিপেটা চুরি করে এনেছিল। কিন্তু সে কে! সে বন্ধ বাড়ি থেকে উধাও হ'লই বা কেমন করে?

শক্ত মানের বদলে সোজা মানেটা খুঁজলেই বুঝবি।

যেমন?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

যেমন সে লোকটা বাইরের কেউ নয় বাড়িরই লোক। তাই উধাও সে হয়নি, বাড়িতেই ছিল।

তার মানে?—সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—তার মানে রঘুবীর যখন হ'তে পারে না, তখন তুমিই পিপেটা চুরি করে জানলা বেয়ে উঠেছিলে! কিন্তু জানলা বেয়ে কেন? নিচের দরজা দিয়ে ঢুকলে কি হ'ত?

ঢুকলে রঘুবীর জানতে পারত। সে ভোরার চর। আমি চালিহার বাগানের ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছি জেনে ভোরা আমার ওপর পাহারা রাখতে চেয়েছিল। আমি ইচ্ছে করেই তাই মঙপোকে বুঝিয়ে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিয়ে ভোরার দেওয়া লোক নিয়েছিলাম তার বিশ্বাস জাগাবার জন্যে।

এর পর আমার পক্ষে নির্বাক হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি!

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী
সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী
তাহা নহে, মস্তিস্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ
তৈল

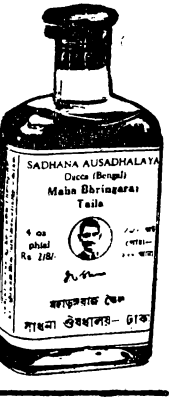

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস, (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

SA 5/60

সুখী মন

এই ঝঞ্ঝাটের দিনে প্রত্যেকেরই একান্ত দরকার

সুখী মন

জটিল জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ দেখাবে

সুখী মন

এমন একখানি অভিনব বাংলা মাসিকপত্র যা এতদিন প্রত্যেক বাঙালী পাঠক-পাঠিকা খুঁজছিলেন

*

মনোরম গ্রন্থ ও 'আশ্চর্য !' পত্রিকার প্রকাশক অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌সের উদ্যোগে এবার প্রকাশিত হচ্ছে

সুখী মন

যে মাসিকপত্রে সুখী জীবন যাপনের সহজ সরল ঘরোয়া আলোচনা পাবেন—আপনার মনের কথা, সাফল্যের কথা, জটিল সমস্যামূলক প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব পাবেন !
এরকম পত্রিকা বাংলাদেশে আর নেই।

*

প্রথম সংখ্যা বেরুচ্ছে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা মাত্র
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫ টাকা মাত্র
(ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহক নেওয়া হয় না)

'আশ্চর্য !' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ কনশেসন !

'আশ্চর্য !' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণ মাত্র চার টাকা পাঠালেই এই অভিনব **'সুখী মন'** পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার সুযোগ পাবেন। টাকা পাঠাবার ঠিকানা :

ALPHA-BETA PUBLICATIONS
97-1 Serpentine Lane,
Calcutta 14

Regd No. C.118 ● Central R. N. 8536/63
January 1965 ● ASCHORJO
Special Anniversary Number ● Rs 1.75

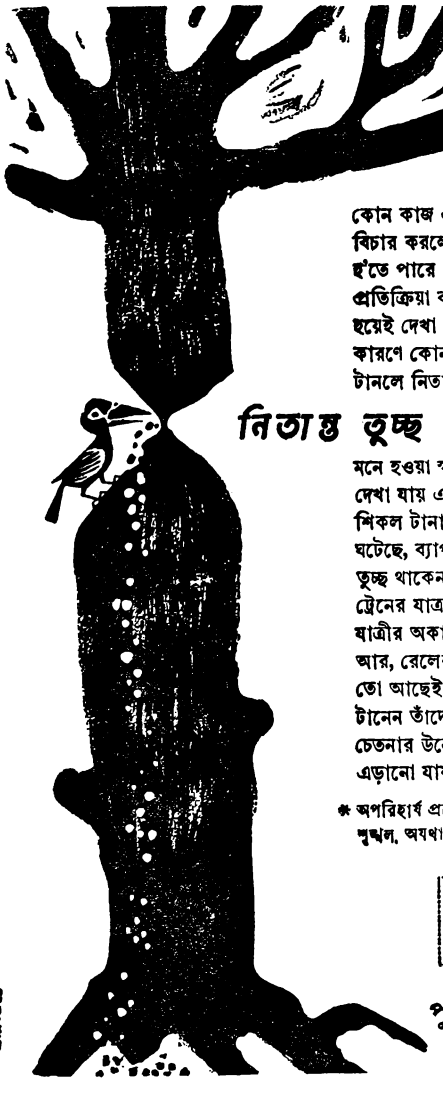

কোন কাজ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে নিতান্তই তুচ্ছ ব'লে মনে হ'তে পারে ; কিন্তু তাদের সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত হয়েই দেখা দেয়। কেউ কোন কারণে কোন একবার ট্রেনের শিকল টানলে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা ব'লে

নিতান্ত তুচ্ছ হ'লেও ...

মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখা যায় এদেশে বছরে এমন শিকল টানার ঘটনা ৪০ হাজার বার ঘটেছে, ব্যাপারটা তখন আর মোটেই তুচ্ছ থাকেনা। এর ফলে অসংখ্য ট্রেনের যাত্রা বিঘ্নিত হয়, অগণিত যাত্রীর অকারণ অসুবিধা ঘটে— আর, রেলের বিপুল অর্থের অপচয় তো আছেই। অযথা যাঁরা শিকল টানেন তাঁদের সামান্য একটু সামাজিক চেতনার উদ্রেক হ'লে এ'সব স্বচ্ছন্দে এড়ানো যায়।

* অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই বিপদ-শৃঙ্খল, অযথা ব্যবহারের জন্য নয়।

পূর্ব রেলওয়ে